কৃষি-প্রবন্ধ

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীবাণেশ্বর সিংহ

'কৃষি-প্রবন্ধ' প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয় দীর্ঘজীবন-ব্যাপী অর্দ্ধশতাব্দীরও উর্দ্ধকাল হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ কৃষির চর্চ্চা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে গ্রন্থকারের মৌলিক ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার নিদর্শন বর্ত্তমান।

আসাম গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন দীর্ঘকাল বাণেশ্বরবাবুর কাজ ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল; কৃষির সাধনায় তাঁহার ঐকান্তিকতা ও এক-নিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করিয়া তখন বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকের পাণ্ডুলিপিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত পড়িয়া দেখিয়াছিলাম। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কৃষিগ্রন্থ বাংলা ভাষায় অতি অল্পই রচিত হইয়াছে; অর্দ্ধশতাব্দীকাল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কৃষির ব্যাপক চর্চ্চা এদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণে এদেশে প্রগতিসম্পন্ন কৃষিকার্য্যের চর্চ্চা যতই বৃদ্ধি পাইবে, ততই 'কৃষি-প্রবন্ধে'র মৌলিকতা উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইবে।

কৃষি ও গো-পালন সম্বন্ধীয় একাধিক পুস্তকে বাণেশ্বরবাবু নিজের দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষি-প্রবন্ধ ইহাদেরই একটি। গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীমান্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কৃষি-প্রবন্ধ' প্রকাশ করিয়া সুযোগ্য পুত্রের কাজ করিয়াছেন; আশা করি, গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকগুলিও তিনি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকারের কৃষি-প্রবন্ধ বাংলা কৃষি-সাহিত্যের একটি মৌলিক ও স্থায়ী সম্পদ।

বর্ত্তমান সময়ে এই পুস্তকের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলাই নিরর্থক। কৃষির দুর্গতিই দেশের দুর্গতির প্রত্যক্ষ

কারণ। তবুও একথা বলা আবশ্যক যে, কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ও কৃষকের উন্নতিবিধানে যত্নশীল হওয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যাঁহারা আজ কৃষি-ব্যবসায়ে অগ্রণী হইয়াছেন, আশা করি, বাণেশ্বরবাবুর এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা অনেক মূল্যবান্ বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করিয়া সফলকাম হইতে পারিবেন।

শ্রীস্বর্ণকুমার মিত্র
প্রাক্তন ডিরেক্টার
অব এগ্রিক্যালচার, আসাম।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩
অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা।

প্রকাশকের বক্তব্য

১৯১৮ সালে অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে গ্রন্থকার স্বয়ং পল্লী-আবাস হইতেই কৃষি-প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশ করেন। ইহা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রত্যাশিত সমাদর লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ ইহা পড়িয়া লেখককে আশীর্ব্বাণী পাঠাইয়াছিলেন। পরলোকগত পদ্মনাথ সরস্বতী, শশাঙ্কমোহন সেন প্রমুখ সাহিত্যিকগণ ও কৃষি-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞগণ মুক্তকণ্ঠে গ্রন্থকারের মৌলিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন। প্রবাসী, হিতবাদী, কৃষক, কৃষিসম্পদ, আনন্দ-বাজার প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির হয়। ফলে কৃষি-প্রবন্ধের প্রথম সংস্করণ অল্পদিন মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে গো-পালন ও কৃষি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের অন্যান্য বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যাপক কৃষিচর্চ্চার বিবরণ পূর্ণতরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া কৃষি-প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে এতদিন তিনি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন নাই। বর্ত্তমান সংস্করণের পাণ্ডুলিপি আসাম গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের ইকনমিক বোটানিষ্ট ও ডিরেক্টার রূপে অবস্থান কালে রায় বাহাদুর ডক্টর এস. কে. মিত্র মহাশয় উত্তমরূপে দেখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকারের নীরব কাজে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন। ডক্টর মিত্র বর্ত্তমান সংস্করণেরও মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

লেখকের অটুট স্বাস্থ্য হঠাৎ বৎসরকাল পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া পড়ায় কৃষি-প্রবন্ধ প্রকাশের দুরূহ কর্ত্তব্যভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের বাজারে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ইহার

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অপরিহার্য্য কারণে যে সকল কথা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। কাগজের অভাবে কোন কোন অংশ বাদও দিতে হইয়াছে। কয়েকটি স্থানে বর্ণাশুদ্ধি দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণ পূর্ণতররূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবে।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় গ্রন্থকার দেশের কৃষির যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর পরে আজও সেই অবস্থার পরিবর্ত্তন সামান্যই ঘটিয়াছে। সেজন্য বর্ত্তমান সংস্করণে ইহা সন্নিবেশিত হইল। উপরন্তু পুস্তকে গ্রন্থকারের বিভিন্ন বয়সের দুইটি আলোক-চিত্রও দেওয়া হইল।

গ্রন্থকারের নিবেদন

আমি কৃষি বিষয়ে বা উদ্ভিদ-বিদ্যায় কোন ডিগ্রী-ডিপ্লোমাধারী নহি। ভূ-সম্পত্তি পরিচালনা পুরুষানুক্রমে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান সম্বল। বাল্যকাল হইতেই দেখিয়া আসিতেছি যে, যে-বৎসর দেশে শস্যাদি ভাল জন্মায়, ধান পাট ইত্যাদির দর ভাল হয়, সে-বৎসর আমরা কতকটা নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারি এবং মহাজন, দোকানদার ইত্যাদি সবরকম স্বাধীন ব্যবসায়ী-গণেরও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। কিন্তু কোন বৎসর দেশে অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ হইলেই টাকা পয়সারও আমদানীর অভাব ঘটে, এ কারণ আমরা ও আমাদের সমব্যবসায়ীগণেরও কার্য্য ভাল চলে না বলিয়া সর্ব্বদাই অভিযোগ শুনা গিয়া থাকে। এমন কি সরকারী বন-কর, জল-কর ও আবগারী-বিভাগের আয়ও বিস্তর কমিয়া গিয়াছে বলিয়া খবরের কাগজের মারফতে সময় সময় অবগত হওয়া যায়। সুতরাং দেশের আর্থিক সচ্ছলতা যে কৃষিকার্য্যের উপর মুখ্যতঃ নির্ভর করে তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশের অর্থাভাব দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করাই দরকার, ইহাই এক সময়ে আমার এক মাত্র চিন্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেজন্য পঞ্চাশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল যাবৎ আমাকে কৃষি-কার্য্যের লাভজনক ও ফলপ্রদ উপায়গুলি লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশে মামুলি প্রণালীতে উৎপাদিত শস্যাদির পরিমাণ কিভাবে বাড়ানো যায়, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য এক দিকে যেমন আমাকে নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াও রাখিতে হইয়াছে। আশৈশব পল্লীগ্রামে বাস করিয়া প্রতিবেশী কৃষিজীবীদের অবস্থার তারতম্য সম্বন্ধে আমার

দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও আমার ঐ কাজে প্রবৃত্ত হইবার অন্যতম প্রধান কারণ হইয়াছিল। আমার মনে তখন এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, আমাদের দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের ফলন দ্রুত কমিয়া যাইতেছে এবং ইহার অনেকটাই কৃষকের অজ্ঞতা বা অনভিজ্ঞতার ফল।

উপরি লিখিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমি আমার পরীক্ষা-লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল যাহাতে দেশের লোকে জানিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে বহু প্রবন্ধ লিখিয়া ধারাবাহিক রূপে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। সে-সব প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার পরিচিত কয়েক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করায় ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার পর অনেক দিন গত হইয়াছে, ইতিমধ্যে আমাদের পরীক্ষা-লব্ধ বিবরণ কতিপয় ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং কৃষি-প্রবন্ধেরও কলেবর বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুদীর্ঘ কালের অনুশীলনের ফলে আমাকে ইহাই বুঝিতে হইয়াছে যে বিভিন্ন জাতীয় ফল-শস্যাদির ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি, মাটি, সার এবং বীজের দোষ-গুণে ফসলের বিশেষ তারতম্য হয়। এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে কোন বস্তু-বিশেষের আবাদ-প্রণালী বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না; কেবল যে ঋতুতে যাহা ফলে তাহা জানিলেই চলে। এজন্য প্রধানভাবে মাটি, সার, কর্ষণ ও বীজের দোষগুণ, ইত্যাদির পরীক্ষিত বিররণই এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহাদের শাক-সবজী ফলাইবার ও ফুলের চাষ করিবার আগ্রহ রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে অনভিজ্ঞতা বশতঃ যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে বহু স্থলে দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কতিপয় শাক-সবজী ও ফুলের চাষ এবং এতদ্দেশে উৎপন্ন ফসলাদির আবাদ-প্রণালী ইহাতে লিখিত হইল।

কাষ্ঠ উৎপাদনের কথা যাহা লিখিয়াছি, তাহা একটু নূতন ঠেকিবারই কথা। কারণ দেশবাসীগণ সাধারণতঃ পর্ব্বত-জাত কাষ্ঠের দ্বারাই তাঁহাদের প্রয়োজন চিরকাল ধরিয়া মিটাইয়া আসিতেছেন, বলিয়াই বোধ হয় কাহাকেও এবিষয়ে চিন্তা করিতে দেখা যায় না। তাহা হইলেও ইহা লাভের কাজ এবং যাঁহাদের সচ্ছলতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত বলিয়াই এ বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি।

আমরা কৃষি-বিষয়ে লিখিত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া অনেক কথাই জানিতে পারি বটে, কিন্তু কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত আশানুরূপ ফল ফলিবে কি না, তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, পুস্তকাদি পাঠের সহিত হাতে-কলমে কাজ করিতে গেলে যে অভিজ্ঞতাটুকু জন্মে তাহাই অমূল্য এবং তাহাই সাফল্য লাভের প্রধান উপায়। যে মাতা নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট বহু সন্তানের জননী হইয়াও প্রত্যেক সন্তানের রুচি বুঝিয়া যথোচিত ভাবে তাহাদের লালনপালন করিতে সমর্থ, তাঁহার পুত্রকন্যাগণ যেমন সর্ব্বদা তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে, তেমনি কৃষক বা উদ্যানিক যিনি তাঁহার দীর্ঘকালের ব্যবহারিক জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যেক গাছপালার অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের অভাব অভিযোগের কারণ বুঝিয়া তাহা পূরণ করিয়া দিতে সক্ষম, তাঁহার নিকটই প্রকৃতির গোপন রহস্যসকল আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, যার সব কথা কেবল ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করিতে পারা সম্ভব নহে। সেরূপ অধিকার লাভ করিতে হইলে খুব নিবিষ্টমনা হওয়ারই আবশ্যকতা বেশী। এই পুস্তক পাঠে কাহারও সে-সব কাজে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হইলে আমার শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। ইতি

রাঢ়িশাল,
৫ই এপ্রিল, ১৯৪৪

শ্রীবাণেশ্বর সিংহ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই পুস্তকের প্রথম পাঁচটি অধ্যায় ও 'বৃক্ষাদির অফলা হইবার কারণ ও তাহা নিবারণোপায়' এবং 'বৃক্ষাদির চারা প্রস্তুত ও রোপণ প্রণালী' নামক দুইটি বিষয় কিছু দিন পূর্ব্বে "সুরমা" পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। দেশের অসফলতার কারণ ভাবিতে গিয়া প্রথম পাঁচটি অধ্যায় লিখিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে কোন কোন চা-বাগানে ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে নানা ফলের বাগান করা হইতেছে। শিক্ষিত লোকের মধ্যে এই কাজের সূচনার সংবাদ পাইয়া মনে হইয়াছিল যে তাহাতে কোনও বিশিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। সেজন্য উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইয়া কার্য্য-প্রণালী ইহার বিপরীত হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষাদির অফলা হইবার কারণ ইত্যাদি শেষোক্ত দুইটী বিষয় লিখিতে হইয়াছিল। ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার পরিচিত কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিতে উৎসাহ প্রদান ও অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, আমি যখন কলিকাতা যাই, তখন সেখানকার বাগ্‌-বাগিচার দৃশ্য আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইহার পর বাড়ী আসিয়া আন্দাজের উপর কোন কোন গাছ পালা ফলাইতে চেষ্টা করিয়া পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হওয়ায় কৃষিবিষয়ক নানা পুস্তক সংগ্রহ করতঃ পাঠ করিয়া কতক সুবিধালাভ করিতে পারিয়াছিলাম। তাহাতেও ঠিক ঠিক ভাবে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া ক্রমাগত তিন বৎসর কিছু দিন পর পর কলিকাতা যাইয়া সেখানকার বড় বড় বাগানওয়ালা ও নর্শরি সকলের কার্য্য মনোযোগ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ বহু বার ৯।১০ সের ওজনের বাঁধাকপি, এক ফুট ব্যাস ফুলকপি ও ছয় ইঞ্চি ব্যাস গোলাপ ফুল ইত্যাদি অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিলাম। আমার ঐ সকল প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাই এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে উদ্ভিদ প্রতিপালন বিষয়টা দেশের শিক্ষিত ও ভদ্রলোকের চক্ষে অতিশয় উপেক্ষার বিষয় ছিল।

কাজেই আমার আগ্রহ তখন বিশেষ ভাবে চাপিয়াই চলিতে হইয়াছিল। কৃষি ও কৃষককুলই দেশের অর্থাগমের পথ করিয়া দেয়। কৃষকের ঘরে ফসল না উঠিলে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী চাকুরে ব্যতীত সকল শ্রেণীর লোকেরই কোন না কোন অসুবিধা বা ক্ষতির কারণ হয়, তাহা বিগত কয়েক বারের দুর্ভিক্ষ দ্বারা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। বিগত ১৩২২ বাংলার দুর্ভিক্ষের সময়ে গবর্ণমেণ্টকেও ইহার জন্য সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে সরকার বাহাদুর লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষি লোন দিয়া ও নানা স্থান হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া দিয়া কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকার্য্যের গৌরব ও আবশ্যকতা জনসাধারণের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ঐ কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট করাইবার জন্য নানা স্থানে আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্র খুলিয়া অনেক টাকা খরচ করিতেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত ও চেষ্টার ফলে দেশের কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিতেছেন। তাহাদের কাহারও কাহারও মতে কৃষি-ক্ষেত্রের বিস্তার করিয়া দেশের অভাব দূর করিতে হইবে। আমার পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতা আমাকে অনবরত বুঝাইতেছে যে দেশে যাহা আছে তাঁহা তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে দ্রুত বেগে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতীকারের জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টান্বিত হওয়াই উচিত। পিতা মাতার সুস্থতার উপর যেরূপ সন্তানের সুস্থতা ও সবলতা নির্ভর করে, সেইরূপ ক্ষেত্র ও বীজের উৎকর্ষের উপর ফসলের পরিণাম স্থির হইয়া থাকে। এ দেশের ক্ষেত্র সকলে এই দুইটারই অবনতি অত্যধিক মাত্রায় হইয়াছে ও হইতেছে। ইহার কারণ অনভিজ্ঞতা বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত নিয়মে অত্যধিক লাভবান হইবার আশায় প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে যাইয়া কৃষকগণ অনবরত প্রতারিত হইতেছে। এই সকল কথাই আমি প্রথম পাঁচটী অধ্যায়ের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতীকারের উপায়ও দেখাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

বিগত ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এতদঞ্চলের পতিত ভূমি যত আবাদ হইয়াছে, তার পূর্ব্বের ২৫ বৎসরেও তত জমি আবাদ হয় নাই; তাহা প্রত্যেক ভূম্যাধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেই প্রমাণিত হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যও বিগত দশ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় দ্বিগুণ ত্রিগুণ বাড়িয়াছে।

ইহাতে কৃষকদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হওয়াই উচিত ছিল। ইহার বিপরীত হওয়ার কারণ ঠিক ঠিক ভাবে চিন্তা করিতে পারিলে অনেকেই আমার সহিত একমত হইবেন, ইহা আমার দৃঢ় আশা। আমরা সর্ব্বদা পাড়াগাঁয়ে বাস করিয়া দেখিতেছি যে বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে ২০৲ মণ ধান বা পাট হইত, এখন সেই ক্ষেত্রে খুব ভাল হইলেও ১৩।১৪ মণের বেশী হয় না। কৃষকগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সমস্বরে সকলে বলিয়া উঠে যে, জমির উর্ব্বরতা কমিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের কোন ত্রুটী হইতেছে এ কথা ভাবিতেই পারে না। কৃষিকার্য্যে সামান্য জ্ঞান থাকিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভাল প্রণালীতে কর্ষণ ও সার দিতে পারিলে অতি নীরস মাটিতেও অপর্য্যাপ্ত ফল লাভ করিতে পারা যায়। প্রস্তরবৎ মাটিতে যত্নের গুণে আশাতীত ফল ফলে, এরূপ দৃষ্টান্ত এ দেশে নাই। বরং এ কথা শুনিলে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে অসুবিধা বোধ করেন না। আমি একবার কোন প্রদর্শনীতে একটি এক ফুট ব্যাস ফুল কপি ও বিশ ইঞ্চি পরিধি একটী শালগম পাঠাইয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া ঐ প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ যে ব্যক্তি উহা বহন করিয়া নিয়াছিল তাহাকে ইহা কি উপায়ে ফলান হইয়াছিল ও ইহাতে কি কি সার দেওয়া হইয়াছিল ইত্যাদি অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া তখন আমাকে আক্ষেপের সহিত ভাবিতে হইয়াছিল যে, সামান্য দুইটি জিনিষ দেখিলে যে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হন, সেই দেশের সাধারণ কৃষকের পক্ষে আন্দাজের উপর যাহা তাহা করা আর বিচিত্র কি ?

অন্যান্য সভ্য দেশসমূহের কৃষি ও কৃষকের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে জানা যায় যে, অনেক সুবিদ্বান ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত থাকায় কাজের ইষ্টানিষ্ট সহজে ধরা পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকারোপায় উদ্ভাবিত হইয়া পড়ে, এবং তাঁহাদের দৃষ্টান্তে জনসাধারণও উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যায়। আর এদেশে যাহারা অন্য সকল কাজের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তাহারাই পেটের দায়ে হাল চাষ করিতে বাধ্য হয়। "চাষা" কথাটা এ দেশে অপমানসূচক। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের কৃষকেরা সর্ব্বদাই ভদ্র সমাজের চক্ষে উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেজন্য যাহারা অন্য পথ অবলম্বনের সুযোগ পাইতেছে, তাহারাই সর্ব্বাগ্রে লাঙ্গল ধরা কাজটা ত্যাগ

করিতে বাধ্য হইতেছে। কৃষিকার্য্যের আগাগোড়া বিজ্ঞান রহস্যে পরিপূর্ণ, কাজেই সুকঠিন। মনের অপ্রবৃত্তি বা ঘৃণার ভাব লইয়া কোন কঠিন রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক তাহা হইতে লাভের পথ উন্মুক্ত করা দুরাশা ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষের জীবন রক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কোন কোন মহাত্মা আপনাপন গ্রন্থাদিতে "জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ" এই অকাট্য সত্যের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জীবনের পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যবসা খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না, সেই ব্যবসাটাকে এইরূপ অবজ্ঞার সহিত করিতে গেলে তাহার ফল যাহা হয়, তাহাই হইতেছে।

উদ্ভিদ প্রতিপালন বিষয়ে শিক্ষিত লোকের মধ্যে অনেকের আগ্রহ থাকিলেও অনভিজ্ঞতা বশতঃ সময় সময় তাঁহাদিগকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে দেখিয়াছি, তাহা হইতে আমাদের দৈনন্দিন আবশ্যক শাক-সব্জী ও ফল ফুলের বিবরণ এবং এতদ্দেশে যাহা হইতে পারে এরূপ লাভ-জনক কয়েকটি ফসলের আবাদ-প্রণালী ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। শাক-সব্জি ও ফল ফুলের বিবরণ প্রত্যেকটি পৃথকভাবে লিখিতে গেলে অতিশয় বিস্তৃত হইবার কথা। আমার বিবেচনায় তাহা এক প্রকার অনাবশ্যক। উদ্ভিদেরও জাতি এবং শ্রেণী বিভাগ আছে। এক জাতীয় বৃক্ষ লতা বা তৃণ একটার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে বা রীতিমত ফলাইতে পারিলে ঐ দৃষ্টান্তে ঐ জাতীয় যত আছে সমস্তই ফলাইতে পারা যায়। মাটির প্রকৃতি বা ধর্ম্ম, কর্ষণের উপযোগিতা এবং সার ও বীজ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে পৃথক ভাবে কোন বস্তুবিশেষের আবাদ-প্রণালী বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না। তবে যে ঋতুর যেটা তাহা জানিলেই যথেষ্ট হয়। সার ও কর্ষণের উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য এবং বীজের দোষ গুণ প্রতিপন্ন করাই এই পুস্তক লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা কাহারও কোন কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হইলে আমার শ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। ইতি—

সন ১৩২৪ বাং,
মাহে অগ্রহায়ণ।

গ্রন্থকার

সূচী-পত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৮৭—১৯২

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ২২৫—২৩৬

পঞ্চদশ অধ্যায় ২৩৭—২৫৯

পরিশিষ্ট ২৬০—২৭৫

কৃষি-যন্ত্রাদি

শ্রীবাণেশ্বর সিংহ (৭০ বৎসর বয়সে

জন্ম—৯ই শ্রাবণ, ১২৭৪ সন

গ্রন্থকার—৫৫ বৎসর

কৃষি-প্রবন্ধ

"কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ

প্রথম অধ্যায়

কৃষির মূল নীতি ও কৃষকের কর্ত্তব্য

কৃষিকার্য্যের লাভালাভ উৎপন্ন দ্রব্যের কমি-বেশীর উপর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্য পরিমাণে যতটা হওয়া উচিত বা যতটা হইতে পারে, তদপেক্ষা কম হইলে অনেক সময় তাহা খুব চড়া দরে বিক্রয় করিলেও মূল্যের টাকা দ্বারা চাষের ব্যয়ই পোষায় না। পক্ষান্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ যত অধিক হয়, ততই তাহা অধিক লাভের হইয়া থাকে। সচরাচর ইহাই কৃষিকার্য্যের চরম লক্ষ্য এবং তদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে-যে উপায় অবলম্বনে উৎপন্ন দ্রব্যাদির হার বাড়াইতে পারা যায়, সেই সকল উপায় অবলম্বন করাই কৃষির মূলনীতি।

উৎপন্ন দ্রব্যের হার বাড়াইবার প্রধান উপায় একাধারে ভাল মাটি, বিভিন্ন জাতীয় সারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ও ইহাদের যথাযথ ব্যবহার, গভীর কর্ষণ ও ইহার উপায়-স্বরূপ লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষি-যন্ত্রের উৎকর্ষ-সাধন এবং কৃষি-বল—গো-মহিষাদির বল ও সুস্থতা রক্ষা করা, ভাল বীজ নির্ব্বাচন অথবা উৎপাদন, উত্তম পরিচর্য্যা অর্থাৎ আবশ্যকমত জল সেচন, নিরানি দেওয়া, গবাদি পশুর অত্যাচার হইতে ফল শস্যাদি রক্ষার উপায় করা ও প্রত্যেক কার্য্য যথা সময়ে সম্পাদন করা ইত্যাদি। উল্লিখিত কার্য্যসমূহের কোন একটির অভাব ঘটিলে যে অন্যান্য কার্য্যের ধারাকেও অল্প বিস্তর ব্যাহত করিয়া দিবে, তাহা বুঝিতে পারা অধিক কঠিন নহে। তাহা ছাড়া, এ সকল কার্য্য করিবার কালে কৃষিকার্য্যের যে-সব প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্ন রহিয়াছে, তাহাও যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিবার উপায় দেখিতে হইবে।

নৈসর্গিক উপদ্রবঃ—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শীলাবৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্ঝাবাত, জলপ্লাবন ইত্যাদিই কৃষিকার্য্যের প্রধান অন্তরায় বা বিঘ্ন। উপরের লিখিত কার্য্যসমূহ যথাসময়ে ও যথানিয়মে সমাধা করিতে পারিলেই সাধারণতঃ কর্ত্তব্য শেষ হইল বলিয়া মনে হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময়েই উল্লিখিত কোন-না-কোন বা সকল উপদ্রব একসঙ্গে ঘটিয়া কৃষকের সকল আশা-ভরসা ও উদ্যম একেবারে বিনষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং এ সকল উপদ্রব এড়াইয়া চলিবার কোন উপায় থাকিলে তাহাও শিখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

উল্লিখিত নৈসর্গিক উপদ্রব সকল এড়াইয়া চলিবার প্রধান উপায়—প্রকৃতির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা, অর্থাৎ আকাশ বাতাস রৌদ্র বৃষ্টি ও কুয়াশার অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতের অবস্থা নির্ণয় করা। ইহা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ইহাকে আকাশতত্ত্ব বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে এক সময়ে আমাদের দেশে এমন অনেক জ্যোতিষ-বচন ও কবিতা রচিত হইয়াছিল, যাহার সাহায্যে রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় তুফান ইত্যাদি কখন কি হইবে তাহা অনেকটাই বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য এককালে দেশের কৃষকেরা তাহা আগ্রহ সহকারে মুখে মুখে শিখিয়া লইত। ইহার নিদর্শন-স্বরূপ এখনও জ্যোতিষ-বচন ও কবিতা নিরক্ষর কৃষকদিগের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া চলিতে গেলে যে নিজ হইতেই ক্ষতির পথ করা হইবে তাহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে সর্ব্বসাধারণের জানা দুইটি খনার বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। খনা শীঘ্র বারিপাতের নিশ্চিত লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"অমোঘা উত্তরে ধ্বনী, অমোঘা পূর্ব্ব বায়সা,
অমোঘা পশ্চিমে মেঘা, অমোঘা দক্ষিণে বিদ্যুৎ।"

ইহার অর্থ ঃ—উত্তরদিকে মেঘগর্জ্জন হইলে, পূর্ব্বদিকে বাতাস বহিলে, পশ্চিমদিকে মেঘ দেখা দিলে ও দক্ষিণদিকে বিদ্যুৎ চমকাইলে বৃষ্টি নিশ্চিত হইবে বুঝিতে হইবে। উল্লিখিত লক্ষণসমূহ একসঙ্গে দেখা দিলে, দশদণ্ড মধ্যে বৃষ্টি হইবে বলিয়া অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা হইয়াও থাকে, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন মনে করি। খনা অন্য স্থানে আবার বলিয়াছেন—

"কোদালে কুড়ালে মেঘের গায়, এলোমেলো দিচ্ছে বায়,
শ্বশুরকে বল বাঁধতে আল, আজ না জল হবে কাল।"

আকাশে এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে যে বৃষ্টি শীঘ্র হইয়া থাকে তাহাও অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। আকাশে এই সকল লক্ষণ দেখা দিলে যেখানে কৃষিকার্য্যের বিফলের সম্ভাবনা, তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়াই উক্ত বচন-প্রমাণের উদ্দেশ্য। খনা সাইল ধানের চারা রোপণের সময় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "শ্রাবণের বার, ভাদ্রের তের, এর মধ্যে যত পার৭" ইহার পূর্ব্বে বা পরে চারা রোপিত হইলে যে ফসলে কোন-না-কোন দোষ হইয়া থাকে, তাহা কৃষক-মাত্রেরই ধারণায় আছে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তবুও অনেকে তাহা করিয়া থাকে। ঠিক সময়ে কাজ না হইলে যে কৃষকের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়, সেজন্য খনা অন্য স্থানে বলিয়াছেন যে, "অকালেতে কৃষি করা, লাভ নাই তার মূলে হারা।" বর্ত্তমানে আমাদের দেশের চাষীরা অভাবের তাড়নায় বা দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া অনেক কাজ সময় কাটাইয়া করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বচনের সত্যতা প্রমাণিত করিতেছে।

এইরূপ আরও শত শত বচন-প্রমাণ রহিয়াছে, যাহা জানিয়া মানিয়া চলিতে পারিলে রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রব কখন কি হইবে, ইহার অনেকটাই ঠিক করিতে পারা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে

সতর্ক হইবারও সুবিধা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশতত্ত্বে জ্ঞান অর্জ্জন করা কৃষকের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। কৃষক মাত্রেরই জানা উচিত যে, আকাশ বাতাস কুয়াশা রৌদ্র, নদীর জোয়ার ভাটার অবস্থা ও কীটপতঙ্গাদি, উই ও পিপীলিকার আবির্ভাব বা তিরোভাব দেখিয়া ভবিষ্যতের অবস্থা কি হইবে তাহা বুঝিতে ও বলিতে পারেন এমন লোক দুর্লভ হইলেও একেবারে বিরল নহে। সেই সব ধরিতে বুঝিতে পারা একমাত্র প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ সাপেক্ষ।

প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষিগণ কৃষির ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত ফলপ্রদ করিয়া লইবার জন্য কেবল আকাশতত্ত্বে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষান্তরে ইহার জন্য হল-চালন, বীজ-বপন ও চারা-রোপণের বার তিথি নক্ষত্র ও ক্ষণ ইত্যাদি বিচার করিয়া চলিবার জন্য ভূরি ভূরি নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন, যাহা অবজ্ঞা করিয়া চলিতে গেলে নিজ হইতেই বিফলের কারণ জন্মাইতে হয় বলিয়াই বলিতে হইবে। ইহার অন্য প্রমাণ না দিয়া এই পর্য্যন্ত বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, শুভকার্য্য শুভ দিনে আরম্ভ করিবার আবশ্যকতা কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন মনে হয় না।

উল্লিখিত বচন-প্রমাণের ও বিচারের বাহুল্য দেখিয়া পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনকালে দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথায়ও কৃষির বিঘ্নাপসারণের উপায়-চিন্তা খেলিত। তাঁহারা কৃষিকার্য্যকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহাও ঐ সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, প্রত্যেক কাজের অন্তরায় দূর করিবার উপায় না জানিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে প্রতি পদেই বিফলের সম্ভাবনা।

কীটের উপদ্রবঃ—ইহা কৃষিকার্য্যের অন্যতম প্রধান বিঘ্ন। ইহাতে যে অনেক সময় কৃষকের গভীর মনস্তাপের কারণ ঘটাইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নহে। সুতরাং ইহা দমনের উপায়

যতদূর সম্ভব শিক্ষা করাও কৃষকের কাজের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ফসলের জমিতে কীটের আবির্ভাব হইয়াছে দেখিলে আমাদের দেশের কৃষকগণ নিশ্চেষ্টভাবে ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকে। কারণ কীট দমনের কোন উপায় আছে বলিয়া তাহারা ধারণাই করিতে পারে না। তাহাদের জানা উচিত যে, কীটতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও রহস্যজনক বিদ্যা এবং বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও ক্রমেই হইতেছে, যাহার সাহায্যে আগ্রহ থাকিলে সকলেই কীট দমন করিবার কিছু না কিছু উপায় করিতে পারেন। আমি ইহার যৎসামান্য অনুশীলন যাহা করিয়াছি, তাহার পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে।

কীটের উপদ্রব নিবারণের উপায় জানিতে হইলে অগ্রে তাহাদের জন্ম-প্রকরণ জানিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ জমিতে হাজার হাজার কীট লাগিয়া যখন ফসল ধ্বংস করিতে থাকে, তখন সাধারণ বুদ্ধিতে তাহা এক অভাবনীয় কাণ্ড বলিয়াই মনে হয়। অন্ততঃ এক সময়ে আমরা তাহাই মনে করিতে বাধ্য হইতাম। বস্তুতঃ ইহা অভাবনীয় কিছুই নহে। বিহিত অনুসন্ধানের পর দেখা গিয়াছে যে, শস্যাদি-ধ্বংসকারী কীটের অধিকাংশই নানা প্রকার প্রজাপতির ডিম হইতে জাত। যেমন বোল্‌তার টোপগুলি বোল্‌তার পলু বা ভ্রূণ অবস্থা, তেমনি ফসল-ধ্বংসকারী কীটগুলিও প্রজাপতিরই পলু অবস্থা। ফসলের প্রকার-ভেদে তাহাদের ধ্বংসকারী কীট যেমন নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রজাপতির মধ্যেও নানা প্রকার ভেদ রহিয়াছে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। যে বৎসর যে স্থানে ধান্য সরিষা আলু পেঁয়াজ তামাক ইত্যাদির জমিতে কীটের উপদ্রব অধিক হয়, সে বারে বিশেষ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে তথায় ছোট বড় নানা প্রকার ও বর্ণের প্রজাপতির আবির্ভাবও অধিক দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণতঃ শস্যাদির পাতা, ফুল ও ফলে বসিয়া ডিম পাড়ে ও ডিম তথায়ই ফুটিয়া পলু হইলে ফসল ধ্বংস করিয়া থাকে। কীটের আবির্ভাবের সূচনার সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে কৃষিজীবীরা মনে করে ও পরস্পর বলাবলি করিয়াও থাকে যে, তদ্দ্বারা কীটের উপদ্রব কমিবে। প্রকৃতপক্ষে প্রচুর বারি-বর্ষণ হইলে তাহা কতক কমিয়াও থাকে। ইহার কারণ, প্রজাপতির ডিম ফুটিয়া পলুর আকার হইবার পূর্ব্বে প্রচুর বারি-বর্ষণ হইলে ইহার অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। প্রজাপতির বংশবৃদ্ধি দ্রুতগতিতে হয়। কীটতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে একজোড়া প্রজাপতি হইতে এক মাসের মধ্যে কয়েক সহস্র প্রজাপতি সৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা এণ্ডি পোকা হইতে একাধারে তাহাদের ডিম, পলু ও গুটি নির্ম্মাণের পর তাহা হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উপরে লিখিত কীটের জন্ম-প্রকরণ বুঝিতে পারা অত্যন্ত সহজ হইবে মনে করি।

উপরে শস্যাদি ধ্বংসকারী কীটের জন্ম-প্রকরণ যাহা যাহা বলা হইল, তদ্বিষয়ে একটু নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে আশা করি অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, প্রজাপতির বধের বিহিত ব্যবস্থা করিতে পারাই কীটের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। কীটতত্ত্ববিদ্ কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বহুল কীটের আবির্ভাবের সূচনায়ই অন্ধকার রাত্রে ফসলের মাঠের মাঝে স্থানে স্থানে বৃহৎ আলো জ্বালিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করা যাইতে পারে, এবং এই উপায় অবলম্বনে নাকি কোন কোন স্থানে কীটের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়াও শুনা গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে খোলা জায়গায় আলো জ্বলিলে পালকধারী অসংখ্য প্রকারের কীট পতঙ্গ তথায় আপনা হইতেই আসিয়া পুড়িয়া মরে এইরূপ দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আশা করা যায় যে, উদ্যম থাকিলে যে-সব কীট প্রজাপতি ও

অন্যান্য পালকধারী ফড়িং হইতে জাত হয় তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারা অসম্ভব হইবে না।

প্রজাপতি ও ফরিঙের পলু ছাড়াও গাছ লতা পাতা ধ্বংসকারী অসংখ্য রকমের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের কীট রহিয়াছে। ইহাদের কোন কোনটা মাটি হইতে উত্থিত হইয়া ও কোনটা আকাশপথে আসিয়া ফল ও শস্যাদির অনিষ্ট সাধন ও গাছপালার নানা রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাদের কোন কোনটার জন্ম-প্রকরণ ও তাহাদের দমনের উপায় আমি যতটা ধরিতে বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "আয়কর ফলের চাষ" নামক পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহার সবই বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষাদি ও ফল সম্বন্ধে (যেমন—'আম্রে কীট ও আমগাছ', 'নারিকেল গাছ ধ্বংসকারী কীট') লিখিয়াছি বলিয়া এস্থানে পৃথক ভাবে আর কিছু লিখিলাম না।

রোগ-চিকিৎসা ঃ—মনুষ্য পশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর শরীরে যেমন নানা রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং ঐ সকলের মধ্যে যেমন কোনটা কুলজ, কোনটা কীটজ, কোনটা স্পর্শ-সংক্রামক এবং কোনটা অবৈধ আচরণের মন্দ ফল স্বরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ উদ্ভিদ-শরীরেও সাধ্য অসাধ্য নানা রোগের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কৃষিজীবীর পক্ষে ঐ সকলের প্রতিকারের উপায় বা চিকিৎসাদি মনোযোগপূর্ব্বক শিক্ষা করা অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাটির পরিচয়

ভাল মাটি কৃষকের প্রধান সম্পদ। ইহার প্রমাণ যে-সব স্থানের মাটি ভাল, সে-সব স্থানে ফল-শস্যাদির অবস্থা স্বভাবতঃই কতকটা উন্নত এবং এই কারণে সে-সব স্থানের চাষীদিগকেও কতকটা সচ্ছল দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে তথায় ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির মূল্যও স্বভাবতঃই কতকটা সুলভ হয় এবং সুলভ মূল্যে বেচিয়াও চাষীরা অধিক লাভ করিতে পারে। এতদ্দ্বারা মাটি চিনিবার দক্ষতার উপরই যে চাষ-বাসের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

ভাল মাটি কৃষকের পক্ষে ঈশ্বরদত্ত সম্পদ। কিন্তু মাটির বাহিরের অবস্থা দেখিয়াই ইহার ঠিক ঠিক পরিচয় করিতে পারা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। নিরক্ষর কৃষক সাধারণতঃ স্থানের স্বভাব-জাত তৃণ-গুল্মাদির বর্দ্ধিষ্ণুতার অভাব বা আধিক্য দেখিয়াই মাটির বলাবল বুঝিতে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং যে স্থানে যাহা যাহা সহজেই প্রচুর হইয়া উঠিতে বাব বার দেখা গিয়াছে, সে-সবেরই চাষ অধিক ভাবে করিয়া থাকে। এই রীতি সাধারণ বুদ্ধিতে ভাল বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু মাটির বিভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও তাহারা কি করিয়া মাটি হইতে তাহাদের শরীর গঠনোপযোগী উপাদানসমূহ আহরণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে ঠিক ঠিক ধারণার অভাব লইয়া ফল-শস্যাদি জন্মাইতে গেলে আমাদের অজ্ঞাতসারেই এমন সব ত্রুটি থাকিয়া যাওয়া সম্ভব, যাহার ফলে তাহাদের উন্নতি না হইয়া অবনতি হওয়া একটুও বিচিত্র নয়।

মাটি নানা প্রকার। যথা ঃ—এঁটেল, বালি, পলি, দোআঁশ অর্থাৎ বালি বা পলি মিশ্রিত এঁটেল এবং লাল, কালো, সাদা, ধূসর ইত্যাদি নানা বর্ণের মাটি দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল বিভিন্ন অবস্থা এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানজাত একই জাতীয় ফল-শস্যাদির আকার, স্বাদ ও সৌন্দর্য্যগত বিস্তর প্রভেদ দেখিয়া মাটির উপাদানগত পার্থক্য সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা কৃষকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন প্রকার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না। সুতরাং দ্বিধাশূন্য হইয়া কাজ করিতে হইলে অগ্রে আদৌ মাটি জিনিসটা কি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

মাটির উৎপত্তি ঃ—পদার্থ-বিজ্ঞানের মতে মাটি বলিয়া আদৌ কোন জিনিসই নাই। আমরা যাহা দেখি তাহা পর্ব্বতস্থিত প্রস্তরেরই রূপান্তর মাত্র। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বজ্রপাত ও ভূকম্পন ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণবশতঃ পর্ব্বতস্থিত পাথরের স্থানে স্থানে যে-সব ফাট ধরে তাহাতে জল বাতাস উত্তাপ প্রবেশ করিতে থাকিলে তাহা ক্রমে রূপান্তরিত বা বিগলিত হইয়া কোমল মাটিতে পরিণত হয় ও বৃষ্টির জলের স্রোত-বেগে নিম্ন ভূমিতে গিয়া ছড়াইয়া পড়ে।* এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হয় যে, বিভিন্ন পর্ব্বত-স্থিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাথরের গুণানুসারে স্থানে স্থানে মাটির রূপগুণেরও প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে।

এই পর্য্যন্ত বুঝিলেই কি সব বুঝা হইল? আমরা সচরাচর কি দেখিতে পাইতেছি? আমরা দেখিতেছি মাটি হইতে ধাতু, চূণ, পাথর, কয়লা, গন্ধক, লবণ, সোরা ইত্যাদি, নানা প্রকার রাসায়নিক

* জল বাতাস ও উত্তাপের ক্রিয়ায় প্রস্তরও বিগলিত হইয়া কোমল মাটিতে পরিণত হয়—এই কথাগুলি কর্ষণের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা বিষয়ে পাঠ করিবার কালে স্মরণ করিতে হইবে।

পদার্থ, কেরোসিন ইত্যাদি নানাপ্রকার তৈল, বৃক্ষ, লতা, তৃণগুল্ম ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতেছে। আবার মাটির উৎপন্ন দ্রব্যাদি লইয়াই মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শরীর। মোটের উপর মাটির উপাদান লইয়াই সমস্ত দৃশ্য জগৎ, এবং কালক্রমে সমস্ত পদার্থই ধ্বংসাবসানে মাটিতে লয় বা পরিণত হয়। এ সকল আবর্ত্তন-ক্রিয়া দেখিয়া মাটিকে একটা পদার্থ না ভাবিয়া সমস্ত পদার্থের আকর বা সমষ্টি বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হইতে হয়, যদিও আমরা জানি যে, খনিজ পদার্থ সমুদয় আর উদ্ভিদ ইত্যাদি একই নিয়মে উৎপন্ন বা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

মাটির উৎপত্তি কিরূপে হয়, তদ্বিষয়ে যাহাদের ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদের পক্ষে পর্ব্বতে যাইয়া প্রস্তরময় স্থানগুলি ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত মনে করি, কারণ প্রত্যক্ষ দর্শন শ্রুত বিষয় বা শত শত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিয়া লওয়া অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্। পর্ব্বতের প্রস্তরময় স্থান-গুলি মনোযোগ সহকারে দেখিতে গেলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাথর জিনিসটা নিত্য বর্দ্ধনশীল পদার্থ। উহা যেমন এক দিকে দিন দিন দ্রুত পদে বাড়িয়া উঠিয়া উচ্চ আকাশকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে, তেমনি অন্য দিকে রোদ বাতাস ও জলের ক্রিয়ায় স্তরে স্তরে পৃথক্ হইয়া বা চট্ বাঁধিয়া উঠিয়া ক্রমে মাটিতে পরিণত হইতেছে এবং তদুপরি তৃণগুল্মের সৃষ্টি হইয়া সে কাজকে অধিকতর দ্রুতপদে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। সেরূপ অবস্থা হইলে তথায় তৃণগুল্ম জন্মিতে পারে না -- ইহাও বুঝিতে পারা যায়। পাথরের জখম স্থানগুলিতেই বৃহজ্জাতীয় বৃক্ষাদি জন্মায়, ইহা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। ভূকম্পন, বজ্রপাত ইত্যাদিতে পাথরে ফাট ধরে বলিয়া প্রথমেই যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। আমি অনেক জায়গায়ই দেখিয়াছি, বিরাট্ আকারের পাথর সব ধ্বসিয়া পড়িয়া যেন মহাপ্রলয়ের

সাক্ষ্য দান করিতেছে। বিশ্বনিয়ন্তার সে-সব খেলা বাস্তবিকই দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়।

ধাতু, চূণ, কয়লা, গন্ধক ইত্যাদি যাহাকে আমরা খনিজ পদার্থ বলিয়া থাকি, তাহা কোন কোন স্থানবিশেষের মাটিতে থাকে ইহাই প্রায় সকল লোকের ধারণা। অন্ততঃ এক সময়ে আমরা তাহাই মনে করিতাম। কিন্তু ফল-শস্যাদি জন্মাইবার কাজের যতই অনুশীলন করিতেছি ততই অনুভূত হইতেছে যে, ঐ সকল পদার্থের কোন কোনটার সম্পূর্ণ অভাব উদ্ভিদ-শরীর গঠনের এক প্রধান অন্তরায়। তাহা হইলে সব স্থানের মাটিতেই ঐ সকলের ভাগ অল্পবিস্তর রহিয়াছে বলিয়াই বুঝিতে হয়। ইহার কারণ সারের বিষয় পাঠ করিবার কালে ক্রমে বিশদ ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে।

এখন সমস্ত পদার্থের লয় বা আকরস্থানীয় মাটি হইতে কি করিয়া উদ্ভিদ-শরীর গঠিত হয় ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে কিম্বা মাটির কোন্ কোন উপাদান হইতে তাহাদের পোষণ-কার্য্য সাধিত হয়, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে-সব বুঝিবার জন্য মাটিকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যথা—(১) রূঢ়, (২) খনিজ, (৩) উদ্ভিজ্জ, (৪) প্রাণীজ, (৫) জান্তব পদার্থ। এখন ইহাদের স্বভাব কিরূপ তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে-সব কথা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে না পারা পর্য্যন্ত আমরা জমিতে বার বার চাষ দিই কেন ও তাহা হইতে শস্যাদির উন্নতি হয় কি করিয়া, তাহা সম্যক্ জানিতে পারা যায় না। কাজেই সে-সব কাজে আমরা কোন ত্রুটি করিতেছি কিনা তাহাও বুঝিবার উপায় থাকে না, পক্ষান্তরে সে-সব না বুঝা পর্য্যন্ত ঐ কাজে যতটা যত্ন লওয়া উচিত, ততটা লওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য উক্ত পাঁচটি উপাদানেরই পরিচয় এখন দেওয়া যাইতেছে।

(১) রূঢ় পদার্থ—ইহার কোন কালেই পরিবর্ত্তন ঘটে না, অর্থাৎ সর্ব্বদা একভাবে থাকিয়া অন্যান্য পরিবর্ত্তনশীল ও পচনধর্ম্মশীল

বস্তুসমূহকে আপন স্বভাবে টানিয়া লওয়া, বা মাটিতে পরিণত করিয়া জমাট বা শক্ত চাপ বাঁধাইয়া লওয়াই ইহার ধর্ম্ম।

(২) খনিজ পদার্থ—ইহারা অহরহ পরিবর্ত্তনশীল। অগ্নির উত্তাপ পাইলে গলে বা বিদীর্ণ হয়, রৌদ্রতাপ, জল ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে রূপান্তরিত হইতে থাকিয়া কালক্রমে মাটিতে পরিণত হয়। ইহারা অবস্থাবিশেষে উদ্ভিদ-শরীর গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় ইহার পরিপন্থী বা বিষধর্ম্মী। এ সকল কথা কর্ষণ বিষয় পাঠ করিবার কালে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

(৩) উদ্ভিজ্জ পদার্থ—বিগলিত উদ্ভিদ, অর্থাৎ ঘাস লতাপাতা কাঠ ইত্যাদি পচিয়া যে মাটি হয়।

(৪) প্রাণীজ পদার্থ—সব রকম জীবজন্তুর বিষ্ঠা মূত্র হইতে যে মাটি হয় বা মাটিতে ঐ সকলের ভাগ যাহা আছে, তাহা।

(৫) জান্তব পদার্থ—সব রকম জীবজন্তুর বিগলিত শরীর অর্থাৎ সে-সব পচিয়া যে মাটি হয়।

মাটির উল্লিখিত উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও জান্তব অংশ সকল উদ্ভিদ-শরীরের পক্ষে অতিশয় পুষ্টিকর, ইহা সারের বিষয় পাঠকালে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। ইহারা পুষ্টিকর বলিয়াই মাটি নির্ব্বাচন কালে উহাতে ঐ সকল পদার্থের ভাগ কি পরিমাণ আছে তাহা দেখা খুবই দরকার। তাহা ঠিক ঠিক ধরিতে বা বুঝিতে পারা বা মাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা রাসায়নিক পরীক্ষা সাপেক্ষ। অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত বা অশিক্ষিত লোকের পক্ষে ঐ সব পরীক্ষার পথে যাইবার উপায় নাই। অথচ এ দেশে এইরূপ লোকই অধিক ভাবে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয়। তাহাদের জন্য মাটি পরীক্ষার কতকগুলি সহজ উপায় নিম্নে লেখা যাইতেছে।

মাটি পরীক্ষা ঃ—কাঁচা মৃন্ময় পদার্থ খুব শুকাইয়া লইয়া আগুনে পোড়াইলে ইহার উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও জান্তব ভাগ যত সহজে দগ্ধ

হইতে পারে, রূঢ় ও খনিজ ভাগ সেরূপ সহজে দগ্ধ হইতে পারে না, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে যে স্থানের মাটি পোড়াইয়া ওজন করিলে যত অধিক কমিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহাতেই উদ্ভিজ্জাংশ প্রভৃতি তিনটি উপাদানের ভাগ অধিক রহিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করা দরকার।

আবাদী জমির মধ্যে উত্তম মধ্যম অধম সকল রকম জমির মাটি পৃথক কাদা করিয়া ঢেলা প্রস্তুত করতঃ খুব শুকাইয়া ও চিহ্নিত করিয়া লইয়া ওজন করিয়া একই স্থানে পোড়াইয়া পুনরায় ওজন করিলে যেটা অধিক কমিবে তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্য অধিক আছে, তাহা যেমন সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, তেমনি ইতিপূর্ব্বে ঐ জমিতে ফসল ফলাইতে গিয়া মাটির বলাবলের যে-যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল তাহা ঐ পোড়ানো মাটির ওজন ফলের সহিত বেশ ঐক্য হইতেছে দেখিলে সহজেই নিঃসংশয় হইতে পারা যাইবে। এই ভাবে ক্রমাগত কয়েকবার বিভিন্ন স্থানের মাটি খুব সতর্কতার সহিত পোড়াইয়া অধিক উর্ব্বর মাটির কত অংশ কমিয়া থাকে, ইহার একটা গড় স্থির করিয়া লইতে পারিলে যে-কোন স্থানের মাটিরই বলাবলের পরিচয় করা সহজ হইয়া থাকে।

জমির উপরের স্তরের মাটিতে অল্প দিন পূর্ব্বের পচা ঘাস লতা পাতা অধিক পরিমাণে থাকে। সেজন্য তাহা পোড়াইলে অধিক কমিবার কথা। এই কারণে উপরের ৬" ইঞ্চি মাটি বাদ দিয়া পরীক্ষা করা দরকার। কুম্ভকারেরা মৃন্ময় পাত্রাদি যে ভাবে পোড়ায়, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে অথবা কুম্ভকারের হাড়ী পাতিলের পাঁজার মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেই কাজ সহজ হইয়া থাকে। যদি কোন স্থানের মাটি পোড়াইবার কালে তাহা হইতে কোন

প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে টের পাওয়া যায়, তবে ঐ স্থানে অল্প দিন পূর্ব্বে কোন জীবজন্তুর শরীর গলিত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। সেরূপ কোন অবস্থা দেখা গেলে ঐ জমিরই বিভিন্ন স্থানের মাটি একাধিকবার সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করিতে হইবে।

ইট ও অন্যান্য মৃন্ময় পাত্রাদি পোড়াইলে সে-সবের ওজন কমিয়া যায় এবং অত্যধিক উত্তাপ পাইলে ঝামা হইয়া থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। আমি ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর ইট পোড়াইবার বৃহৎ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে, অধিক উর্ব্বর জমির মাটির তৈরি ইটই পোড়াইলে অধিক হাল্‌কা হয় এবং আকারেও অধিক কমিয়া যায়। পক্ষান্তরে সেই ইটেই অধিক ভাবে লোনা ধরে। এই লোনা ধরাটা মাটির বলের অন্যতম পরিচায়ক ; তাহা সোরা সারের বিষয় আলোচনা কালে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে।

জল লাগিলে মাটি গলিয়া যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিয়া পোড়াইলে আর গলে না। এরূপ কেন হয় তাহা এখানে বলা হইতেছে। অত্যধিক উত্তাপ পাইলে মাটির উদ্ভিদ-খাদ্য, উদ্ভিদ-অংশ প্রভৃতি হালকা ও জলে সহজে গলনশীল পদার্থ-সমূহ পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় এবং ধাতু চূণ গন্ধক ইত্যাদি খনিজ উপাদানসমূহ গলিয়া গিয়া শক্ত জমাট বাঁধিয়া যায়, যার দরুণ জলে পড়িলেও আর গলিতে পারে না। কড়া পোড়া ইট ও অন্যান্য মৃন্ময় পাত্রাদির সুন্দর আওয়াজ হইতেও মাটিতে যে লোহা প্রভৃতি ধাতবাংশ রহিয়াছে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। নানা ভাবে মাটির ধাতবাংশের প্রমাণ পাওয়া হইতেই আমাদিগকে ভূমি-কর্ষণ সম্বন্ধে ও গাছপালার গোড়ার মাটি সময় সময় খুঁড়িয়া ঢিলা করিয়া দিতে মনোযোগী করিয়া তুলে, ইহা কর্ষণ অধ্যায় পাঠ করিবার কালে বিশদ ভাবে বলা যাইবে।

পরীক্ষার জন্য মাটি পোড়াইতে হইলে বেশ খোলা জায়গার মাটিই

নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কারণ বাগ-বাগিচার ছায়াযুক্ত স্থানের মাটি পোড়াইতে গেলে নানা প্রকারেই ভ্রম জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, নিরক্ষর কৃষক সাধারণতঃ স্থানের স্বভাবজাত আগাছা ও তৃণগুল্মাদির বর্দ্ধিষ্ণুতার অভাব বা আধিক্য দেখিয়াই মাটির বলাবল স্থির করিয়া থাকে। ইহার মধ্যেও লক্ষ্য করিবার অনেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা জানা থাকিলে লাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ঘাস জঙ্গলের মধ্যে এমনও কোন কোন উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা আমাদের প্রয়োজনীয় কোন কোন উদ্ভিদেরই সমশ্রেণীর। সেরূপ কোন উদ্ভিদ দেখা গেলে তথায় প্রয়োজনীয় ঐ ঐ উদ্ভিদের চাষ করিলে তাহা ভালই হইবে বুঝিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত বৃহ ত (বেখুর) আর বেগুন। ইহারা একই শ্রেণীর উদ্ভিদ। যদি কোন স্থানের জঙ্গলে খুব বর্দ্ধিষ্ণু আকারের বৃহতির গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তথায় বেগুনের চাষ করিলে ভালই হইবে মনে করা ভুল নহে।

মাটির বলের অন্যতম সাধারণ পরিচয় এই যে, অধিক উর্ব্বর মাটি প্রায় অধিক শক্ত হয় না। যে-সব স্থানের মাটিতে অধিক কেঁচো বাস করে, ঐ মাটি খুব উর্ব্বর বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ উদ্ভিদের খাদ্য কেঁচোর অতিশয় প্রিয়, তাহা গোময়ের গাদার নিকটে কেঁচোর আধিক্য দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

অম্লযুক্ত মাটি ঃ—ইহাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'য়্যাসিড সয়েল' (Acid Soil) বলা হইয়া থাকে। ইহা সব রকম ফল-শস্যাদির পক্ষেই অত্যন্ত অনিষ্টকারী। যদি কোন স্থানের মাটি অত্যন্ত উর্ব্বরতা গুণসম্পন্ন হইয়াও অম্লযুক্ত হয়, তবে তথায় কোন ফল-শস্যাদি জন্মাইতে গেলে অম্লতাই অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ হয়। এমন স্থান অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে কোন ফল-শস্যাদি জন্মাইতে গেলে গাছগুলি প্রথম কিয়দ্দিন

সতেজে বাড়িয়া উঠিতে থাকিয়া অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ও ইহার কোন প্রতিকার করাও সম্ভব হয় না। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, সে-সব স্থানের মাটিতে অত্যধিক অম্ল বা এসিড থাকাই ইহার প্রধান কারণ। এসব দৃষ্টান্তে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, নূতন কোন স্থান কৃষি-কার্য্যের জন্য নির্ব্বাচন করিতে হইলে তথায় মাটিতে অম্ল আছে কি-না, তাহা সর্ব্বাগ্রেই পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। তারপর অন্যান্য গুণের ভাগ কি আছে, তাহাও দেখিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকগণ মাটিতে অম্ল আছে কি-না তাহা ধরিবার উপায় বলিয়াছেন, ও থাকিলে ইহার প্রতিষেধক স্বরূপ যে-সব উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সে-সব উপায় সাধন করিতে যে অতিরিক্ত অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিতে হয়, তাহা বাদ দিয়া লাভের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া প্রথমেই তাহা খুব সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা দরকার।

মাটির অম্ল ধরিবার উপায়ঃ যে স্থানের মাটি পরীক্ষা করিতে হইবে, সেই স্থানের কতকটা মাটি আনিয়া কাদা করতঃ একটা ঢেলা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ ঢেলা একটা ধারালো ছুরি দ্বারা কাটিয়া দুই ভাগ করিয়া ইহার মধ্যে নীল রঙের লিট্‌মাস (Blue litmus paper) নামক কাগজের এক টুকরা রাখিয়া দুই ভাগ একত্র করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর উহা খুলিয়া দেখিতে হইবে যে, নীল কাগজের টুকরাখানা লাল রং হইয়াছে কি না। যদি সামান্য লাল হয় তবে বুঝিতে হইবে যে, জমি অত্যল্প অম্ল, আর গাঢ় লাল হইয়াছে দেখিলে তাহা অত্যধিক অম্লযুক্ত বুঝিতে হইবে। সামান্য অম্ল থাকিলে তাহাতে সব রকম ফসলই হয়, কিন্তু অত্যধিক অম্লই অকৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ হয় বুঝিতে হইবে। নীল লিট্‌মাস কাগজ বড় বড় এলোপ্যাথিক ঔষধের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সার

সারের পরিচয় ও প্রয়োজনঃ—বিভিন্ন জাতীয় সারের বিশেষ বিশেষ গুণের পরিচয় ও ইহাদের যথাযথ ব্যবহারের উপর কৃষিকার্য্যের লাভ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং সার কি তাহাই অগ্রে জানিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সার কি তাহা বুঝিতে পারিলে, ইহার প্রয়োজন কি তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। উদ্ভিদ শরীরের পুষ্টির জন্য যে-যে উপাদানের প্রয়োজন, তাহা যে বস্তুতে অধিক পরিমাণে আছে, তাহাই সার রূপে জমিতে দিতে পারা যায় ও দিতে হয়। ইহার অর্থ জমির বল বৃদ্ধি করা। মাটির উপাদান বিশেষের অভাব দূর করাই সার ব্যবহার করিবার প্রধান প্রয়োজন। মাটির দোষ-বিশেষের অপসারণ করা অথবা ফলাদি ও শাক-সবজীর স্বাদ ও ফুলের আকার, গন্ধ ও সৌন্দর্য্যের উন্নতিসাধন করার পক্ষেও কোন কোন স্থলে সারবিশেষের ব্যবহার-বাহুল্যের অন্যতম প্রধান প্রয়োজন হইয়া থাকে।

গোময়, গোমূত্র, মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর বিষ্ঠা, মানুষের মূত্র, নানাজাতীয় খৈল, গবাদি পশুর অস্থিচূর্ণ (হাড়ের গুঁড়া) পচা মাছ মাংস, বৃক্ষাদির পচা পাতা লতা ঘাস ইত্যাদি, পচা পানা ও নানা প্রকার জলজ উদ্ভিদ, পুরাতন পুকুর ও খাল নালার নীচের পঙ্ক (পাক মাটি), ছাই চুন ইত্যাদি কয়টি দ্রব্যই সচরাচর সার রূপে ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তাছাড়া পচন ধর্ম্মশীল বস্তুমাত্রই কোন-না-কোন আকারে সারের কাজে লাগিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক চেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে এমন অনেক জিনিস সারের কাজে ব্যবহৃত হইতেছে, যাহা এত দিন খুব সুলভ হওয়া

সত্ত্বেও কেহ তাহা ব্যবহার করে নাই। কচুরি পানাই ইহার এক সকলের জানাশুনা দৃষ্টান্ত। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত নানারূপ সারের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এক কথায় বলিতে গেলে বৈজ্ঞানিক চেষ্টার ফলে এখন সারের অভাব বহুল পরিমাণে দূর হইয়াছে এবং টাকা পয়সা খরচ করিতে পারিলে ঘরে বসিয়াই যত ইচ্ছা সার আমদানী করিতে পারা যায়। কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে কোন কোন বিদেশী কোম্পানীর দোকানে নানা জাতীয় সার কিনিতে পাওয়া যায়।

সারের সংখ্যা বহু হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সকল সারের উপাদান প্রায়ই এক রূপ নহে এবং সব জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষেও কোন এক জাতীয় সার সমান প্রয়োজনীয় নহে। এই জ্ঞানের অভাবে কেবল ভাল ফল পাইবার আশায় আন্দাজের উপর অধিক পরিমাণে সার ব্যবহার করিতে গেলে আমাদের অজ্ঞাতসারেই নানারূপ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। বলা বাহুল্য, বার বার কেবল ক্ষতি হইতে থাকিলে কৃষির উন্নতিসাধন করা দূরের কথা, ঐকাজে যতটা উদ্যম ও ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক, তাহা রক্ষা করাই কঠিন।

সারের কাজে যত জিনিস জমিতে দেওয়া যায়, ইহার সবটাই যে উদ্ভিদে খায় একথা বলা যাইতে পারে না। গোময় ইত্যাদি প্রত্যেক সারময় বস্তুর মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য ভাগ যাহা, তাহা অতিশয় সূক্ষ্মপদার্থ। বৈজ্ঞানিকগণ সে-সব খাদ্যাংশ নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা (১) কার্ব্বন (Carbon), (২) অক্সিজেন (Oxygen), (৩) নাইট্রোজেন (Nitrogen), (৪) সল্‌ফার (Sulphur), (৫) ফস্‌ফরাস (Phosphorus), (৬) পটাসিয়ম (Potassium), (৭) ম্যাগ্নেসিয়ম (Magnesium), (৮) ম্যাঙ্গেনিজ (Manganese), (৯) ক্লোরিন (Chlorine), (১০)

সিলিকা (Silica), (১১) আয়রণ (Iron), (১২) ক্যালসিয়ম (Calcium)।

উল্লিখিত বারটি উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন, পটাসিয়ম এবং ফস্‌ফরাস এই তিনটিই খুব দরকারী, অর্থাৎ উদ্ভিদ শরীর গঠনে অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হয়। বাকীগুলি মাটির স্বাভাবিক অবস্থায় যতটুকু থাকে, তদ্দ্বারাই কাজ চলে বলিয়া বিশেষ ভাবনায় পড়িতে হয় না। সুতরাং প্রথমোক্ত তিনটি উপাদানকেই অগ্রে ভালরূপ চিনিয়া লওয়া দরকার।

নাইট্রোজেনঃ—ইহাকে উদ্ভিদ-প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ। সোরা ইহার একটি উৎপাদক পদার্থ। সেজন্য ইহাকে সোরাজান নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম যবক্ষারজান। সোরা বা সোরাময় কোন পদার্থ জমিতে দিলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে উক্ত নাইট্রোজেন নামক বায়বীয় পদার্থের আবির্ভাব আপনা হইতেই হইয়া গাছপালাকে সতেজ করিয়া তুলে। সোরা জিনিসটা প্রায় সকলেরই পরিচিত। গোশালা কিছুদিন অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে মেঝের উপর লবণের মত সাদা খুব হাল্‌কা একটা জিনিস ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়, ইহাই সোরা। সোরা সব স্থানের মাটিতেই অল্পবিস্তর রহিয়াছে। ইহা না থাকিলে স্বভাবজাত গাছপালা তৃণ জঙ্গল যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে পারিত না। যে-সব স্থানের জমিতে যত অধিক পরিমাণে সোরা আছে, সে-সব স্থান বিশেষ বিশেষ ফল-শস্যাদির জন্য বিখ্যাত। পাটনা অঞ্চলে গিয়া দেখিলে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সোরা ভারতবর্ষের মাটিতে অত্যধিক পরিমাণে আছে বলিয়াই যে ইহা শস্যশ্যামলা দেশ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, একথা স্বতঃই মনে হইয়া থাকে।

সোরা বড় রকমের রাসায়নিক পদার্থ এবং একটি বিশিষ্ট পণ্যদ্রব্য। ইহার ইংরেজী নাম 'নাইট্রেট অব পটাস'। ইহা বারুদ ও দেশলাই নির্ম্মাণের এক অপরিহার্য্য উপাদান। এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের লোকই ভারতবর্ষজাত সোরা দ্বারা সে-সব কাজ চালাইতে বাধ্য হইত। তখন ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের এক শ্রেণীর শ্রমজীবী মাটি হইতে কৌশলক্রমে সোরা বাহির করিয়া বিক্রয় করিত এবং ইহাই তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের এক প্রধান উপায় ছিল। মোট কথা, সোরার ব্যবসা তখন ভারতীয় শ্রমজীবীদিগের একচেটিয়া ছিল। বৈজ্ঞানিক চেষ্টার ফলে এখন সব দেশেই সোরার কাজ অন্য উপায়ে সাধিত হইতেছে।

পটাসিয়ম ঃ—ইহা ক্ষার উৎপাদক একটি মৌলিক ধাতু। এই ক্ষার শস্য ও বৃক্ষাদির পুষ্টিসাধনে প্রয়োজন হয়। সে জন্য ইহাকে কেহ কেহ ক্ষারজান নামে অভিহিত করেন। ইহা পৃথক্ ভাবে কখনও পাওয়া যায় না। ইহা কলাগাছ ইত্যাদি কোন কোন উদ্ভিদের ভস্মে (ছাইয়ে) যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। সেজন্য ধোবারা কাপড় ধুইবার কাজ কলার পাতা ও খোলের ছাই দ্বারাই অধিকভাবে সমাধা করিত এবং এখনও পল্লীগ্রামে দরিদ্র লোকের মধ্যে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কৌশল জানা থাকিলে ছাই হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাসিয়ম বাহির করিতে পারা যায় এবং তদ্বারা উদ্ভিদ-শরীর গঠনে ইহার প্রভাব কিরূপ তদ্বিষয়ে একটা স্থির ধারণায় উপনীত হইতে পারা যায়। ইহা বড় রকমের রাসায়নিক দ্রব্য। নানা কাজে ইহার বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পটাসিয়াম-গঠিত কোন কোন দ্রব্য দেশলাই নির্ম্মাণের এক অপরিহার্য্য উপাদান।

ফস্‌ফরাস ঃ—স্বাভাবিক ও পৃথক অবস্থায় ইহা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট—সাদা, হলদে ও লাল রঙের ফস্‌ফরাস

আছে। ইহা মোমের ন্যায় শক্ত এবং ছুরি দ্বারা কাটা যায়। বাতাসের সংস্পর্শে ফস্‌ফরাস জ্বলিয়া উঠে। ইহা নানা প্রকার ভেষজ গুণসম্পন্ন। চিকিৎসা গ্রন্থাদিতে ইহার পুষ্টিকর ও উদ্দীপক গুণের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লাল ফস্‌ফরাস দেশলাই নির্ম্মাণের একটি প্রধান উপাদান। মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবজন্তুর অস্থিতে (হাড়ে) অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া ইহা 'হাড়জান' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ফস্‌ফরাস-গঠিত খাদ্য যেমন মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বলকারক তেমনি উদ্ভিদ-শরীরের পক্ষেও আশ্চর্য্যরকমের পুষ্টিকর। হাড়ের গুঁড়ার মধ্যে ফস্‌ফরাসের সঙ্গে বৃক্ষাদির অন্যতম খাদ্য ক্যাল-সিয়মও রহিয়াছে। সেজন্যই হাড়ের গুঁড়া সার রূপে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল গুণের পরিচয় প্রাপ্তির সময় হইতেই দিন দিন ইহার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে।

উক্ত তিনটি উপাদান খৈল ইত্যাদি সারসংজ্ঞক কোন পদার্থের মধ্যেই একাধারে আবশ্যক পরিমাণে পাওয়া যায় না। এ সকলের কোন কোনটিতে ইহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। কাজেই দেখা আবশ্যক যে, কোন্ বস্তুতে উপরের লিখিত উপাদান কোন্‌টি কি পরিমাণে আছে, অথবা কোন উপাদানবিশেষের সম্পূর্ণ অভাব আছে কি না।

মনুষের খাদ্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে আমরা যত জিনিষ আহার করি, তাহার মধ্যে কোনটি আমাদের শরীরের উত্তাপ রক্ষার কাজ করিয়া থাকে, কোনটি শরীর যন্ত্র ও মাংস-পেশীসমূহের বলবর্দ্ধক, কোন্‌টি চর্ব্বিবর্দ্ধক এবং কোন্‌টি অস্থিগঠন গুণবিশিষ্ট। উক্ত চতুর্ব্বিধ গুণের কোন একটা বা ততোধিক গুণের অভাবযুক্ত খাদ্য পরিমাণে প্রচুর হইলেও যেমন আমরা শরীরের ক্ষয় নিবারণ করিতে পারি না এবং শরীর দুর্ব্বল বা

নানা রোগে আক্রান্ত হইবার উপক্রম হয়, তেমনি উদ্ভিদ-শরীরেরও পুষ্টি ও ঠিক ঠিক সুস্থতা রক্ষার জন্য যে-যে উপাদানযুক্ত সারের বিশেষ দরকার, ইহার এক বা ততোধিক উপাদান-গঠিত সারের অভাব ঘটিলে, তাহাও উচিতমত বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কাজেই আশানুরূপ ফল ফুল বা শস্যাদি প্রদানে অক্ষম হইয়া পড়ে। সেজন্য অধিকাংশ স্থলেই এক সঙ্গে একাধিক সার ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হয়। ইহারই জন্য প্রত্যেক সারময় বস্তুর বিশেষ বিশেষ উপাদানের পরিচয় করিয়া লওয়া ও কোন্ শ্রেণীর উদ্ভিদের জন্য কোন্ কোন্ উপাদানযুক্ত সারের বিশেষ প্রয়োজন তাহা অগ্রে জানিয়া লওয়া দরকার। নিম্নে সেই সকলের পরিচয় ক্রমে দেওয়া যাইতেছে।

গোময়ঃ—সার বলিলে আমাদের দেশের লোকে প্রধানতঃ গোময়ই বুঝিয়া থাকে। ইহার কারণ, সকলেই একমাত্র যার যার গরুর মলই ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত। অর্থাভাব ও অন্যান্য সারের গুণাগুণ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক ধারণার অভাবও একমাত্র গোময়-সার ব্যবহার করিবার অন্যতম প্রধান কারণ। সেজন্য অগ্রে দেশের প্রচলিত সার—গোময়ের গুণাগুণই ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

গোময়-বিশ্লেষণকারী ব্যক্তিগণের মতে একশত মণ পচা গোময়ের মধ্যে থাকে ১৬ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৩ পাউণ্ড পটাস ও ১৬ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড। গরুর খাদ্যবস্তুর গুণানুসারে ইহার কতকটা ইতরবিশেষ হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কারণ মাঠের ঘাসখাদক গরুর মল অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে খৈল ভূষি চুনি ইত্যাদি পুষ্টিকর বস্তুখাদক গরুর মলে যে ভাল উপাদান অধিক থাকিবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আবার অল্পবয়স্ক গরুর মল অপেক্ষা বৃদ্ধ গরুর মলে বল অধিক থাকাও খুব স্বাভাবিক। কারণ তরুণবয়স্ক গরুর খাদ্য-বস্তুর

সারাংশ তাহাদের শরীর গঠনে যত অধিক ব্যয়িত হয়, বৃদ্ধ গরুর ততটা হইতে পারে না। ইহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, গোময়-সারের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া গোময় যত্নে রাখার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যথেচ্ছ ভাবে রক্ষিত অনবরত রৌদ্রতপ্ত ও বৃষ্টির জলে ধৌত গোময়ের সারপদার্থ যে অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায় তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়। অথচ আমাদের চাষীরা সেরূপ গোময়ই অধিক ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। সেজন্য আশানুরূপ ফল বা যতটা ফল পাওয়া উচিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। চাষবাসের কাজে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে স্মরণ রাখা উচিত যে, গোময় ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাইতে হইলে রৌদ্রতাপ ও বৃষ্টির জলের হাত হইতে গোময়কে রক্ষা করাই প্রধান কাজ।

গোময় রক্ষা—৫।৬ মাসের উৎপন্ন গোময় ধরিতে পারা যায় এই আকারের দুই ফুট গভীর গর্ত্ত করিয়া ইহার তলাটা দুরমুস দ্বারা ভাল রূপ পিটিয়া লইয়া ও বাহিরের বৃষ্টির জলের স্রোত যাহাতে গর্ত্তের ভিতর গিয়া পড়িতে না পারে ইহার জন্য গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে শক্ত আইল বাঁধিয়া ও উপরে একখানা চালা বা আবরণ দিয়া লইয়া তথায় প্রতিদিনের গোময়, গোমূত্র ও গোশালার সমস্ত আবর্জ্জনা যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। এই ভাবে গর্ত্ত পূর্ণ হইলে তদনুরূপ আর একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পূর্ব্ববৎ নিয়মে গোময় রক্ষা করা দরকার। তাহা হইলে প্রথম গর্ত্তের গোময় একমাস পরে জমিতে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হয় ও ব্যবহার করিতে পারা যায়। স্থানে স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই ভাবে সযত্নে রক্ষিত পঞ্চাশ মণ গোময় দ্বারা যতটা ফল পাওয়া যায়, সর্ব্বদা রৌদ্রতপ্ত ও বৃষ্টির জলে স্নাত একশত মণ দ্বারাও তত ফল পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ যত্নে রক্ষিত গোময় কৃষিকার্য্যের পক্ষে এক অমূল্য জিনিস। ইহার গাদা ভাঙ্গিতে

আরম্ভ করিলে দেখা যায়—বর্ণ উজ্জ্বল চকচকে, তীব্র গন্ধবিশিষ্ট একটা তেজস্কর পদার্থ। সেই পচা গোময় শরীরের সামান্য ক্ষত কোন স্থানে লাগিলে অসহ্য জ্বালা ধরে। জমিতে ছড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে তুই একবার চাষ-মৈ দিয়া রাখিলে ইহার তেজে মাটির দ্রবণ-কার্য্য শীঘ্র সাধিত হয়, যাহা হইতে মাটির মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদান যতটুকু থাকে তাহাও সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যোন্মুখ হইতে পারে। খোলা জায়গায় যথেচ্ছভাবে রক্ষিত গোময় তেজ ও গন্ধবিহীন অসার পদার্থ। ইহার নিম্নস্তরের অংশ বর্ণের উজ্জ্বলতাবিহীন এক প্রকার মাটির মত এবং উপরের স্তরের অংশ শুকাইয়া ঘুঁটে হইয়া যায় বলিয়া তদ্দ্বারা বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইতে পারে না।

কাঁচা গোময়ের অপকারিতা ঃ—গোময়ের মধ্যে উদ্ভিদ-খাদ্যভাগ যাহা আছে, তাহা গোময় পচিয়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কাজে লাগিতে পারে না। কাজেই ইহার জন্য দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করিতে হয়। সে যাহা হউক, কাঁচা গোময় জমিতে ছড়াইবার অব্যবহিত পরে তথায় কোন শস্যাদির বীজ বপন করিলে তাহাতে নানা রোগের সৃষ্টি ও জমিতে কীটের আবির্ভাব হইবারও এক প্রধান কারণ হইয়া থাকে। এ সকল অবস্থা হইতেও গোময় যত্নের সহিত গাদা দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবার আবশ্যকতা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, সোরা একটি বড় রকমের পণ্যদ্রব্য। বস্তুতঃ ইহা নানা কাজে লাগে বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায়। এতদ্দ্বারা কাহারও মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, গোময়ের পরিবর্ত্তে সোরা কিনিয়া ব্যবহার করিলেও কাজ চলিতে পারে। আমরা জানি বাজারের কেনা সোরা জমিতে দিলে তদ্দ্বারা কিছু কাজ হয়। কিন্তু গোময়ের মধ্যে সোরা ব্যতীত পটাস ও ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ যাহা আছে তাহার ফল হইতে বঞ্চিত

হইতে হয়। সেজন্য গোময় যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা বিশেষ দরকার।

গো-মূত্র:—ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের ভাগ রহিয়াছে। ইহা গোময়ের সহিত মিশ্রিত হইলে অধিকতর বলশালী ও শীঘ্র কাজের উপযোগী হইয়া উঠে। সেজন্য ইহাও যত্নের সহিত রাখিয়া গোময়ের গাদার উপর ঢালিয়া দিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, কৃষিজীবীমাত্রেই গোশালার পিছন দিকে ভিটা সংলগ্ন করিয়া কিছু দূরে দূরে বড় বড় হাঁড়ি বসাইয়া রাখিত ও গোমূত্র গিয়া তাহাতে সঞ্চিত হইত এবং হাঁড়িগুলি পূর্ণ হইলে উঠাইয়া লইয়া গোময়ের গাদার উপর ঢালিয়া দিত। দুঃখের বিষয়, এখন সে-সব দৃশ্য প্রায় দেখা যায় না। ইহা দেশের লক্ষ্মী ছাড়িয়া যাইবারই অন্যতম নিদর্শন।

সরিষার খৈল:—ইহা খুব তেজস্কর ও ফলপ্রদ সার। এতদ্দেশে যত জিনিস সারের কাজে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে আমি ইহাকে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করি। কারণ ইহা কোমল-শরীর উদ্ভিদ ও বৃহজ্জাতীয় কাষ্ঠপ্রদ বৃক্ষাদি উভয়ের পক্ষেই অতিশয় ফলপ্রদ ও নির্দ্দোষ সার। নির্দ্দোষ বলি এই জন্য যে, খৈল-সারের জমির সবরকম ফল ও শস্যাদির গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তাহাতে কীটের উপদ্রব স্বভাবতই কম হয়। তা-ছাড়া খৈল সার দেওয়া জমির উৎপন্ন শাক-সব্‌জী, বারমেসে লঙ্কা ও ফলাদি সবই খাইতে সুস্বাদু হইয়া থাকে। ইহাতে গোময়ের অনুপাতে নাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্‌ফরাসের ভাগ অনেক অধিক আছে বলিয়াই পাঁচ মণ গোময়ের কাজ এক মণ খৈল দ্বারা সাধন করা যায়। শক্ত এঁটেল মাটিকে নরম ও শীঘ্র কার্য্যোন্মুখ করিতে খৈলের শক্তি অপরিসীম এবং এই কারণবশতঃই সেই ধরণের মাটিতে খৈল-সার ব্যবহারের ফল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়া থাকে।

অন্যান্য জাতীয় খৈল :—যথা, তিল, তিসি, রেড়ি, চিনাবাদাম ইত্যাদি নানা প্রকারের খৈল রহিয়াছে। ইহারা সবই প্রায় এক-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। কিন্তু ইহাদের এক একটা কোন কোন উদ্ভিদ-বিশেষের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ এবং কোন কোনটা কোন কোন উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী। আবার স্থানভেদে কোন কোন জাতীয় খৈলের উপযোগিতা এবং কোন কোনটার অনুপযোগিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সে-সবের বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ ফসল-বিশেষের অবাদ-প্রণালী পাঠ করিবার কালে পাওয়া যাইবে।

হাড়ের গুঁড়া (Bone meal)—অধুনা ইহার ব্যবহার একপ্রকার দেশব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের পরীক্ষায় হাড়-সারের অপরিসীম বলের পরিচয় পাওয়া হইতে বহু স্থানেই প্রায় সবরকম শস্যাদির জমিতে —বিশেষ ভাবে নালিয়া ও ইক্ষুর জমিতে এবং চা ও ফল-বাগানে ইহার ব্যবহার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। গোময়, খৈল ইত্যাদির প্রধান উপাদান যেমন নাইট্রোজেন, তেমনি হাড়ের প্রধান উপাদান ফস্‌ফরাস, একথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ইহা খুব ফলপ্রদ সার, একবার জমিতে দিলে ইহার ক্রিয়া তিন-চারি বৎসর পর্য্যন্ত এক প্রকার অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহার প্রমাণ—দেশে পাট-চাষের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক গ্রামেরই বাহিরে মরা গরু ফেলিবার জন্য যে-সব চিরপতিত স্থান ছিল, তাহা বহুদিন হইতে নালিয়া জমিতে পরিণত হইয়াছে। সে-সব জমিতে এখনও সাধারণ যত্নে প্রতি বৎসরই যেরূপ ভাল নালিয়া হয়, অন্যান্য জমিতে সেরূপ ভাল নালিয়া খুব কমই হইয়া থাকে। অত্যন্ত নীরস জমি বলশালী করিয়া তুলিবার পক্ষে হাড়-সারের ক্ষমতা অপরিসীম, তাহা আমরা বহু স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

আস্ত হাড় জমিতে দিলে তাহা পচিয়া মাটির সহিত মিলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা বিশেষ কোন ফল হইতে পারে না।

এই কারণ বশতঃ তাহা গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য হওয়া যায় এবং যেখানে যত শীঘ্র ফল পাওয়া দরকার সেখানে তত অধিক মিহি গুঁড়া ব্যবহার করা আবশ্যক।

হাড় গুঁড়া করা খুব কঠিন কাজ। এমন কি তাহা হাতে কুটিয়া গুঁড়া করিতেই পারা যায় না। ইহার জন্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইংরেজ কোম্পানী পরিচালিত কয়েকটা কল (Bone-dust Mill) রহিয়াছে। ইহারা কলের সাহায্যে হাড় গুঁড়া করিয়া সর্ব্বত্রই সরবরাহ করিয়া থাকে। সব জায়গায়ই এমন এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে, যাহারা স্থানে স্থানে খুঁড়িয়া মৃত গো-মহিষাদির হাড় কুড়াইয়া লইয়া গিয়া সে-সব উক্ত কলগুলিকে যোগাইয়া থাকে। এই হেতু এখন পল্লীগ্রামের বাহিরে মৃত গো-মহিষাদির হাড় দু'চার দিনের অধিক থাকিতে পারে না। ইহাতে যে দেশের জমির স্বাভাবিক বলের হানি হইতেছে, তাহা প্রত্যেক কৃষির উন্নতিকামী ব্যক্তির লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত মনে হয়।

গন্ধক-দ্রাবকে (sulphuric acid) আস্ত হাড় চুবাইয়া রাখিলে তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং তাহা জমিতে দিলে সদ্য ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে নাকি এই উপায় খুব প্রচলিত জানিয়া আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া সত্ত্বেও অত্যধিক খরচ পড়ে বলিয়া একবার করিয়াই বিরত হইতে হইয়াছিল। গন্ধক-দ্রাবকের মূল্য পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে বহু গুণ বেশী বলিয়াই এদেশের লোকের পক্ষে ঐ পন্থা অবলম্বন এক প্রকার দুঃসাধ্য।

হাড়ের গুঁড়া জমিতে দিলে তাহা উদ্ভিদের পোষণোপযোগী হইতে খৈল গোময় অপেক্ষা অনেক অধিক সময় লাগিয়া থাকে। সেজন্য তাহা বীজ বপন বা চারা রোপণের অন্ততঃ দেড় মাস পূর্ব্বে

জমিতে ছড়াইতে হয় এবং যেখানে গাছপালা যত কোমল শরীর সম্পন্ন ও সুখী জাতীয় হয়, সেখানে তত অধিক সময় হাতে রাখিয়া ইহা ছড়ানো দরকার। পরীক্ষা-স্বরূপ আমরা ক্রমাগত ত্রিশ বৎসর যাবৎ নালিয়া তামাক লঙ্কা ইক্ষু কপি অত্যন্ত অনুর্ব্বর জমিতে ফলাইতে গিয়া ইহার ব্যবহার করিয়াছি ও বৃহজ্জাতীয় প্রাচীন বয়সের নিস্তেজ বৃক্ষাদির গোড়ায় দিয়া সকল স্থানেই আশাতিরিক্ত ফল পাইয়াছি। একারণ নিঃসংশয়েই বলিতে পারিতেছি যে, ইহা খুবই ফলপ্রদ সার।

চূণ :—ক্যাল্‌সিয়ম (calcium) নামক রাসায়নিক উপাদান চূণ হইতেই জাত। ইহার জন্য কেহ কেহ ইহাকে চূণজান নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে প্রত্যেক উদ্ভিদ-শরীর গঠনেই ইহার প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাহা অতি সামান্য এবং যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অভাব কদাচিৎ কোন স্থানে হইয়া থাকে। তবুও আমরা স্থানে স্থানে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি। কীটের উপদ্রব নিবারণেই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা হইতে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, যে-সব স্থানে গাছপালা ধ্বংসকারী কীটের প্রভাব অধিক, তথায় চূণ ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। আরও দেখিয়াছি, বাগ-বাগিচার যে-সব স্থান অধিক ছায়াযুক্ত বলিয়া বার বার কোদালি করিলেও মাটির শৈত্য দোষ ছাড়াইতে পারা যায় না বলিয়া বা মাটির উপযুক্ত উত্তাপের অভাবে গাছপালার বর্দ্ধিষ্ণুতা কমিয়া গিয়া নিস্তেজ ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে, তথায় একবার কোদালি করিয়া মাটির উপর কতক কলি চূণের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় কোদালি করিয়া দিলে মাটি আপনা হইতেই কতকটা উত্তপ্ত ও ঝর ঝরে হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলিও সতেজ ভাব ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে যে-সব স্থানের মাটিতে অম্ল দোষ আছে, তথায় চূণই ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিষেধকের কাজ করে।

চূণ ব্যবহারে সাবধানতা :—আমার মতে কীটের উপদ্রবের প্রতিষেধক-স্বরূপ চূণ অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু যে-স্থানে খৈল, গোময়, হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিবার বিশেষ দরকার আছে, তথায় সে-সব সার ব্যবহার করিবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে চূণ ছড়ানো সঙ্গত। চূণ ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পরে কোন সার ব্যবহার করিলে চূণের স্বাভাবিক তেজে সারের গুণকে যে কতকটা নষ্ট করিয়া দিবে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন মনে হয় না। তেমনি সার ব্যবহার করিবার অব্যবহিত পরেও চূণ ব্যবহার করিলে সারের গুণকে হ্রাস করিয়া থাকে। কোন ফসলের জমিতে চূণ ব্যবহার করা অভিপ্রেত হইলে আমরা ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে চূণ ছড়াইয়াই লাঙ্গল দিয়া রাখি। তেমনি আম কাঁঠাল ইত্যাদি কোন ফলের গাছের গোড়ায় ও ফলের মরসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চূণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। চূণ ছড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল দিয়া বা কোদালি করিয়া রাখিলে বৃষ্টিপাত হইলেই চূণের তেজটা মাটির অনেকটা নীচে নামিয়া কীট বা কীটাণু ধ্বংস করিয়া থাকে।

মানুষের বিষ্ঠা :—ইহা খুব আশুফলপ্রদ সার, অর্থাৎ গোময়, খৈল ইত্যাদি অপেক্ষা অনেক শীঘ্র কাজ করিয়া থাকে। ইহাতে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। কপি, বেগুন, লাউ, কুমড়া, সীম ইত্যাদি সব্‌জী ও মরসুমী ফুলের চাষের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ সার। দুঃখের বিষয়, ইহা দুর্গন্ধযুক্ত ও অস্পৃশ্য পদার্থ ভাবিয়া এতদঞ্চলে প্রায় কেহই ইহার ব্যবহার করে না। সব্‌জী-চাষীর পক্ষে আমার মনে হয় ইহার মত ক্ষতির বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ আমরা চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ সে-সব সব্‌জীর জমিতে সারের কাজে রীতিমত প্রণালীবদ্ধভাবে বিষ্ঠা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, বিষ্ঠা-সারের জমির কপি, শালগম, বেগুন, লাউ, কুমড়া,

সীম, ঝিঙ্গা বারমেসে লঙ্কা ইত্যাদির গাছগুলি যেমন নিখুঁত চেহারা ও দ্রুত বৃদ্ধিশীল এবং ফলবান্ হয়, এবং সে-সব খাইতে যেমন সুস্বাদু হয়, অন্যান্য সার দিয়া সেরূপ করিতে গেলে একটু অধিক ব্যয় ও আয়াস স্বীকার না করিলেই চলে না।

এখন যে সূত্র অবলম্বনে সব্জী চাষে বিষ্ঠা-সার ব্যবহারে আমার আগ্রহ অত্যন্ত বাড়িয়াছিল তাহাও একটু বলা আবশ্যক মনে করি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা, যখন আমরা বিষ্ঠা-সারের গুণাগুণ কিছুই অবগত ছিলাম না তখন আমাদের একটা মেটে পায়খানা,—যেখানে এক বৃহৎ পরিবারের লোক ক্রমাগত ৩০।৪০ বৎসর মলত্যাগ করিয়াছিল, তাহা স্থানান্তরিত করা হয়। মেটে পায়খানা মানে যেখানে জমিতে বসিয়াই মলত্যাগ করিতে হয়। আমাদের অঞ্চলে পল্লীগ্রামে ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি। সে-সব পায়খানার মল দু'চার দিন পর পর কোদাল দ্বারা কতক মাটিসহ চাঁচিয়া তুলিয়া কোন একধারে স্তূপাকারে রাখিয়া দেওয়াই রীতি। তাহাতে কিছুদিন যাইতে না যাইতে ময়লা মাটি ফেলিবার স্থানটা ক্রমে উচ্চ ঢিবির আকার হইয়া উঠিতে থাকে। আমাদের পায়খানাটা বহু কালের হওয়াতে ইহার ময়লা ফেলিবার স্থানটাও ৪০।৫০ ফুট লম্বা ও ৪।৫ ফুট উচ্চ এক বৃহৎ মেটে দেওয়ালের মত হইয়া গিয়াছিল। ঐ মাটি কাটাইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া তিন কাঠার মত জায়গা সমতল করিয়া লওয়া হয়। ইহাব পর মাসাধিক কাল সেই স্থানে কিছুই করা হয় নাই। ইতিমধ্যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেলে তথায় ঘাস ও আগাছার প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িতেছে দেখিয়া সে-সব নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে তথায় রীতিমত হাল-চাষ করাইয়া শতাধিক বারমেসে বেগুনের চারা রোপণ করিয়াছিলাম। তাহাতে গাছগুলি যেরূপ সতেজ ও নিখুঁত এবং অজস্র ফলবান্ হইয়াছিল তেমন দৃশ্য আমি ইতিপূর্ব্বে বাজারে

কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই ঘটনা হইতে ক্রমে সবরকম সব্জী চাষেই বিষ্ঠা-সার ব্যবহারে আমাকে অত্যন্ত আগ্রহশীল করিয়া তুলে। কেবল তাহাই নহে, ইহাতে আমার কোন ভুল হইতেছে কিনা তাহা বুঝিবার জন্য আমি কলিকাতায় যাই এবং তন্নিকটবর্ত্তী সব্জী-চাষী—বিশেষভাবে বেগুন-চাষীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বেগুন চাষে বিষ্ঠাই যে সর্ব্বোত্তম সার একথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারি। ইহার পর ক্রমাগত কয়েক বৎসর বিষ্ঠা-সার নানাভাবে বেগুন ও অন্যান্য সব্জী চাষে ব্যবহার করি ও ইহার ফলস্বরূপ "বেগুন গাছে বিষ্ঠা-সারের প্রভাব" নাম দিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত করি। ইহার পর সব্জী চাষে বিষ্ঠাই সর্ব্বোত্তম সার এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইতিমধ্যে দুই বার পায়খানা স্থানান্তরিত করিয়া সেই সেই স্থানে অদ্য পর্য্যন্ত একই প্রকার আগ্রহের সহিত বেগুন, কপি, শালগম, লাউ, সীম ইত্যাদি আবশ্যক শাক-সব্জী ফলাইয়া আসিতেছি এবং বাড়ীর লোকের মল যাহাতে একটুও অপচয় হইতে না পারে ইহার জন্য পায়খানার দুই ধারে ছোট নালা কাটাইয়া ইহার একধার হইতে ময়লা-মাটি ফেলিয়া বোঝাই করাই নিয়ম করিয়া লইয়াছি। বিষ্ঠা অগভীর গর্ত্তে ফেলিয়া কিঞ্চিৎ মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তাহা তিন মাস পরই জমিতে ব্যবহার করিতে পারা যায়। তাহাতে এই সুবিধা হয় যে, সমস্ত নালা ভর্ত্তি হইতে না হইতেই প্রথমে যেখান হইতে ময়লা বোঝাই করিতে আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া অনায়াসেই জমিতে ব্যবহার যায়। যাঁহারা পাকা পায়খানায় বসিয়া মলত্যাগ করিতে অভ্যস্ত তাহারা পাশাপাশি দুইটা পায়খানা করিয়া লইলে অনায়াসেই উপরের লিখিত নিয়ম অনুসরণ করিতে পারেন, অর্থাৎ ছয় মাস একটাতে মলত্যাগ করিয়া তাহা বন্ধ করত ময়লার উপর কতক মাটি চাপা দিয়া অপরটাতে

মলত্যাগ করিতে থাকিলে তিন মাস পরই প্রথমটার ময়লা অনায়াসেই জমিতে ব্যবহার করিতে পারিবেন। আমরা ইহারও যতটা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে অনায়াসেই বলিতে পারিতেছি যে, সেরূপ করিলে ময়লার দুর্গন্ধ বা অস্পৃশ্য-বোধ মোটেই থাকে না। পক্ষান্তরে যার যার পরিবারের ময়লা সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ব্যবহার করিলে পরিবারের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার কতক সহায়তা করিবেই, যাহাকে মনুষ্যজাতির জীবনধারণের এক প্রধান লক্ষ্যের বিষয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, এবং যাহা লাভ করা মানুষের বিশেষ আকাঙ্ক্ষার বিষয় হওয়া উচিত মনে হয়।

কৃষির উন্নতিকামী শিক্ষিত পাঠকের অবিদিত নাই যে, বড় বড় শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিরাট্ আকারে সব্জী চাষ করা হইয়া থাকে ও তাহা হইতে প্রতিবৎসর শহরের বাজারে হাজার হাজার টাকা মূল্যের শাক-সব্জী আমদানী হইয়া থাকে। এই সকল শাক-সব্জীর অধিকাংশই বিষ্ঠা-সারের দ্বারা উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে, এই সকল সব্জী চাষীদের বিষ্ঠা-সার ব্যবহারে আগ্রহ দেখিয়া স্থানে স্থানে মিউনিসিপ্যালিটি, জেলখানা ও সৈন্য-নিবাসের ময়লা বিক্রয় করা তাহাদের একটা সুন্দর আয়ের পথ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চাষীরা মেথরের সাহায্যে ময়লা লইয়া গিয়া স্থানে স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখে ও সময়মত তুলিয়া জমিতে ব্যবহার করে। যে-সব সব্জী-চারা সারিবন্দী করিয়া রোপণ করিতে হয় (যেমন কপি, বেগুন ইত্যাদি), সে-সবের বিশ্রাম সময়ে চারা রোপণের স্থান ঠিক করতঃ চাষীরা তথায় ছোট আকারের নালা করিয়া তাহা কাঁচা বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ করিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখিয়া দেয় ও যথাসময়ে জমি প্রস্তুত করিয়া চিহ্নিত স্থানে চারা রোপণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি খবরের কাগজের মারফতে জানা গিয়াছে যে, কোন কোন স্থানে নাকি সব্জী-বাগের মধ্যে খুব গভীর পুষ্করিণী খনন করিয়া ইহার জলে

শহরের ময়লা নিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয় ও আবশ্যকমত সেই পুষ্করিণীর জলই বাগানে সিঞ্চিত হইয়া থাকে এবং এই উপায়েই নাকি লাভের পথ অধিক সুগম হইতেছে। যাহা হউক, এতদ্দারা বিষ্ঠা-সারের প্রভাব কত দূর বাড়িয়াছে, তাহা বুঝিবার অত্যন্ত সুবিধাই হইতেছে।

মানুষের প্রস্রাবঃ—ইহাও অত্যন্ত ফলপ্রদ সার। ফস্‌ফরাস ও নাইট্রোজেন দুইই ইহাতে বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে ইহার ব্যবহার কোথাও হয় বলিয়া জানিতে পারি নাই। এতদ্দারা এদেশের চাষীরা প্রস্রাবের গুণ অবগত নহে বলিয়াই মনে হয়। সেজন্য ইহার ব্যবহার-প্রণালী সম্বন্ধেই অগ্রে অলোচনা করা দরকার। বিষ্ঠা ব্যবহার করিতে হইলে দুর্গন্ধ ইত্যাদি যে সকল অসুবিধা ও বাধা জন্মাইয়া থাকে প্রস্রাব ব্যবহারে সে-সব অসুবিধা মোটেই নাই।

সদ্যজাত প্রস্রাব অত্যন্ত তেজস্কর পদার্থ, যাহার দরুণ তাহা তখন তখনই কোন গাছপালার গোড়ায় দিলে ইহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। আবার প্রস্রাব খোলা জায়গায় রাখিয়া দিলেও রোদ ও বাতাসে ইহার সার পদার্থ অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য বহুলোকে যে-স্থানে মূত্র ত্যাগ করে, সে-স্থানের মাটি কিছুদিন পর পর কতক তুলিয়া লইয়া জমিতে দেওয়াই নিয়ম করিয়া লইতে হয়।

বহুদিন হইল একবার কোন কৃষি-বিশেষজ্ঞের লিখিত প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, জাপানের চাষীরা নাকি মূত্রত্যাগের স্থানের মাটি ধান ও অন্যান্য শস্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া থাকে। সেজন্য সে দেশের প্রত্যেক বড় বড় সহরের রাস্তার ধারে যে-সব মূত্রত্যাগের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সে-সব স্থানের নির্দ্দিষ্ট কয় ফুট স্থানের মাটি প্রতি বৎসরই একবার করিয়া নীলামে বিক্রয় করা হইয়া থাকে, ইত্যাদি। ইহার অনুকূলে আরও অনেক

কথাই পাঠ করিয়াছিলাম। সেজন্য ঐ প্রবন্ধ পাঠের পর হইতে এখন পর্য্যন্ত পরীক্ষাস্বরূপ আমরা নানা ক্ষেত্রে ইহার অল্পবিস্তর ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। তদ্দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে ফল যাহা পাইয়াছিলাম ইহার বিশেষ বিবরণ তত্তৎ ফল-শস্যাদির চাষের বিষয় লিখিবার কালে স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বিষ্ঠা-সারের গুণপ্রসঙ্গে পায়খানার স্থানে সব্‌জী চাষ করিতে গিয়া অপূর্ব্ব ফল পাইয়াছিলাম বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে, সে-সব স্থানে দীর্ঘকালের পরিত্যক্ত প্রস্রাবের উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা কৃষির উন্নতির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেচ্ছু পাঠকের পক্ষে প্রস্রাবের গুণ বুঝিবার বিশেষ সহায়তা হইবে মনে করি।

কচুরিপানাঃ—ইহার আর এক নাম জার্ম্মান পানা। ইহা অত্যন্ত তেজস্কর সার এবং সব রকম ফল-শস্যাদি গাছের পক্ষেই অত্যাশ্চর্য্য রকমে ফলপ্রদ। এই কারণবশতঃই বোধ হয় কোন কোন কৃষিবিশেষজ্ঞ ইহাকে "কৃষিপ্রাণ কচুরি" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন এবং কেহ বা ইহাকে ভগবানের অপূর্ব্ব দান বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও মতে বাঙ্গালার কৃষকদিগকে বাঁচাইবার জন্যই ভগবান্ ইহা সৃষ্টি ও অত্যন্ত সুলভ করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাও বলি ইহা ভগবানের অযাচিত করুণা।

কচুরি যে খুব তেজস্কর সার একথা বর্ত্তমানে কৃষকদিগের মধ্যেও অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছে। তাহা বলিয়া সবরকম কচুরিতেই যে সারপদার্থ ঠিক একই পরিমাণে থাকে, তাহা মনে করা অত্যন্ত ভুল। লক্ষ্য করিয়া থাকিলে অনেকেই হয়ত দেখিয়া থাকিবেন যে, কদর্য্য জলে যে-সব কচুরি জন্মায় তাহাই খুব বর্দ্ধিষ্ণু আকারের হইয়া থাকে এবং তাহাতেই যে সারের ভাগ বেশী থাকিবে, আশা

করি তাহাও বুঝিতে পারিয়াছেন। বস্তুতঃ, সারের কাজে ঐরূপ কচুরিই দরকার।

কচুরি বিশ্লেষণকারী বৈজ্ঞানিকগণের মতে ঐরূপ এক শত পচা কচুরিতে থাকে—৪৮ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৮০ পাউণ্ড পটাস, ও ১৬ পাউণ্ড ফস্‌ফরিক এসিড। ইহার অর্থ গোময়ের প্রায় চারি গুণ অধিক নাইট্রোজেন, চৌদ্দ গুণ অধিক পটাস এবং দ্বিগুণ অধিক ফস্‌ফরিক এসিড। ইহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করার অনেকটাই ব্যবহার-প্রণালীর উৎকর্ষের উপরই অবধারিত হইয়া থাকে। সেজন্য সে-সব কথাই অগ্রে বুঝা বিশেষ দরকার।

কাঁচা কচুরি একস্থানে ৪।৫ ফুট উচ্চ করিয়া গাদা দিয়া তদুপরি সামান্য কিছু গোময় ছড়াইয়া সমস্ত গাদাটি মাটি দিয়া পাতলা করিয়া ঢাকিয়া দিলে ইহা একসঙ্গে সমভাবে পচিতে পারে। সেরূপ ভাবে পচা কচুরিই সারের কাজে অত্যন্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যথেচ্ছ রক্ষিত কচুরি-গাদার নীচের অংশই পচিতে পারে এবং উপরিস্তরের কচুরিগুলি শুকাইয়া যায়; কাজেই নীচের কচুরিগুলিও কতক রৌদ্রতপ্ত ও কতক বৃষ্টির জলে ধৌত হওয়ায় সারের কাজে তেমন ফলপ্রদ হইতে পারে না। ইহা কতকটা গোময় সার রক্ষার মতই মনে করিতে হইবে।

কচুরির ছাই :—উপরের বর্ণনানুসারে কচুরি পচাইয়া সার তৈরি করাকে এতদঞ্চলের কৃষকগণ অত্যন্ত শ্রমজনক মনে করে, ও শ্রম এড়াইবার বুদ্ধিতে শুক্‌না কচুরি স্থানে স্থানে অথবা এক স্থানে পোড়াইয়া ছাই ব্যবহার করিতেই অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের জানা উচিত যে, কচুরি পোড়াইলে ইহার নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরিক এসিডের ভাগ রূপান্তরিত হইয়া যায় এবং থাকে কেবল পটাস ভাগ। কাজেই পচা কচুরির ন্যায় সম্পূর্ণ ফলদায়ক হইতে পারে না।

পুরাতন পুষ্করিনী ও খাল নালার নীচের পঙ্ক (পাঁক

মাটি) :—ইহা অত্যন্ত বলকারক ও নির্দ্দোষ সার। সেজন্য ইহা সব রকম ফল ও শস্যাদির পক্ষেই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে ধান ও পাটের জমিতেই ইহার যা-কিছু ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার গুণেই স্থানে স্থানে যা-কিছু ফল হইয়া থাকে। তাহা কেন হয় তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, সব জমির উপরিস্তরের মাটিতেই সাধারণতঃ পচা ঘাস, লতা পাতা, বিষ্ঠা, মূত্র, জীব-জন্তুর বিগলিত শরীর ইত্যাদি সারবান পদার্থসমূহ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং সে-সবের মধ্যে নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্‌ফরিক এসিড ইত্যাদি উদ্ভিদপ্রাণ বস্তুসমূহ অধিকভাবে বিরাজ করিয়া থাকে। বিস্তৃত মাঠ বা সরজমির উপরিস্তরের সে-সব সারবান অংশ বিমিশ্রভাবে বৃষ্টির জলের স্রোতবেগে খাল নালা ও পচা পুকুরসমূহের তলায় গিয়া পড়ে বলিয়াই পঙ্ক উৎকৃষ্ট সারের কাজ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার ব্যবহার-প্রণালীর উৎকর্ষাপকর্ষের বিষয় আলোচনা করা দরকার।

পঙ্ক খুব ফলপ্রদ ও তেজস্কর সার ইহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাহা জমিতে ছড়াইবার পর খুব শুকাইয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কোন বীজ বপন বা চারা রোপণ করিলে, তাহা কাজে লাগিতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐ জমির চারাগাছগুলি লাল রং ও দুর্ব্বল প্রকৃতির হইয়া থাকে, এবং ইহার ফল যে ভাল হইবে না তাহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। পঙ্ক-সার দিয়া আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে তাহা ফসল বপনের অন্ততঃ দেড় মাস পূর্ব্বে জমিতে ছড়াইয়া খুব শুকাইয়া গেলে ও ইহার পর বৃষ্টি হইয়া গেলে চাষ-মৈ দিয়া ফসলের খাদ্যোপযোগী হইলে পর বীজ বপন করিতে হইবে। ইহার কারণ পশ্চাৎ সারের ব্যবহার ও কর্ষণের উদ্দেশ্য বিষয়ে পাঠ করিবার সময় সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

আবর্জ্জনা পচা :—ইহাতেও পঙ্কের ন্যায় অনেক ভাল উপাদানের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সবরকম শাক-

সব্জী ও মরসুমী ফুল ইত্যাদি কোমল-শরীর উদ্ভিদের পক্ষেই খুব উপযোগী এবং তাহা কৃষক মাত্রেরই ধারণায় আছে মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে তাহা প্রায় কেহই প্রণালীবদ্ধভাবে বা যতদূর যত্নের সহিত ব্যবহার করা উচিত তাহা করে না, কাজেই তদ্দ্বারা উল্লেখযোগ্য কোন ফল পাইতে পারে না।

আবর্জ্জনা-সারের ফল আবর্জ্জনারাশি প্রণালীবদ্ধভাবে পচাইবার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। সবরকম আবর্জ্জনা একস্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া দিলে দেখা যায়, ইহার নিম্নস্তরেরও শীঘ্র পচনশীল অংশ যখন পচিয়া গিয়া ঠিক ঠিক কাজের যোগ্য হয়, তখন উপরের স্তরের এবং যে-সব দ্রব্য দেরিতে পচে, ইহাদের কিছুই হয় নাই। এই অবস্থায় সব অংশ পচিবার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইলে, নীচের স্তরেরও পচা অংশ প্রায় কাজের অযোগ্য অথবা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। এই সকল অবস্থা দৃষ্টে আবর্জ্জনা শক্ত ও নরম ভেদে অর্থাৎ শীঘ্র ও দেরিতে পচনশীল দ্রব্য পৃথক পৃথক স্তূপে পচাইয়া ব্যবহার করিবার ফল যে ভাল হইবে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা ঘরবাড়ী ঝাড়ু দেওয়া আবর্জ্জনা, মাছ-মাংসের পরিত্যক্ত অংশ, ভাতের মাড় ও ভাত-ব্যঞ্জনাদির পরিত্যক্ত অংশ নির্দ্দিষ্ট একস্থানে ফেলিতে গিয়া যখন তাহা দ্বারা দুই এক কাঠা জমির সারের কাজ পোষাইবে দেখিয়াছি, তখন তাহা উঠাইয়া সব্জীর জমিতে ব্যবহার করিয়া খৈল গোময় ইত্যাদি অন্য কোন সারের সাহায্য ব্যতিরেকে সর্ব্বদাই আশাতিরিক্ত রকমের ফল পাইতেছি। বস্তুতঃ কৃষিকার্য্যের পক্ষে আবর্জ্জনারাশি মূল্যবান্ সার। কোনও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির লেখা পাঠ করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, চীন দেশের কৃষকদিগের নাকি আবর্জ্জনা-পচাই প্রধান সার এবং এই সারের গুণেই তাহারা কোন কোন ফসল পৃথিবীর সব দেশের লোকের চেয়ে বেশী পায়। সে-জন্য সে দেশের অধিবাসী আবর্জ্জনারাশি অতি যত্নের সহিত রক্ষা

করিয়া থাকে এবং সে দেশে প্রত্যেক শহরের আবর্জ্জনাও নাকি যত্নের সহিত রাখিয়া চাষীদের নিকটে বিক্রয় করা একটা প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পুরাতন দেওয়াল ও উনানের মাটি ঃ—ইহা খুব বলকারক অথচ অনুগ্র সার। সে-সব মাটি গোময়-মিশ্রিত থাকায় ও তাহা বহুদিন উত্তাপ আলোক ও বাতাসের সংস্পর্শে থাকিয়া সবরকম কোমল-শরীর উদ্ভিদ ও কাষ্ঠপ্রদ বৃক্ষাদি উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত উপযোগী হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহার প্রণালী গাছপালার জাতি বয়স ও বলাবল বুঝিয়াই করিতে হয়। সে-সব কথা পশ্চাৎ বিভিন্ন জাতীয় গাছপালার তদ্‌বিরপ্রণালী বর্ণন-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ছাই ঃ—ইহা ভাল সার। ইহার প্রধান উপাদান পটাস বা ক্ষারজান। দাহ্যবস্তুর প্রকারভেদে ইহাদের ক্ষার ভাগের মধ্যে অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কাজেই ছাই ব্যবহার করিয়া ভাল ফল পাইতে হইলে তাহাতে ক্ষার ভাগ কি পরিমাণ আছে, তাহা অগ্রে ধরিয়া লইয়া ব্যবহার করাই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবার প্রধান উপায়। কোন্ জিনিসের ছাইয়ে পটাসের ভাগ কি পরিমাণ আছে, তাহা ধরিতে পারা অধিক কঠিন কাজ নয়।

কতক ছাই ওজন করতঃ জলে ভালরূপ গুলিয়া সেই জল ফিল্‌টার করিয়া লইতে হইবে। তারপর সেই ফিলটার করা জল একটা পাত্রে করিয়া অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিতে থাকিলে উহা ক্রমে শুষিয়া গিয়া অবশেষে করকচ লবণের মত সাদা একটা জিনিস থাকিয়া যায়, তাহাই পটাস। এই ভাবে একই পরিমাণে নানা বস্তুর ছাই পরীক্ষা করিলে ইহার পটাস ভাগের ইতরবিশেষ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এতদ্দ্বারা এইরূপ চিন্তা করা যাইতে পারে যে, আমাদের প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের মধ্যে যে-সবের ছাইয়ে পটাসের ভাগ অধিক পাওয়া যায়, তাহাতে সারের কাজে ছাই

ব্যবহার করিলে অধিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। কঠিন বা শক্ত মাটিকে ঢিলা রাখিবার পক্ষে ছাই বিশেষ উপযোগী সার। তদ্দারা ছাইয়ের উপাদানের গুণে যতটা উপকার হয়, তদপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায় মাটিকে সর্ব্বদা নরম ও ঢিলা রাখিতে পারে বলিয়া। সেজন্যই তাহা কন্দমূল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে ভাল সারের কাজ করিয়া থাকে।

নাইট্রেট অব সোডা :—ইহা দক্ষিণ-আমেরিকার চিলি প্রদেশের পর্ব্বতজাত এক প্রকার খনিজপদার্থ। সেজন্য ইহাকে চিলিয়ান নাইট্রেট্ অব সোডা বলা হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে অনেকটা লবণের মত এবং লবণের মতই জল ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিলে গলিয়া জল হইয়া যায়। ইহার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন। ইহা দ্রুত ক্রিয়াশীল সার। আবার ইহার ক্রিয়া তেমনই দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। আমরা ক্রমাগত ২০।২৫ বৎসর বিভিন্নক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করিয়া এই ধারণায় উপনীত হইয়াছি যে, তামাক কপি নালিয়া ইত্যাদি যে-সবের পাতা ও ছালই আমাদের প্রয়োজন তজ্জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষেই ইহা সমধিক উপযোগী। সেজন্য অধুনা এতদ্দেশেও ইহার ব্যবহার দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। বিদেশ হইতে নূতন একটা কিছু আমদানী হইলে আমাদের দেশের লোকে সাধারণতঃ তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে, সে-সব অভ্যাসও এদেশে ইহার ব্যবহার-বাহুল্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

লবণ :—ইহাকে ঠিক ঠিক সার বলা সঙ্গত নহে। ইহা মাটির নানা দোষের প্রতিহারক বলিয়া একটি উৎকৃষ্ট কৃষি-রাসায়নিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। আমরা বহুক্ষেত্রে লবণের কীটনাশক গুণের বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি এবং তাহা তত্তৎ বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। লবণের অন্যতম প্রধান গুণ এই যে, যে-সব গাছপালা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হইয়া যাওয়ার দরুন পুষ্পিত

বা মুকুলিত হয় না কিম্বা মুকুলিত হইলেও ফল টিকে না, সে-সবের গোড়ায় লবণ ব্যবহার করিলে ইহাদের বলের সমতা আনয়ন করে এবং তাহা হইতে অবিলম্বেই ফলবান হইয়া থাকে।

খারি লবণ :—নাইট্রেট অব সোডার ন্যায় ইহাকেও একটা খনিজপদার্থ বলা যাইতে পারে। কারণ ইহা মাটি হইতেই উৎপন্ন হয়। ইহা সাররূপে ব্যবহৃত হইতে কোথাও দেখা যায় না এবং কোন কৃষি-গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। ইহা প্রধানতঃ কাঁচা চামড়ার সংস্কারকার্য্যেই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। সেজন্য ইহা বাজার বন্দরের একটা বড়রকমের পণ্যদ্রব্য। সোরার ন্যায় ইহাও মাটি হইতে উত্তোলিত হইয়া স্থানে স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। বিহার অঞ্চলের মাটিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। মাটি হইতে খারি লবণ বাহির করিয়া বিক্রয় করা সে-সব অঞ্চলের এক শ্রেণীর শ্রমজীবীর পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা। যাহারা এই কাজ করে তাহারা নুনিয়া (জাতি) বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

বিহার অঞ্চলের ফল-শস্যাদির প্রসিদ্ধির কথা অনেকেরই ধারণায় আছে মনে করি। বিগত ১৩২৩ সালে সে অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া যখন স্থানে স্থানে দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত শ্রম-জীবীরা মাটি হইতে খারি লবণ বাহির করিতেছে তখন আমাকে ইহাই স্থির করিয়া লইতে হইয়াছিল যে, ঐ ঐ অঞ্চলের মাটিতে একাধারে সোরা ও খারি লবণ প্রচুর পরিমাণে থাকাতেই এ-সব স্থানকে ফল-শস্যাদিতে শ্রীসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তখন হইতেই আমি পরীক্ষা-স্বরূপ নানা জাতীয় গাছপালার গোড়ায় খারি লবণ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইতে আমাকে ইহাই বুঝিতে হইতেছে যে, ইহা কোন কোন গাছ-পালার পক্ষে খুব বলকারক অথচ অনুত্তেজক সার। ইহার বিশেষ বিবরণ মৎপ্রণীত "আয়কর ফলের চাষ" নামক পুস্তকের স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

সবুজ সারঃ—সবুজ সার বলিতে সাধারণতঃ ঘাস লতা-পাতা ও বৃক্ষাদির পাতা পচিয়া যে সার হয় ইহাকেই বুঝায় এবং সেজন্য, কেহ কেহ ইহাকে পাতা-সার নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহা বলকারক অথচ অনুত্তেজক সার। কিন্তু লতা-পাতার জাতি অনুসারে ইহারও গুণের যথেষ্ট ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। গাছের পাতা পচাইয়া যে সার প্রস্তুত করা হয় তাহা সাধারণতঃ ফুল গাছের, বিশেষ ভাবে মরস্থমী ফুল গাঁদা ইত্যাদি গাছের গোড়ায়ই অধিক ব্যবহৃত হয় এবং তদ্দ্বারা ফুলের আকার বেশ বড় হইয়া থাকে। কিন্তু ধনচে, মান্দার, কলাই প্রভৃতি এমন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট জাতি আছে যাহাদের পাতা জমিতে পড়িয়া সে স্থানেই পচিতে দিলে আস্ত জমিখানারই মাটির বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় যাহা উপরের লিখিতভাবে যে-কোন গাছের পাতা পৃথক স্থানে পচাইয়া দিয়া করিতে পারা যায় না।

ধনচে গাছ অনেকেরই পরিচিত। ইহা নালিয়ার মত খুব বৃদ্ধি-শীল গাছ এবং নালিয়ার ঋতুতে একই নিয়মে বীজ বপন কবিতে হয়। ইহা আমাদের দেশের চাষীরা সাধারণতঃ জ্বালানী কাঠের জন্য অল্পবিস্তর করিয়া থাকে এবং গাছ খুব বড় হইয়া পড়িলেই কাটিয়া ফেলে। স্থতরাং তদ্দ্বারা মাটির বলক্ষয় ব্যতীত বলবৃদ্ধির কোন সহায়তাই হইতে পারে না। ইহা দ্বারা ফল পাইতে হইলে ইহার পাতা ডগা ইত্যাদি সেই স্থানেই পড়িয়া পচিতে দিতে হইবে। এই ভাবে কলাইয়ের গাছও—যে স্থানে বীজ বপন করা যায়, তথায়ই ধ্বংস হইতে দিলে জমির বলবৃদ্ধির অত্যন্ত সহায়তা করিয়া থাকে। সেই সকলের পরিচয় পাওয়ার পর হইতে বর্ত্তমানে ফলের চাষ প্রধান স্থানসমূহে যথাঋতুতে বাগান জুড়িয়া ধনচে ও কলাইয়েয় বীজ ছিটাইয়া দেওয়া একটা প্রথার মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ কোন স্থানের ফলবাগানীরা বাগানের মাঝে মাঝে মান্দারের গাছও রোপণ করিয়া থাকে।

***বিমিশ্র সার*ঃ**—ইহার অর্থ এক জমিতে একসঙ্গে বিভিন্ন উপাদান গঠিত সার ব্যবহার করা। ইহার উদ্দেশ্য এই—সবরকম সারের উপাদান যেমন একপ্রকার নহে, তেমনি সবরকম উদ্ভিদের পক্ষেও একই উপাদানগঠিত সার সমান ফলপ্রদ নহে। কাজেই কোন এক জাতীয় সার পরিমাণে প্রচুর হইলেও আমাদের লক্ষীভূত উদ্ভিদের পক্ষে ঠিক ঠিক উপযোগী হইবে কি-না তদ্বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় থাকিয়া যায়। একাধিক সার একসঙ্গে ব্যবহার করাই সংশয় দূর করিবার প্রধান উপায়। যাহা হউক, আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ এই ভাবে নালিয়া তামাক ও সবরকম সব্জীর জমিতে কেবল অত্যধিক পরিমাণে গোময় না দিয়া একসঙ্গে অল্প অল্প পরিমাণে গোময়, খৈল ও হাড়ের গুঁড়া বিমিশ্রভাবে ব্যবহার করিতে গিয়া এই শিক্ষাই পাইয়াছি যে, একসঙ্গে উক্ত ত্রিবিধ সারের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে বলিয়া মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য যতটুকু থাকে, তাহাও শীঘ্র কার্য্যোন্মুখ হয় এবং নিঃশেষে কাজে লাগিতে পারে। সেজন্য ফসল খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে ও কাজ অল্পায়াসসাধ্যও হইয়া থাকে।

সার ব্যবহার করিবার বেলায় মনে রাখিতে হইবে যে, উদ্ভিদের সমস্তটার ফল আমরা প্রায়ই এক ভাবে পাইতে চাই না। কোনটার ফল, কোনটার ফুল, কোনটার মূল, কোনটাব পাতা ও কোনটার ছাল পাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। সেইরূপ সারের মধ্যেও এক-একটার এক-এক অঙ্গবর্দ্ধক গুণ রহিয়াছে। সুতরাং যেখানে একাধারে সবরকম বা একাধিক ফল পাওয়া দরকার সেখানে নানা উপাদান-গঠিত সার মাটির উপাদান-বিশেষের অভাব বা আধিক্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিমিশ্রভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করিলে যে ফল ভাল হইবে, তাহা বুঝিতে পারা অধিক কঠিন নয়। কথাটা আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কন্দ জাতীয় উদ্ভিদের (যেমন মান-কচু, ওল ইত্যাদির) জমিতে ছাই ব্যবহার করিলে ছাইয়ের উপাদানের গুণে যতটা উপকার হয়, তদপেক্ষা অধিক ফল হয় মাটির কোমলতা সম্পাদন করে বলিয়া। তাহা বলিয়া তথায় অন্য সার দিবার প্রয়োজন নাই মনে করা ভুল। মাটি অনুর্ব্বর হইলে তথায় ছাইয়ের সঙ্গে গোময়, খৈল ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে দিতে হইবে। অধিক এঁটেল মাটির ভাগযুক্ত কঠিন মাটির জমিতে যে-কোন ফসলই বপন করা হউক, তথায় অন্যান্য সারের সহিত ছাই ব্যবহার করিলে ফল অধিক ভাল হইয়াই থাকে।

তরল সার ঃ—ইহা প্রধান ভাবে কচি চারার উন্নতির জন্যই প্রয়োজন হইয়া থাকে। কচি চারার গোড়ায় সার দেওয়া দরকার হইলে, টাট্‌কা কোন সার দিলে ইহার ক্রিয়া হইতে অধিক সময় লাগে কিম্বা তাহা সহ্য করিতে পারে না বলিয়া মরিয়া যায়, অথচ সার না দিলে তাহাদের উন্নতি হইতে পারে না। এ সকল অবস্থা এড়াইয়া চলিতে হইলে উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে একটা পাত্রে সম পরিমাণে গোময়, খৈল ও হাড়ের গুঁড়া জলে গুলিয়া সর্ব্বদা সঞ্চিত রাখা বিশেষ দরকার। তাহা করিলে সে-সব পচিয়া গিয়া যে-কোন রকম চারার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইয়া থাকে এবং তাহা আবশ্যকমত অধিক জলের সহিত গুলিয়া তরল করতঃ দুই-চারি দিন পর পর পরিমাণমত চারার গোড়ায় দিলে তদ্দারা একসঙ্গে জল সেচন ও সার দেওয়ার কাজ চলে এবং চারারও দ্রুত উন্নতি হইয়া থাকে। চারার বয়স ও বলের অবস্থা বুঝিয়া তাহা অধিক তরল বা ঈষৎ ঘনও করা যাইতে পারে। বিভিন্ন রকমের গাছ-পালার গোড়ায় তরল সার দিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী তত্তৎ গাছ-পালার বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হাড়ের গুঁড়ার অভাব হইলে গোময়, খৈল দ্বারাও তরল সার

প্রস্তুত করা যাইতে পারে। খৈল ইত্যাদি কোন পাত্রে রাখিয়া পচাইতে গেলে ভয়ানক দুর্গন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যার দরুণ ঐ পাত্র গৃহমধ্যে রাখিতেই পারা যায় না এবং বাহিরে রাখিতে গেলে শিয়াল কুকুরের অত্যাচার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। এ সকল উপদ্রব এড়াইবার একমাত্র ভাল উপায় পাত্রটি শিকায় বসাইয়া কোন বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া ইহার মুখ ঢাকিয়া রাখা। যেখানে অধিক পরিমাণ তরল সারের প্রয়োজন, তথায়, বাগানের মধ্যে, পাকা চৌবাচ্চা করিয়া তন্মধ্যে সে কাজ অনায়াসেই সমাধা করা যাইতে পারে।

এ সকল উৎকৃষ্ট সারের কার্য্যকারিতা মাটির জান্তব অংশের পরিচয় দেওয়া কালে এক প্রকার বলা হইয়াছে। উদ্ভিদ্-খাদ্যের প্রধান দুইটি উপাদান নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস তরল সার দ্বারা সাধিত হয়। তরল সার কোমল-শরীর বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও কাষ্ঠপ্রদ বৃক্ষাদি উভয়ের চাষের পক্ষেই অত্যন্ত ফলপ্রদ সার, বিশেষ ভাবে ফুল গাছের গোড়ায় ইহা যত্নের সহিত ব্যবহার করিলে ফুলের আকার, সৌন্দর্য্য ও গন্ধের অভাবনীয় রূপ উন্নতি হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা কাঁচা অবস্থায় কিছুতেই ব্যবহার করা উচিত নহে।

সারের ব্যবহার ঃ—সার ব্যবহার কালে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে তাহা যতই উৎকৃষ্ট হউক না, ঠিক সময়ে ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে ব্যবহার করিতে না পারিলে, উপকারের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। কোমল-শরীর বিশিষ্ট উদ্ভিদ ও শস্যাদির জমির পক্ষেই এ সকল কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবার বিষয়।

অধ্যায়ারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, পচনধর্ম্মশীল বস্তুমাত্রই কোন-না-কোন আকারে সারের কাজ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সারের কাজে যত জিনিস জমিতে দেওয়া যায়, সবই পচিয়া গিয়া মাটির সহিত মিলিত হইয়া এক ভাবাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্ভিদের পোষণকার্য্যে লাগিতে পারে না। তা'ছাড়া

পচনশীল বস্তুমাত্রই পচিবার কালে কতক গরম না হইয়াই পারে না বলিয়া সারের সেই গরম ক্রিয়া দূর হইবার পূর্ব্বেই তথায় কোন বীজ বপন বা কচি চারা রোপণ করিলে তাহাদের কোন-না-কোন অনিষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কথাটা একটু জটিল। ইহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে পাঠক অনতিবিলম্বে পরীক্ষা-স্বরূপ হাল চাষ করা জমির দুই বর্গ ফুট স্থানে আধপোয়া খৈলের গুঁড়া অথবা দেড় সের আন্দাজ পচা গোময় ছড়াইয়া মাটির সহিত ভালরূপ মিশাইয়া লইয়া তথায় যে-কোন শস্যের কতকগুলি বীজ বপন করুন; তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহার অধিকাংশ বীজই সারের গরমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অল্পসংখ্যক যাহা অঙ্কুরিত হইবে তাহাও রুগ্ন চেহারা লইয়াই মাটির উপর উঠিবে এবং তদ্দারা যে কোন ফল হইবে না তাহাও অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা বার বার পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে অপক্ক সারযুক্ত জমিতে কোন কচি চারা বসাইলে তাহা বাঁচানো এক প্রকার অসম্ভব হইয়াই দাঁড়ায়। ঐরূপ জমির শাকসব্জী, আলু, পেঁয়াজ, তামাক, কপি ইত্যাদিতেই কীটের উপদ্রব অধিক হইয়া থাকে, যাহা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার ভাব আনিয়া দেয়। এরূপ না হইতে পারে, ইহারই জন্য সময় হাতে রাখিয়া জমিতে সার ছড়াইতে হইবে; সারের উষ্ণতা দূর হইয়া গেলে বীজ বপন বা চারা রোপণ করিতে পারা যায়। সকল জাতীয় সারের পচনকার্য্য ঠিক একই সময়ে শেষ হয় না অর্থাৎ ইহাদের জাতিগত পার্থক্য অনুসারে কতক অগ্র-পশ্চাৎ হইয়াই থাকে। তা ছাড়া ঋতুর অবস্থাগত পার্থক্যও সময় সময় অগ্র-পশ্চাৎ হইবার একটি কারণ। জমিতে সার ছড়াইবার পর পর্য্যায়ক্রমে দুই-একবার রৌদ্র-বৃষ্টি হইয়া গেলে তাহা যত শীঘ্র পচিয়া কাজের উপযোগী হইতে পারে, প্রখর রোদের দিনে তত শীঘ্র হইতে পারে

না। কারণ কোন দ্রব্য পচিতে বা পচাইতে হইলেই কতক রসের দরকার হইয়া থাকে। এ সকল কথা স্মরণ রাখিয়া জমিতে সার ছড়ানোই ভাল ফল পাইবার প্রধান উপায়।

প্রখর রৌদ্রের দিনে বা অত্যধিক বৃষ্টিপাতের সময় কোন অবস্থায়ই জমিতে সার ছড়ানো উচিত নহে। কারণ খুব রৌদ্রের দিনে শোষক ও গরম মাটির উপর সার ছড়াইলে রৌদ্রতাপে সারের নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাসের ভাগ ক্রমেই নষ্ট হয় বা উড়িয়া যাইতে থাকে। তারপর গরম জমির উপর বৃষ্টির জল পড়িলে তাহা হইতে যে গরম বাষ্প উত্থিত হয়, তাহার তেজে বা সেই সঙ্গে সারের অবশিষ্ট ভাল উপাদান যাহা থাকে তাহাও লয় প্রাপ্ত হয়। অধিক বারিপাতের সময় সার ছড়াইলেও জলের স্রোতবেগে সারের মূল্যবান অংশ অনেকটাই জমির বাহিরে চলিয়া যায়। সারের উল্লিখিত ও অন্যান্য প্রকার অপচয় নিবারণের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে, তদ্দ্বারা যে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সারের সম্যক্‌ ফল পাইতে হইলে, প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে যো হইয়াছে দেখিলেই মৈ দিয়া জমি সমান করতঃ যত শীঘ্র সম্ভব সার ছড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে চাষ মৈ দিয়া পুনরায় জমি সমান করিয়া কিছু দিন রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক। জমিতে কতকটা রস থাকিতে এই ভাবে সার ছড়াইয়া চাষ মৈ দিয়া রাখিতে পারিলে, সেই রসের সাহায্যে সারের পচনকার্য্য শীঘ্র সাধিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সার ও মাটি উভয়কেই এক ভাবাপন্ন করিয়া তুলে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ইহার অনেকটাই ঋতুর ভাবগতিক বুঝিয়া চলিবার উপর নির্ভর করে। সেজন্য সার ব্যবহার কার্য্যে কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারা যায় না।

তারপর সার নির্ব্বাচন কালে বিভিন্ন জাতীয় সারের উপাদান-গত পার্থক্যের কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কারণ ইহার উপর

উৎপন্ন দ্রব্যাদির স্বাদ গুণ ও ফলনের যথেষ্ট ইতরবিশেষ হইতে পারে ও হইয়াই থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত—ইক্ষুর জমিতে যথেষ্ট পরিমাণে কেবল গোময় সার দিলেই গাছগুলি বেশ পুষ্ট কলেবর ও তাহাতে রসের পরিমাণ যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা ঠিক ঠিক মিষ্ট স্বাদ হয় না ও ইহার রসের ঘনত্ব বা ইহাতে শর্করার ভাগ খৈল সারের ইক্ষু অপেক্ষা অনেক কম থাকে বলিয়া গুড় ও চিনি কম হয়। এই কারণ বশতঃ প্রায় সর্ব্বত্রই গোময় সুলভ থাকা সত্ত্বেও টাকা পয়সা খরচ করিয়া গোময়ের সহিত খৈল ব্যবহার করিতে আমরা বাধ্য হই এবং ইহার ফল সর্ব্বত্রই ভাল হইয়া থাকে। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, অধিক গোময় সার দেওয়া জমির ডাঁটা প্রায় খাইতেই পারা যায় না। ধানের জমিতে অধিক নাইট্রোজেনের ভাগযুক্ত সার দিলে তদ্দ্বারা ধানের গাছ-পাতা যেরূপ সতেজ হয়, সেই অনুপাতে ধান কম হয় এবং যাহা হয়, তাহাতেও চোঁচার ভাগ বেশী হইয়া থাকে। লক্ষ্য করিতে পারিলে এই সকল প্রভেদ শত শত জিনিসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যাহা এক মাত্র সার নির্ব্বাচনের দোষগুণের উপরই অবধারিত হইয়া আসিতেছে।

সারের অপব্যবহার ঃ—প্রয়োজনের অধিক সার ব্যবহার করাই ইহার অপব্যবহার। অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গাছপালাকে খুব বর্দ্ধিষ্ণু করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা ইহাদের গোড়ায় বা জমিতে অতিমাত্রায় সার দিয়া থাকেন। ইহাতে যে কেবল সারের অপচয় হয় এমন নহে। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা গাছপালায় নানা রোগের সৃষ্টি ও ইহার ফলস্বরূপ কোনটা অফলা ও কোন কোনটা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও থাকে। আমরা যে পরিমাণ খাইতে পারি, ইহার অধিক খাইলে কিম্বা ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতে বার-বার খাইতে গেলে তাহা যেমন সময় সময় নানা প্রাণনাশক রোগের সৃষ্টি হইবার প্রধান কারণ হয়, ইহাও অনেকটা সেইরূপই বুঝিতে হইবে।

অধিক ফল পাইবার আশায় আমরা যে-যে স্থলে অতিমাত্রায় সার ব্যবহার করিয়াছি, সেই সব জায়গাতেই দেখিয়াছি যে, ইহাদের কোনটার পাতা সঙ্গে সঙ্গেই কোঁকড়াইয়া গিয়াছে এবং কোনটার মাথার দিক হইতে মরিতে থাকিয়া নীচে নামিতেছে, যাহা দেখিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের দ্বারা কোন কালেই ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। ঐ অবস্থার গাছপালা উপড়াইয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, ইহাদের কোনটার শিকড় যথোপযুক্ত পরিমাণের বহু গুণ বৃদ্ধি পাঁইয়াছিল এবং কোনটার বা তাহা হইয়া পচিয়া গিয়াছিল। এইরূপ নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা যাহাতে না হইতে পারে, ইহার জন্য প্রত্যেক সার ব্যবহারকালে সতর্কতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। সারের পরিমাণ জমির স্বাভাবিক বলাবল ও উদ্দিষ্ট গাছপালার স্বভাব, বয়স ও বলাবল বুঝিয়া স্থির করাই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবার প্রধান উপায়। কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে সার অমূল্য জিনিস, কিন্তু যথাসময়ে ও পরিমাণমত ব্যবহার করিতে না পারিলে তাহাই বিষম ক্ষতিরও কারণ হইয়া থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি-কর্ষণ

কর্ষণের উদ্দেশ্য ঃ—কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের হার বাড়াইবার যত উপায় আছে তাহার মধ্যে সুকর্ষণই সকলের শ্রেষ্ঠতম ও অপরিহার্য্য উপায়। অকর্ষিত বা অল্প কর্ষিত জমিতে কেবল ভাল সার ও ভাল বীজ বপন করিয়া আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে যখন জমি উত্তমরূপ কর্ষণের ফলে বিনা সারেও ভাল ফলন হইতে স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় তখন সুকর্ষণের আবশ্যকতা যে কতব্যাপক তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এসব দৃষ্টান্ত হইতেই বোধ হয় কৃষিবিশেষজ্ঞ মহলে "কর্ষণের গুণে ভূমির আয়তন বৃদ্ধি" এইরূপ একটা কথা প্রবাদ বাক্যের মত চলিয়া আসিতেছে। ইহার অর্থ—অল্প কর্ষিত বা কর্ষণের অভাব রাখিয়া যে পরিমিত স্থানে যত ফসল পাওয়া যায়, কর্ষণ ভাল হইলে তদপেক্ষা অল্প পরিমিত স্থানে অধিক ফসল পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, সকলেই দেখিতেছেন যে, সাধারণভাবে কর্ষিত জমিতে ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদনের হার সচরাচর যাহা হয়, জমি উত্তমরূপ কর্ষিত হইলে অনেক সময় ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে অল্প কর্ষিত জমির ফসলের পরিমাণ কি হইবে তাহা কতক অনিশ্চিতই থাকিয়া যায়। কারণ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রবে সেরূপ জমির ফসলই শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু উত্তমরূপ কর্ষিত জমির ফসলে সে-সব আশঙ্কা প্রায় থাকে না বলিলেও চলে। তা'ছাড়া ভাল চাষ করা জমিতে উৎপন্ন সবরকম দ্রব্যই দেখিতে মনোরম এবং ধান ইত্যাদি সবরকম শস্যেই অসার বা চোঁচার ভাগ

কম থাকে, সরিষার তেলের পড়তা অধিক হয়, পাটের আঁশ ভাল ও ওজনে ভারী হয়, শাকসবজীও খাইতে ভাল হয়। ইহার দরুণ ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য কতক অধিকই পাওয়া গিয়া থাকে। এ সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যাহারা আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ ভাল হালের গরুর অভাবের ওজুহাত দেখাইয়া কর্ষণের অভাব রাখিয়াই ফসল বপন করে এবং তাহাতে যদি ফলন কম হয়, তবে তাহারা যে স্বেচ্ছায় প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেরাই প্রতারিত হইয়া থাকে একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। কারণ কাহারও অভাব বলিয়া প্রকৃতি তাঁর নিয়মের এক তিলও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে চাষবাসের কাজ করিয়া সুফল পাইতে হইলে বাধ্য হইয়া চাষীকেই প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে। জমিতে কর্ষণের অভাব রাখিয়া বীজ বপন করার মন্দ ফল সর্ব্বত্রই দেখিয়াও যাঁহারা তাহা করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারা কর্ষণের উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ মাটির মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদান যাহা আছে, তাহা বারংবার কর্ষণের দ্বারা কি করিয়া তাঁহাদের খাদ্যোপযোগী ও পুষ্টির সহায় হইয়া থাকে, তাহা তাহারা বুঝিতে অক্ষম, কেবল ইহাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হইতে হইলে কর্ষণের উদ্দেশ্য কি তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে মনেপ্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে। যেহেতু কারণ না জানা পর্য্যন্ত কার্য্যে ঠিক ঠিক মনোযোগ আসিতে পারে না এবং যাহা করা যায় তাহাতেও কোন ত্রুটি হইতেছে কি না তাহাও বুঝিতে পারা এক প্রকার অসম্ভবই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তাপ, আলোক, জল ও বাতাসের ক্রিয়ায় পর্ব্বতস্থিত প্রস্তর রূপান্তরিত হইয়া কি করিয়া মাটির উৎপত্তি হয় ও ইহার বিভিন্ন উপাদানের পরিচয়-প্রসঙ্গে রূঢ় ও খনিজ পদার্থের স্বভাব কি তাহাও বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। কর্ষণের উদ্দেশ্য

ঠিক ভাবে বুঝিতে হইলে এ সব কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য-ভাগ যাহা আছে, তদ্দ্বারা তাহাদের ঠিক ঠিক পোষণ হইবার পথে উক্ত রূঢ় ও খনিজ ভাগই প্রধান ভাবে বাধা জন্মাইয়া থাকে। ইহা ঠিক ঠিক জানিতে হইলে উদ্ভিদ-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। কারণ মনে রাখিতে হইবে যে, স্বভাবজাত গাছ-পালা ও তৃণগুল্মের প্রকৃতি এবং যে সকল উদ্ভিদ বহু পুরুষ পরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মনুষ্যসেবিত হইয়া আসিতেছে ইহাদের প্রকৃতি অনেকটাই ভিন্ন রকমের। খুব সুখী ও ভোগী মানুষ, যাঁহারা বংশ পরম্পরায় দুধ, ঘি, মাখন, ছানা ইত্যাদি পুষ্টিকর অথচ উপাদেয় খাদ্য খাইয়া জীবনধারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে পার্ব্বত্য অসভ্য জাতীয়দের খাদ্য কাঁচা অথবা অর্দ্ধদগ্ধ মাংস ইত্যাদি খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে গেলে যেমন জীবনের আশাই থাকে না সেইরূপ বহু পুরুষ পরম্পরায় যত্ন-সেবা দ্বারা গঠিত সুখী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষেও কেবল স্বভাবোৎপন্ন গাছপালার খাদ্য খাইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। স্বভাবজাত গাছপালার পক্ষে যাহা পুষ্টিকর খাদ্য, ইহার অনেকটাই যত্নে সেবিত সুখী জাতীয় গাছপালার পক্ষে বিষতুল্য অনিষ্টকারী। মাটির সে-সব অনিষ্টকারী উপাদানসমূহ নিরাকৃত করিয়া আবশ্যক উপাদানসমূহকে তাহাদের ঠিক ঠিক উপযোগী করিয়া তুলাই কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। লোহা শোধিত ও জারিত করিয়া খাইলে মনুষ্য শরীরের রোগ-বিশেষকে দূর করিয়া পুষ্টির বিশেষ সহায়তা করে, কিন্তু তাহা শোধন না করিয়া খাইলে যেমন বিষের কার্য্য করিয়া থাকে, ইহাও তেমনই বুঝিতে হইবে। মাটির সর্ব্বপ্রকার দোষের শোধন করিবার পক্ষে বার বার কর্ষণ করাই ইহার একমাত্র উপায়। তাহা কেমন করিয়া হয় ও হইতে পারে সে কথাই এখন বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

একটা দুই সের ওজনের লোহা কিছু দিন যথেচ্ছভাবে ঘরের বাহিরে ফেলিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি ও কুয়াশা লাগিতে দিলে, তাহা যে-সময়ের মধ্যে একেবারে ক্ষয় ও রূপান্তরিত বা মাটি হইয়া যায়, ভালরূপ প্যাক্ করা একটা সূচের ঐ সময়ে কিছুই হয় না। এই দৃষ্টান্ত হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, বার বার কর্ষণ করিতে থাকিলে মাটি যে আপনা হইতেই কোমল হইয়া পড়ে, ইহার কারণ বার বার চাষ করিয়া মাটির ভিতর জল, বায়ু, উত্তাপ আলোকের ক্রিয়া হইবার পথ করিয়া দিলে তদ্দ্বারা মাটির মধ্যে লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ভাগ যাহা আছে, তাহাও লোহায় মরিচা ধরিয়া মাটি হইবার ন্যায় দ্রব করিয়া দেয়। কর্ষণ সময়ে পর্য্যায় ক্রমে দুই-এক বার রৌদ্র, বৃষ্টি হইলে মাটি যত শীঘ্র ও সহজে নরম হয়, চাষের পর বৃষ্টি না হইলে সেরূপ নরম কিছুতেই হয় না, এমন কি অনবরত চাষ মৈ দিয়াও তাহা করিতে পারা যায় না। এই দৃষ্টান্ত হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে, কর্ষণের দ্বারা মাটি বার বার ওলট-পালট করিয়া ইহার ভিতর উত্তাপ, আলোক, জল ও বাতাসের ক্রিয়া হইবার পথ করিয়া দিলে মাটির খনিজ ভাগ যাহা মাটির জমাট অবস্থায় সুখী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে বিষধর্ম্মী থাকে তাহাও রূপান্তরিত ও শোধিত হইয়া কিরূপে তাহাদের পক্ষে উপাদেয় ও পুষ্টির সহায়ক হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা মাটির যে-যে উপাদান হইতে উদ্ভিদের পোষণ হয়, তাহাদিগকে ঐ কাজের উপযোগী করিয়া লওয়াই যে কর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এক কথায় বলিতে হইলে কর্ষণ মাটিকে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী করিবার জন্য প্রকৃতির সহায়তা করা।

আমরা পাক করা মাছ মাংস ইত্যাদি খাইয়া শরীরের বল ও পুষ্টি সাধন করি। কিন্তু কাঁচা মাংস খাইলে জীবনের আশাই থাকে না। উদ্ভিদের পক্ষে ভূমিকর্ষণ আমাদের রন্ধন-কার্য্যের

সদৃশ। আমাদের খাদ্যবস্তু পাক হইলে অগ্নিতেজে ইহার দূষিত পদার্থ সকল নষ্ট হইয়া যায় এবং কোমল হইয়া যাওয়ায় ইহা যেমন লঘুপাক অথচ বলকারক হইয়া থাকে, সেইরূপ বার বার কর্ষণের দ্বারা মাটি ঢিলা করিয়া দিয়া ইহার ভিতর উত্তাপ, জল ও বায়ুর ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ হইতে দিলে মাটিও কোমল হয় এবং সর্ব্ব-প্রকার বিষদোষ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ভিদের পক্ষে অতিশয় বল-কারক ও উপাদেয়. হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বার বার কর্ষণের দ্বারা মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া অসংখ্য ফাঁক পড়িয়া যাওয়ায় তাহাতে ?কৈষিকাকর্ষণ শক্তির প্রবাহ অর্থাৎ যে শক্তিতে নীচের জলীয় ভাগ ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় (যেমন ব্লটিং কাগজের), তাহা জোরে চলিতে থাকে। তাহাতে উদ্ভিদের জীবনরক্ষার জন্য যে রসের দরকার, তাহা ঐ শক্তিতে যোগায়। অকর্ষিত ভূমিতে কোন কচি চারা রোপণ করিলে তাহা যে বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়, ঐ রসের অভাব ইহার এক কারণ এবং মাটির উপাদানসমূহ অশোধিত বা সেই চারার পরিপাকোপযোগী না থাকা অন্যতম প্রধান কারণ। সচরাচর দেখা যায় যে, যে মাটিতে যত অধিক সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে (যেমন বেলে মাটি), তার নীচের রস যতঃদূরে থাকে, কঠিন এঁটেল মাটিতে ফাঁক না থাকা বা কম থাকাবশতঃ নীচের রস তাহা হইতে অধিক দূরে থাকে। নীরেট এঁটেল মাটিকে এক বার ফাঁক করিয়া দিলেও বৃষ্টির জল পাইয়া পুনরায় রোদ লাগিলে তাহা সহজে চাপ বাঁধিয়া যায় বলিয়াই তাহাতে ফসল তোলা শ্রমসাধ্য হয়। কর্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মাটিতে যত দিন বড় বড় চাকা থাকে, তত দিনই তাহা খুব শুষ্ক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা মৈ দিয়া গুঁড়া করিতে থাকিলেই নীচের রস ও গুণ ক্রমে উপরে উঠিয়া থাকে, উত্তমরূপ কর্ষিত ধূলি বা চূর্ণ করা একটা জমির উপরি-ভাগের কতক মাটি সরাইয়া দেখিলেই ইহা বুঝিবার সুবিধা হয়। ধানের চোঁচা, করাতের গুঁড়া, তুষ ও বালি যে স্থানে রাখা

যায়, ইহার তলাটা সর্ব্বদাই ভিজা স্যাঁৎসেতে থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত আমাদের কৈষিকাকর্ষণ শক্তির ক্রিয়া ভাল মত বুঝিবার সুবিধা করিয়া দেয় এবং এই কারণবশতঃই খুব টানের জমিতে বসানো ছোট চারা গাছের গোড়ায় প্রখর রোদের দিনে ধানের চোঁচা, করাতের গুঁড়া তুষ ইত্যাদির কোন একটা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিবার প্রথা স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শক্তি-প্রবাহের মন্দ গতি নিবারণের জন্যই গাছপালার গোড়ার মাটি সময় সময় খুঁড়িয়া দেওয়া বিশেষ দরকার হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থা দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়, মাটিতে কৈষিকা-কষণ শক্তি-প্রবাহের গতি বাড়ানও কষণ-কার্য্যের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

কর্ষণের দ্বারা মাটির বড় বড় চাকা উঠিয়া খুব শুকাইয়া গেলে তাহা গুঁড়া করা যে কঠিন হয়, তার কারণ মাটির রূঢ় ও খনিজ ভাগটা জল না পাওয়া পর্য্যন্ত প্যাক করা সূচের ন্যায় অবিকৃতই থাকিয়া যায়। সুতরাং বৃষ্টি না হওয়ার পূর্ব্বে তাহা বলের দ্বারা গুঁড়া করিলেও ফসলের পক্ষে উপাদেয় হইতে পারে না। আবার চাষের অব্যবহিত পরে মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ রস থাকিতে ঘন ঘন চাষ মৈ দিতে থাকিলে মাটি গুঁড়া হয় ও ঋতু অনুকূল বলিয়া অনেকে এই অবস্থায়ই ফসল বপন করিয়াও থাকে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ত্রুটি থাকিয়া যায়। কারণ প্রথম চাকা তোলা মাটিতে বড় বড় ফাঁক থাকায় উত্তপ্ত বায়ু মাটির ভিতরে সহজেই প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া তদ্দ্বারা মাটির দূষিত পদার্থসমূহ নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু চাকা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি গুঁড়া করিয়া ফেলিলে তাহা হইতে পারে না। এজন্য ঐ সকল দূষিত পদার্থ প্রশ্রয় পাইয়া কেবল আগাছা ও ঘাসের বল বাড়াইবারই সুবিধা করিয়া দেয়, যাহা জমির বলক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া থাকে। ঐ সকল অসুবিধা নিবারণের জন্য ঋতুর অবস্থা বুঝিয়া দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া

কর্ষণ আরম্ভ করা উচিত। কর্ষণ সময়ের মধ্যে বৃষ্টি না হইলেও সময় ঠিক রাখিবার জন্য রবিশস্যাদির বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে যেরূপ ফলন হয়, কর্ষণকালের মধ্যে পর্য্যায়ক্রমে দুই-একবার রৌদ্র বৃষ্টি হইয়া গেলে তদপেক্ষা অনেক ভাল হয়, তাহা কৃষক মাত্রেরই ধারণায় আছে মনে করি।

সোডা এসিড একত্র মিলাইলে যেরূপ একটা ক্রিয়া ও শব্দ হয় কর্ষিত খুব শুষ্ক জমির উপর জল পড়িলেও তদনুরূপ একটা ক্রিয়া ও শব্দ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের কর্ষিত মাটি যত অধিক শুষ্ক হয়, সেই ক্রিয়া তত বেগে হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়া যত অধিক বলের সহিত হয়, মাটি তত অধিক বলশালী ও শীঘ্র কার্য্যোন্মুখ হইয়া উঠে। কারণ কর্ষিত মাটি যত অধিক শুষ্ক হয়, ততই চাকার ভিতর ফাঁক পড়িতে থাকে এবং ঐ ফাঁকগুলি গরম বাতাসে পূর্ণ হয়। গরম মাটির উপর হঠাৎ জল পড়িলে ঐ ফাঁকগুলি জলে পূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চাকার ভিতরের গরম বায়ু যখন দ্রুতবেগে বাহির হইতে থাকে, তখন ইহার ফলে রূঢ় ও খনিজ ভাগটা সহজেই নরম হইয়া পড়ে এবং ঘাস ও আগাছার পক্ষে যাহা বলকারক সে-সব উপাদান নিগৃহীত হওয়ায় আবশ্যক উপাদানসমূহ শীঘ্র কাজের উপযোগী হইতে পারে। সুতরাং ঐ সকল ক্রিয়া হইবার জন্য যত সময়ের দরকার তত সময় হাতে রাখিয়া কর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শুষ্ক চাকার উপর পড়িয়া জমিতে যো হইলে ঐ সময়ে দেশের কৃষকেরাও মৈ দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা যে কতক উপকার হয় তাহাও তাহাদের ধারণায় আছে মনে হয়। কিন্তু তাহা কেন হয়, ইহার কারণটা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক সময়ই তাহাদের পক্ষে নানা ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

কর্ষণের অভাবঃ— কর্ষণের অভাব রাখিয়া ফসল বপন করিতে গেলে যে কেবল উৎপন্ন দ্রব্য কম হয় তাহা নহে, পরন্তু

ইহা জমির বলক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ একথা ইতিপূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। তাহা কেন, বা কি করিয়া হয়, সে কথাই এখন বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। উদ্ভিদের পোষণের জন্য যে যে উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন ইহার সবটা কেবল মাটিতে থাকে না এবং প্রচুর পরিমাণে সার দিয়াও লাভ করা যাইতে পারে না। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইহার কতকটা জলের সহিত ও কতকটা বায়ুর সহিত আসিয়া থাকে, একথা সোরা সারের আলোচনা কালে এক প্রকার বলা হইয়াছে। ঋতুর ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া বার বার কর্ষণ করিবার আবশ্যকতা যাহা বহু বারই বলা হইয়াছে, তাহা যথানিয়মে করিতে থাকিলে উত্তাপ, জল ও বায়ুর ক্রিয়ায় একদিকে মাটির দুষ্ট উপাদান-সমূহ নির্য্যাতিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক উপাদান সকল যেমন বলকারক ও উপযোগী হইতে থাকে, তেমনি অপর দিকে সুবিধা পাইয়া উল্লিখিত জলীয় ও বায়বীয় উপাদানগুলিও ক্রমে মাটিতে সঞ্চিত হইতে থাকে। সুনিয়মে কর্ষণ না করিলে উক্ত মাটির ভাল উপাদান ও জলীয় ও বায়বীয় উপাদান উভয় হইতেই বঞ্চিত হইতে হইবে। সেরূপ অবস্থা হইলে আগাছা ও ঘাসের প্রভাব বাড়িতে থাকিয়া জমির সার পদার্থ দ্রুতবেগে ধ্বংস করিতে থাকে ও তাহা হইতে জমির বলের অপচয় হইতে থাকা অনিবার্য্য হয়। একবার জমিতে ঘাসের প্রভাব বাড়িয়া গেলে তাহা সহজে দূর করিতে পারা যায় না। তাহা জমির বল উত্তরোত্তর কমিবার প্রধান কারণ হয়। মনে রাখিতে হইবে যে, আগাছা ও ঘাসের টানে জমির ভাল উপাদান যতটা ক্ষয় হইয়া থাকে, ফসলের টানে ততটা হইতে পারে না। কারণ মাটির রূঢ় ও খনিজভাগ উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের ধারক বা আবরক স্বরূপ হইয়া থাকে একথা মাটির বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় প্রসঙ্গে একবার বলা হইয়াছে। ঘাস ও আগাছা ঐ সকল আবরণ ভেদ করিয়া মাটির সার পদার্থ যত

সহজে গ্রহণ করিতে পারে সুখীজাতীয় গাছপালা তত সহজে পারে না। অল্প কর্ষণের দ্বারা ঐ সকল আবরণ কতক শিথিল হইয়া পড়িলে ঘাস ও আগাছার পক্ষে ভাল উপাদানগুলি উত্তোলন বা গ্রহণ করা অধিকতর সহজ হয় বলিয়াই ঘাস-জঙ্গলের প্রভাব বাড়িয়া মাটির বল খর্ব্ব করিয়া থাকে। এই কারণবশতঃ জমিতে পারতপক্ষে ঘাস-জঙ্গল হইতে না দেওয়া কর্ষণকার্য্যের যে এক বিশেষ লক্ষ্য, ইহা প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

জমির বলক্ষয়ের নানা কারণই হইতে পারে ও হইয়াও থাকে। এক জমিতে ক্রমাগত বহুদিন পর্য্যন্ত একই শস্যের আবাদ করিলে বা অস্বাভাবিক ঘন ঘন ফসল ফলাইতে গেলে জমির বলের যথেষ্ট হানি হইয়া থাকে। ইহার কারণ এক জমিতে প্রতি বার একই শস্যের আবাদ করিলে মাটির নির্দ্দিষ্ট কোন কোন উপাদান প্রায় নিঃশেষ হইয়া যায়, যার দরুণ প্রচুর সার ব্যবহার করিলেও সে-সব ক্ষতি প্রায়ই পূরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের নালিয়া জমিতেই ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক জমিতে প্রতিবারে এক ফসলের আবাদ না করাই ইহার প্রতিকারের উৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু বার বার কর্ষণের অভাব রাখিয়া শস্য উৎপাদন হেতু যে-সব জমি অত্যন্ত বলহীন হইয়া পড়ে, সে-সব স্থলে গভীর কর্ষণের ব্যবস্থা না করিয়া অন্য উপায়ে তাহা করিতে পারা যায় না। কারণ সুকর্ষণের দ্বারা মাটির বিষধর্ম্মী উপাদান-সমূহকে নির্যাতন না করিয়া তথায় অত্যধিক পরিমাণ সার দিতে গেলে তদ্দ্বারা কেবল ঘাস ও আগাছার বল-বৃদ্ধিরই প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে। যাহা হউক, কৃষকদিগের মধ্যে যাহারা সচ্ছল, অর্থাৎ রীতিমত হাল গরু খাটাইতে পারিতেছে, তাহাদের জমিতে গরীব কৃষকদিগের জমি অপেক্ষা ধান পাট ইত্যাদি সর্ব্বদাই বেশী হয়, ইহা যখন সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কর্ষণের অভাব রাখিয়া বার বার ফসল ফলাইতে যাওয়াই যে জমির বল-

ক্ষয়ের এক প্রধান কারণ তাহা নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারা যায়। কৃষির উন্নতিপ্রয়াসী ব্যক্তির সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, কৃষিকার্য্য করিয়া ঠিক ঠিক লাভবান হইতে হইলে সর্ব্বদা জমির বল অক্ষুন্ন রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ বলের অপচয় ঘটিলে তাহা পূরণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কর্ষণের অভাব রাখিয়া ফসল ফলাইতে যাওয়া জমির বল কমিবার এক প্রধান কারণ কি না, তাহা দেশের কৃষকদিগের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী ও হাল-গরুর অবস্থার প্রতি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতে পারিলে বুঝিবার অধিকতর সুবিধা হইবে।

কর্ষণের উপযোগিতা ঃ—এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কৃষির উন্নতিপ্রয়াসী ও উদ্যানপ্রিয় পাঠকের বুঝিবার ও চিন্তা করিয়া দেখিবার সুবিধার নিমিত্ত এই স্থানে আরও কয়টি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদি প্রায় সকল সভ্যজাতিরই আদি ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, আদিতে পরমেশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেন, তখন তাহাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—কৃষি ও পশুপালন। অর্থাৎ ইহাই জগতের আদিম ব্যবসা। তা' বলিয়া নয়ন, মন ও রসনার তৃপ্তিসাধনার্থে এখন আমরা যতপ্রকার ফল, ফুল, নানাজাতীয় শস্যাদি ও শাকসব্জী উৎপাদন করিয়া থাকি, মানবসভ্যতার উষাকালে এত সব ছিল কি? নিশ্চয়ই না। কারণ ভূমিজাত কৃষি-দ্রব্যাদির ইতিবৃত্ত যতই জানিতে পারা যাইতেছে ততই বুঝিতেছি যে, ইহাদের কতকগুলি ছিল বনে-জঙ্গলে বা পর্ব্বতে এবং কোন কোনটা ছিল সমুদ্রতীরে। এখন আমরা যে ফুলকপি খাইয়া বেশ তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি, তাহা ছিল সমুদ্রতীরবর্ত্তী অজ্ঞাত তিক্ত স্বাদবিশিষ্ট এক প্রকার গুল্মবিশেষ। গোল আলু ও তামাকের অবস্থাও এই প্রকার ছিল। মানুষই সেই সকল লোকালয়ে আনিয়া

যত্নের দ্বারা উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। এখন আমরা যে অসংখ্য রকমের ও মনোহর গন্ধবিশিষ্ট গোলাপ ফুলের গাছ বাগানে রোপণ করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা ছিল পর্ব্বতে বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার নগণ্য ফুল এবং তাহা এখনও কোন কোন স্থানের জঙ্গলে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আরও বহু-সংখ্যক ফল ফুলের ইতিবৃত্ত রহিয়াছে, যাহা এক সময়ে মানুষের কোন প্রকার ব্যবহারে লাগিত না। কিন্তু এখন তাহা বাগ-বাগিচার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। এ সকল উন্নতি মানুষেরই অদম্য চেষ্টার ফল এবং তাহা প্রধান ভাবে মাটির তদ্বিরের উৎকর্ষ সাধন করিয়াই করা হইয়াছিল। অবশ্য এই বিবর্ত্তন একদিনে হয় নাই, ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। তদ্দ্বারা কর্ষণের উপযোগিতা বুঝিবার অত্যন্ত সহায়তা হইয়া থাকে। খুবই আশা করা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রহস্য যতই উদ্ঘাটিত হইবে, ততই উদ্ভিদ-জীবনের উন্নতিও ক্রমে অধিকতর সাধিত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গো-মহিষাদি সংরক্ষণ

গো-মহিষের আবশ্যকতাঃ—কৃষিকার্য্যে গো-মহিষের স্থান সকলের উপরে। কারণ ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অকর্ষিত বা অল্প-কর্ষিত-জমিতে একাধারে ভাল মাটি, ভাল বীজ এবং যথেষ্ট পরিমাণে সার দিয়াও ভাল ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে না এবং তদুপলক্ষে সুকর্ষণের আবশ্যকতাও বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে। সুকর্ষণের জন্য সকলের আগে ভাল বলদ কিংবা ভাল মহিষ রক্ষার কথাই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হয়। কারণ ইহাদের বল ও সুস্থতার অনুপাতেই কর্ষণকার্য্যের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশের লোকে যাহাই করুক, আমাদের দেশে গো-মহিষাদিই কৃষি-যন্ত্রের প্রাণ বলিতে হইবে। সুকর্ষণ করিতে হইলে লাঙ্গল ইত্যাদি কৃষি-যন্ত্রাদির উৎকর্ষ সাধন করিয়া লওয়া খুবই দরকার। কিন্তু কৃষি-বল—গো অথবা মহিষের উপযুক্ত সংস্থান ও তাহাদের শক্তি ও সুস্থতা রক্ষার উপায় বিধান না করিয়া লাঙ্গল ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধনের চিন্তা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং কৃষিকার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সকলের আগে মনোযোগ সহকারে গো-মহিষাদির উন্নতি সাধনের উপায় শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। ইতি-পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে যে, কৃষকদিগের মধ্যে যাহাদের হালের গরু ভাল, তাহাদের জমিতে—গরীব কৃষক, অর্থাৎ যাহাদের হালের গরুর উপযুক্ত সংস্থান নাই তাহাদের জমি অপেক্ষা সর্ব্বদাই ফসল বেশী হয়। এই দৃষ্টান্ত হইতেও আমরা সহজেই হালের গরুর উন্নতি করিয়া লইবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারি। আমরা দীর্ঘ-কাল চাষবাসের কাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকিয়া এই

শিক্ষাই পাইয়াছি যে, হালের গরু সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকিলে কোন নৈসর্গিক কারণে এক ঋতুর ফসল নষ্ট হইয়া গেলে অন্য ঋতুর ফসল ফলাইয়া সে-সব ক্ষতি অনায়াসেই পূরণ করা যায়। কিন্তু হালের গরু অকর্ম্মণ্য বা সংখ্যায় কম হইলে রীতিমত একটা ফসল তোলাই কঠিন হয়। কিন্তু ইহা এতদ্দেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং কৃষকের দৈন্য বৃদ্ধির ইহা যে এক প্রধান কারণ একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে কৃষকের দৈন্য বৃদ্ধিই ভারতের বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার সমাধানের উপায় খুঁজিতে গিয়া যার চিন্তায় যাহা ধরা পড়িতেছে তাহা তিনি ব্যক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। কেবল তাহা নহে, এতদর্থে আইন-কানুনের অহরহ পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। কিন্তু তদ্দ্বারা দেশের কোনই শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমরা বলি কৃষকের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে তাহা কেন হইতেছে তাহাই সকলের আগে দেখা দরকার। কারণ রোগের কারণের প্রতি উদাসীন থাকিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলে যেমন প্রতিপদেই বিফলের সম্ভাবনা, ইহাও যেন অনেকটা সেইরূপ হইয়াছে। যে দেশের মাটি ও জলবায়ুর গুণে সামান্য যত্নের দ্বারাই প্রচুর শস্যাদি জন্মাইতে পারা যায় ও যে কারণে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকই কৃষিজাত কোন-না-কোন দ্রব্যের জন্য এদেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া আসিতেছিল, তথায় আজ কৃষকের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় খুঁজিয়াও পাওয়া যাইতেছে না; ইহা কেবল দুঃখের কথা নহে, পরন্তু লজ্জারও কথা। যে দেশের লোক গোলা-ভরা ধান ও স্বচ্ছন্দ পরিমাণ গাইয়ের দুধ ঘরে থাকিলে ও অঋণী অপ্রবাসী হইতে পারিলেই নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিত, যে দেশে "চাষার জীবনই খাসা"—এই কথাটা প্রবাদ বচনের মত লোকমুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত, তথায় আজ কৃষিকার্য্য করা লোকসানের বিষয় ভাবিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই

যেন লোকে বাঁচে মনে হয়! ফলে কৃষিকার্য্যের সংস্রবে যাইতে আজ শিক্ষিত যুবকের প্রাণেও আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইরূপ মনোভাবের সৃষ্টি কেন হইল তাহা অবশ্যই দেখিতে হইবে।

আমরা সর্ব্বদা পল্লীগ্রামে বাস করি; কৃষকের কৃষি-ব্যবসায়ের লাভালাভের সহিত আমাদের জীবন-মরণের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ রকমের বলিয়া অনায়াসেই বুঝিতে ও বলিতে পারিতেছি যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির উৎপন্নের হার বেজায় কমিয়া যাওয়াই কৃষকের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির প্রধান কারণ এবং তাহা দেশের গো-কুলের শোচনীয় রকমের দুর্দ্দশাগ্রস্ত হওয়ারই অপরিহার্য্য পরিণতি। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, গো-সমস্যাই এখন ভারতের সকল সমস্যার বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে এই সমস্যার দীর্ঘ আলোচনা করিবার স্থানাভাব। তাছাড়া অন্যান্য পুস্তিকা ও প্রবন্ধে ইহার পৃথক আলোচনা করিয়াছি। যাহাদের ইচ্ছা হয় তাহারা সে-সব পুস্তক ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এ বিষয়ে অনায়াসেই ওয়াকিবহাল হইতে পারেন।* কৃষির উন্নতির উপায় দেখাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং তাহাই আমাদিগকে মনোযোগের সহিত দেখিতে ও দেখাইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

চাষবাসের কাজ করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইলে, প্রত্যেকের চাষের জমির পরিমাণানুসারে উপযুক্তসংখ্যক গরু রাখা ও ইহারা যাহাতে দৃঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইতে ও সর্ব্বদা নিরাপদে থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই প্রধান কাজ। চাষের জমির পরিমাণানুসারে হালের গরু দুর্ব্বল বা সংখ্যায় কম

---

* গো-সমস্যা সম্বন্ধে মৎপ্রণীত "দেশের অভাব বৃদ্ধির কারণ" নামক পুস্তিকায় ও "কৃষির উন্নতি গো-জাতির উন্নতি সাপেক্ষ" নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে (১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আসাম কৃষি-বিভাগের কৃষি-বিশেষজ্ঞদের এক সভায় ইহা পাঠ করিয়াছিলাম) নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে বিস্তৃতভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

হইলে জমিতে কর্ষণের অভাব অল্পবিস্তর হওয়া স্বাভাবিক, যাহা একাধারে উৎপন্ন দ্রব্যের হার কমিয়া যাইবার ও জমির বলক্ষয়ের প্রধান কারণ হয়। একথা পূর্ব্ব অধ্যায়েও বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, অল্প হালের গরু লইয়া কাজ করিতে গেলে অপরিমিত শ্রমহেতু তাহা গরুর জীবন-নাশেরও প্রধান এক কারণ হইয়া থাকে। বলাবাহুল্য, এই ভাবে আকস্মিক ও অপ্রাপ্ত-বয়সে মৃত্যুর হাত হইতে গরুকে রক্ষা করিতে না পারিলে প্রতি-বৎসরই গরু কিনিয়া চাষবাসের কাজে সাফল্যলাভ করা যাইতে পারে না। ইহাই কৃষকের সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এতদঞ্চলে এ দৃষ্টান্ত প্রচুর মিলিবে। সুতরাং গবাদিকে কি করিয়া সর্ব্বদা সুস্থ ও কর্ম্মঠ এবং নিরাপদে রাখা যাইতে পারে তাহার উপায় সকলেরই আগেই শিখিয়া লওয়া বিশেষ দরকার।

গরু ভাল রাখিবার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ঃ—এ সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহা পাঠ করা সকলের পক্ষে সুবিধা না হইতে পারে বিবেচনায় নিম্নে সংক্ষেপে তাহা লেখা যাইতেছে। বীর্য্যশালী ষাঁড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদন ও তাহাদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য দান এবং উত্তম পরিচর্য্যা—এই তিন উপায় একাধারে পরিচালন করাই ভাল গরু পাইবার ও তাহা-দিগকে দীর্ঘজীবী ও বলবান করিয়া তুলিবার প্রধান উপায়। সুতরাং উক্ত তিনটি বিষয়ই ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

গো-জনন ষাঁড়ের দোষ-গুণ:—বীর্য্যশালী ষাঁড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদন করিতে গেলে বাছুরগুলি বলিষ্ঠ হইয়াই জন্মায়, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা উপযুক্ত পরিমাণে ও সর্ব্বদা এক নিয়মে পুষ্টিকর খাদ্য এবং ঠিক ঠিক পরিচর্য্যা পাইলে যে অতি অল্পকাল মধ্যেই পূর্ণাবয়ব বলবান গরুতে পরিণত হইবে এবং তাহা-দের শরীরে শীত বাত সহ্য ও রোগের আক্রমণের গতি প্রতিরোধ

করিবার শক্তিও যে অধিক থাকিবে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কারণে তাহারা সহজে কোন রোগের কবলে পড়ে না এবং অধিক দিন বাঁচিতেও পারে।

হীনবীর্য্য ষাঁড়ের ঔরসজাত গরু স্বভাবতঃ দুর্ব্বলপ্রকৃতি হইয়াই জন্মায়। এই কারণে তাহারা ভাল খাদ্য পাইলেও সেরূপ বলিষ্ঠ ও শ্রমসহিষ্ণু হইতে পারে না। তাহাদের শরীরে রোগের আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবার শক্তিও কম থাকে বলিয়া তাহারা সামান্য কোন রোগের কবলে পড়িলে সহজেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এতদঞ্চলের গরুর মৃত্যুর হার অধিক হইবার ইহাই প্রধান কারণ। এই সকল বিবেচনায় ভাল গরু পাইতে হইলে চাষীর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে বীর্য্যশালী ষাঁড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদনে যত্নবান হওয়া বিশেষ দরকার।

গো-খাদ্য নির্ব্বাচনঃ—ইহার উপর গরুর স্বাস্থ্য সর্ব্বদা এক রূপ ও ভাল থাকা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এখন এই কথাই বলা যাইতেছে। ঘাসই গরুর প্রিয় ও স্বাভাবিক খাদ্য। স্বাভাবিক খাদ্য মানে, প্রচুর ভাল ঘাস পাইলে গরু অন্য কোন খাদ্য খাইতে সহজে রাজি হয় না। কিন্তু সেরূপ ঘাসের সচ্ছলতা প্রায় সর্ব্বত্রই খুব দুর্ল্লভ বলিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ঘাসের সমূহ অভাব স্থানে স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই ঘাস যতটা দিতে পারা যায়, ইহার সহকারীরূপে অন্য কোন-না-কোন পুষ্টিকর খাদ্যের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়। ইহার অভাব হইলে শ্রমজনক কার্য্যে নিযুক্ত বলদের একাধারে শরীর ও কাজ করিবার শক্তি দ্রুত-গতিতে হ্রাস হইতে থাকিয়া অপ্রাপ্ত বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবার প্রধান কারণ হয়; গাইগুলির দুধ কমিয়া যায়, একবার প্রসবের পর পুনরায় গর্ভধারণ করিতে অস্বাভাবিক দেরী হইয়া থাকে, বা একেবারেই অক্ষম হয়। এতদঞ্চলের গরুর মধ্যে এরূপ হইতে সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টিকর খাদ্যবস্তুর মধ্যে নানাজাতীয় খৈল, খেসারী, মসুরী ছোলা, অরহর, কলাই ইত্যাদি নানাজাতীয় দাল, যই, ভুট্টা, গম, গমের ভুষি (Wheat bran), কার্পাসবীজ ইত্যাদি কয়টি বস্তুই প্রধান। ইহাদের সকলটার গুণ এক প্রকার নহে। ইহাদের কোনটা শ্রমকাজের বলদের বল-বৃদ্ধির পক্ষে ও কোনটা গাইয়ের দুধ-বৃদ্ধির পক্ষে ভাল এবং কোন-কোনটা দ্বারা উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করা যায়। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সে-সব বস্তুর বিশেষ বিশেষ গুণের সম্যক পরিচয় লইয়া যাহার পক্ষে যে বস্তু খাটে তাহাকে তাহা ঘাসের সহকারীরূপে প্রতিদিনই পরিমাণ মত খাইতে দেওয়াই গো-সমূহের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধনের প্রধান উপায়। এতদঞ্চলে এক মাত্র ধানের খড়ই গরুর খাদ্যাভাব মিটাইবার প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কদাচিৎ কেহ ইহার সহিত নাম মাত্র খৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সব করিতে যাওয়ার সময় ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমরা যেমন প্রতিদিন খেসারী ডাল আর ভাত যথেষ্ট পরিমাণে খাইলেও শরীর ভাল রাখিতে পারি না ও তাহা নানা রোগের কবলে পড়িবারই প্রধান কারণ হয় এবং কাজকর্ম্ম করিবার শক্তিও সঙ্গে সঙ্গে বিলোপ হইতে থাকে, সেইরূপ পুষ্টিকর খাদ্যের এককালীন অভাব রাখিয়া গো-পালন করিতে গেলেও তাহাদের বিনাশের পথ পরিষ্কার হইবার সঙ্গে সঙ্গে কেবল মনস্তাপ ডাকিয়া আনা হয়।

উপরে যে-সব পুষ্টিকর খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, গো-শরীরে সে-সবের প্রভাব কতদূর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যে সকল গরু সর্ব্বদা মাঠের খুটা ঘাস ও সামান্য খড়কুটা খাইয়া জীবনধারণ করে ও মাত্র ৪।৫ ঘণ্টা একখানা ছোট লাঙ্গল টানিতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পড়ে, তাহাদিগকে ঐসব খাদ্যের উপর প্রতিদিনই আধসের খৈল ও আধসের ছোলা বা তত্তুল্য কোন শস্য খাইতে দিলে তাহারা দ্বিগুণ ত্রিগুণ পরিশ্রম করিয়াও সেরূপ ক্লান্ত

হয় না। অথচ সর্ব্বদাই একরূপ হৃষ্টপুষ্ট থাকিতে পারে, এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। গরুর গাড়ী, তেলের ঘানি ও নানাকাজের মিল চালাইবার বলদের খাদ্য-তালিকা ও তাহাদের শ্রমসহিষ্ণুতা এবং তেজবীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিহার অঞ্চলে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, সে স্থানের চাষীরা পূর্ব্বাহ্ন পরাহ্ন দুই বেলাই হল চালনা করে, অথচ তাহাদের গরু বার মাসই একরূপ হৃষ্টপুষ্ট দেখা যায় এবং তাহা যে ভাল খাদ্য পরিচর্য্যার গুণে হইতেছে তাহাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। অনেকেই অবগত আছেন যে, সকল প্রকার ডাল, গম, যব, যই, ভুট্টা ইত্যাদির চাষই সে অঞ্চলের চাষীদের প্রধান কৃষি। সেজন্য তাহারা কতকটা অনায়াসেই সে-সব শস্য ও ইহার খোসা, ভূষি ইত্যাদি গরুকে খাওয়াইতে পারে। ইহার দরুণ তাহাদের গো-মহিষাদি বেশ পুষ্টকলেবর ও দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইতে পারে। এসব দৃষ্টান্ত হইতে চাষী অথবা গো-পালক মাত্রেরই পক্ষে রবি-শস্যের আবাদ করিতে যাওয়া যে খুব উচিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

গো-পরিচর্য্যা ঃ—ভাল জনন-ষাঁড়ের দ্বারা গো-বৎস উৎপাদন করাইয়াও যদি তাহাকে খাদ্য দানে কৃপণতা করা হয় তবে তাহা দ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যেমন কঠিন হয়, সেইরূপ তেজ-বীর্য্যসম্পন্ন গরুকে উচিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দানের ব্যবস্থা করিয়াও যদি ভাল পরিচর্য্যার অভাব ঘটে, তাহা হইলে তাহাও মনস্তাপের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। গবাদির স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে তাহাদিগকে যাহাই খাইতে দেওয়া হউক, ইহার পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে এবং সর্ব্বদা এক নিয়মে, এক সময়ে ও একই পরিমাণে খাদ্য দিতে হইবে। ঘাস গরুর অতিশয় প্রিয় খাদ্য, একথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। সেজন্য অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য যতই দেওয়া হউক, ঐ

সঙ্গে প্রতিদিনই অন্ততঃ ১০।১২ সের ভাল ঘাস কিম্বা অন্য কোন প্রকার সবুজ খাদ্য (green-fodder) না দিলে তাহাদের ঠিক ঠিক তৃপ্তি সাধন করা যায় না। তা' বলিয়া কোন ভাল গরুকে যথেচ্ছভাবে মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ মাঠে-চরানো গরুর মধ্যেই বসন্ত, গলা ফুলা (anthrax) ইত্যাদি সংক্রামক ও দ্রুত প্রাণনাশক রোগের প্রভাব অধিক দেখিয়া গো-চারণ মাঠই সে-সব রোগ-বীজাণুর উৎপত্তি স্থান বলিয়া মনে হয়। তা' ছাড়া গবাদিকে স্বাধীনভাবে মাঠে চরিতে দিলে তাহারা খাল, নালা ইত্যাদির দূষিত জল অবাধে পান করিতে পারে। ইহা তাহাদের আকস্মিক মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। চামারেরা গোচারণ মাঠের ঘাসের উপর বিষ বা রোগ-বীজাণু ছড়াইয়া গো-হত্যা করে বলিয়া সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও মাঠে-চরানো গরুর সম্বন্ধে ভাবিবার কথা। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে কোন্ মূল্যবান গরুকে স্বাধীনভাবে মাঠে চরিতে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঘাস দিতে হইলে তাহা কাটিয়া অথবা খুরপি দ্বারা তুলিয়া ভালরূপ ধুইয়া খাইতে দেওয়াই উচিত। ঘাস না ধুইয়া খাইতে দিলে ঘাসের সহিত উপরের লিখিত কোন-না-কোন রোগ-বীজাণু গরুর উদরসাৎ হওয়ার আশঙ্কা থাকিয়া যায় এবং ঘাসের সহিত মাটি ও অন্যান্য নানা দূষিত পদার্থ যাহা থাকে তাহা গরুর পেটে গিয়া বিবিধ রোগের সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা বুঝিতে পারা অধিক কঠিন নহে।

স্বভাবজাত ঘাসের মধ্যে গরু সকল প্রকার ঘাস খাইতে ভালবাসে না এবং কোন কোন ঘাসও গো-শরীরের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্ট-কারী। সে-সব বাদ দিয়া বা চিনিয়া ঘাস কাটিয়া খাওয়ান একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ঘাস-বিশেষের চাষ করিয়া তাহাতে অন্য গরুর প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া দিয়া তাহা হইতে ঘাস কাটিয়া লওয়ানই

উপরের লিখিত সমস্ত অসুবিধা এড়াইবার প্রধান উপায়। হেমন্ত ঋতুতে খেসারি ও কলাইয়ের চাষ করিয়া সে-সবের কাঁচা গাছ তুলিয়া খাওয়াইলে অগ্রহায়ণ হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ঘাসের জন্য একটুও ভাবনায় পড়িতে হয় না। খেসারি ও কলাই গো-শরীরের পুষ্টিকর এবং গাভীগণের দুগ্ধবর্দ্ধক বলিয়া কোন কোন অঞ্চলে ইহার চাষ করা প্রথার মত দাঁড়াইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষার কয়েক মাস ভুট্টা ও বরবটির চাষ গো-শরীর ভাল রাখিবার সুন্দর উপায়। এই দুইটি জিনিসও গো-শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর এবং গাইয়ের দুগ্ধবর্দ্ধক। এইরূপ আরও অনেকই আছে, যাহার চাষ করিয়া গবাদিকে ভাল রাখা যাইতে পারে। তাহাতে বিশেষ শ্রম বা ব্যয়বাহুল্য নাই, তাহা শুধু আগ্রহসাপেক্ষ।

গরুর স্নান ঃ—নিত্য নিয়মিত ভাবে স্নান করানো হালের বলদ ও দুধের গাই সকলেরই স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার এক প্রধান উপায়। যে-সকল গরুকে ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া খৈল, ডাল ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হয়, তাহারা একদিন স্নান না করিলেই যে কতকটা অসোয়াস্তি বোধ করে তাহা বেশ টের পাওয়া যায়। কারণ পুষ্টিকর খাদ্য মাত্রই অত্যন্ত উত্তেজক।

গো-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মতে গবাদির যত রোগ হয় ইহার অধিকাংশেরই বীজাণু তাহাদের লোমকূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হইয়া থাকে। নিত্য নিয়মিতভাবে ভাল জলে মাজিয়া ঘষিয়া স্নান করানোই ইহার প্রধান প্রতিষেধক উপায়। নদীর স্রোত-জলে স্নান গো-শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ঋতু ও অবস্থা বিশেষে গরম জলে স্নান ও গরম জল পান করিতে দেওয়া গরুর স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

গোশালা ঃ—গরুর বাসস্থান সর্ব্বদা পরিষ্কার ও খুব শুক্‌না খট্‌খটে করিয়া রাখা এবং গোশালার ভিতর বায়ু চলাচলের জন্য উপযুক্তসংখ্যক দরজা জানালা রাখা গো-শরীর ভাল রাখিবার

অন্যতম প্রধান উপায়। কারণ বায়ু ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন অত্যাবশ্যক, গরুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তেমনি প্রয়োজনীয়।

দুধের ব্যবসা—গরু ভাল পাইবার ও রাখিবার অন্যতম প্রধান উপায়ঃ—দুধের ব্যবসা দ্বারা লাভের উপায়-চিন্তা সাধারণতঃ গাভীগণের দুধ বাড়াইবার উপায়-চিন্তা হইতেই সূচিত হইয়া থাকে, যাহার জন্য ইহাকে গোজাতির উন্নতি সাধনের বিজ্ঞান-সম্মত প্রধান উপায় বলাই খুব সঙ্গত। কারণ সচরাচর দেখা যায় যে, যে গাভী যত অধিক পরিমাণে দুধ দেয় তাহার সন্তান-সন্ততি তত ভাল গাই বা বলদে পরিণত হইয়া থাকে এবং সেরূপ ভাল বলদ বা গাই তাহাদের পিতামাতার সম্বন্ধ যোজনার উৎকর্ষ দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দুধের ব্যবসায়ীর পক্ষে ভাল ষাঁড় (ভাল ষাঁড় মানে অধিক দুগ্ধদাত্রী বংশের বলবীর্য্যশালী ষাঁড়, যাহাকে গো-বিজ্ঞানের ভাষায় Pedigree Bull বলা হইয়াছে) দ্বারা গাভীগণের জনন-কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা আপনা হইতেই আসিয়া থাকে। কারণ গো-বৈজ্ঞানিকেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অধিক দুগ্ধদাত্রী বংশের ষাঁড়ের ঔরসজাত গাভীগণেরই বংশ-পরম্পরায় দুগ্ধদানশক্তি বাড়িয়া থাকে। সেজন্য এরূপ ষাঁড় দ্বারা গোবৎস উৎপাদনের চেষ্টা দুগ্ধব্যবসায়ীর পক্ষে খুব স্বাভাবিক। ফলে তাহারা বেশী দুধ দেয় এমন গাই ও তেজবীর্য্যশালী ষাঁড় বা বলদ লাভ করিতে পারে।

উপরের লিখিত অবস্থা হইতে কৃষকের পক্ষে কৃষির সকল কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের সামর্থ্যানুসারে এক, দুই বা ততোধিক ভাল দুধের গাই রাখিয়া দুধ বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলে গো-পালনের আবশ্যক ব্যয়ের জন্য কোন ভাবনায় পড়িতে হয় না। গো-পালনের ব্যয় বহনে অসামর্থ্য হেতুই কৃষকগণ সাধারণতঃ মাঠে গরু চরাইতে বাধ্য হয়। ইহাতে গাভীগণের আকস্মিক মৃত্যুর

বিশেষ সম্ভাবনা ঘটে এবং নিত্য গো-মড়কের হাতে পড়িয়া স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইতে হয়। পক্ষান্তরে, ভাল দুধের গাই রাখিলে এক দিকে যেমন দুই-দশ টাকা লাভ হইতে পারে অন্যদিকে তেমনি হালের ভাল গরু ও ভাল দুধের গাই নিজেদের ঘরেই উৎপন্ন হইতে পারে, যেরূপ গাই বলদ অনেক সময় যথেষ্ট টাকা-পয়সা দিয়াও পাওয়া দুর্লভ হয়।

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থানে চাষীদের মধ্যে দুধ বিক্রয় করিবার প্রথা খুবই প্রবল। সেজন্য তথায় দুধ ঘি স্বভাবতঃই অত্যন্ত সুলভ। দুধ ঘি সুলভ বলিয়াই যে সে-সব অঞ্চলে বলবান্ লোক অধিক দেখিতে পাওয়া যায় একথা স্বতঃই মনে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহারা তাহাদের হালের ভাল গরু নিজেদের ঘরেই উৎপাদন করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হালের গরু বলিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিয়াই তাহারা প্রকাণ্ড আকারের লাঙ্গল ব্যবহার করিতেও সমর্থ হয়, যাহার দরুণ তাহাদের কর্ষণকার্য্য স্বাভাবিক নিয়মেই ভাল হয় ও এই কারণে উৎপন্ন-দ্রব্য যতটা হইতে পারে তাহা পাইতে পারে। আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা এক জোড়া ভাল বলদের দ্বারা দশ-বার বিঘার অধিক জমি চাষ করিতে কখনও প্রয়াস পায় না। ইহাও তাহাদের জমিতে কর্ষণ ভাল হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। আর আমাদের অঞ্চলের অনেক চাষীকেই অনাহারক্লিষ্ট অস্থিকঙ্কালসার দুইটি গরু দ্বারা পনর-কুড়ি বিঘা পর্য্যন্ত জমি চাষ করিতে দেখা যায়। ইহার দরুণ সকল জমিতেই কর্ষণের অভাব থাকিয়া যাওয়া অপরিহার্য্য হয়। ইহা একাধারে ফলন কম হওয়া ও জমির বল দ্রুতগতিতে কমিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে গরুরও বিনাশের প্রধান কারণ হইয়া থাকে। এতদঞ্চলের কৃষকের দারিদ্র্য বৃদ্ধির ইহা অন্য এক প্রধান কারণ।

এখন গরুর অভাব বা অকর্ম্মণ্যতাবশতঃ এতদঞ্চলের চাষীরা

কিরূপে তাহাদের কৃষিপদ্ধতি বদ্‌লাইয়া লইতে বাধ্য হইতেছে তাহাও বলা দরকার মনে করি, যাহা হইতে বুদ্ধিমান্ পাঠক তাঁহাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কর্ষণ ভালমত করিতে হইলে ভাল গরু ও ভাল লাঙ্গলের দরকার তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে যাহারা সক্ষম তাহারা তাহাই করিতেছে এবং ঈশ্বর কৃপায় তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দেই দিনপাত করিতে পারিতেছে। কিন্তু গো-কুলের অভাব ও অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ ব্যক্তিই লাঙ্গলের আকার দিন দিন খর্ব্ব করিয়া লওয়াই তাহাদের হালের গরুর শ্রম-ভার কমাইবার প্রধান উপায় করিয়া লইতেছে। একখানা চারি ইঞ্চি মুখের লাঙ্গল দ্বারা যত সময়ে যে পরিমিত স্থান চাষ করা যাইতে পারে, দুই ইঞ্চি মুখের একখানা দ্বারা তাহা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা একটুও কঠিন নয়, কিন্তু তাহারা তাহাই করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যতসংখ্যক ভাল বলদ ও বড় আকারের লাঙ্গল দ্বারা যত সময়ে যে পরিমিত স্থান চাষ দেয় তাহার প্রতিবাসীও ঐ দৃষ্টান্তে ও ঋতুরক্ষার অনুরোধে বাধ্য হইয়া ততসংখ্যক অকর্ম্মণ্য বলদ ও ছোট আকারের লাঙ্গল দ্বারা সেই সময়ে তত জমিতেই চাষ দিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ইহাতে যে প্রত্যেক পালটের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকিয়া যায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দারিদ্র্য দোষ এমনই ভয়ানক যে, সে-সব তাহারা ভাবিতেই অক্ষম। এই সকল কর্ষিত জমির উপরের মাটি কতক সরাইলে দেখা যায়—সব জায়গার মাটি খোঁড়াই হয় নাই। এই অবস্থায় যে ভাল ফসল হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা যদি বিপন্ন হয়, তবে ইহাকে অস্বাভাবিক ভাবিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে কৃষির উন্নতি যে গো-কুলের উন্নতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, কেবল তাহাই প্রমাণিত হয়।*

* মৎপ্রণীত 'গো-পালন শিক্ষা' পুস্তকে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়াছি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কৃষি-যন্ত্রাদি

প্রত্যেক প্রগতিশীল কাজেরই সাফল্য যন্ত্রাদির উৎকর্ষের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। দেশে একটা কথাও আছে, "হাতিয়ার গুণে পাইক"; সুতরাং কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান হইতে হইলে কৃষকের পক্ষে কৃষি-যন্ত্রের প্রাণ গো-সমূহের উন্নতি করিয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল ইত্যাদিরও উন্নতি করিয়া লওয়া দরকার। বর্ত্তমানে সভ্যদেশবাসী মাত্রেই নূতন নূতন ধরণের লাঙ্গল, হাত-লাঙ্গল, কলের লাঙ্গল (Motor Tractor), বিভিন্ন রকমের ছোট বড় কোদাল, নানা ধরণের মৈ ও ছোট বড় অসংখ্য প্রকারের নিড়ানি যন্ত্র, জমির আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিবার যন্ত্র, মাটি পাইট করিবার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছেন, যাহা দ্বারা সময় ও শ্রম বাঁচাইয়া ভাল কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এ সবের সাহায্যে যে কৃষির লাভের পথ দিন দিনই সুগম হয় ও হইতে পারে তাহা একটু মনোযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য এদেশের পক্ষে যাহা বিশেষ উপযোগী ও অত্যন্ত দরকারী এইরূপ কয়টি কৃষি-যন্ত্রের চিত্র সহ উপযোগিতা সম্বন্ধে পরিশিষ্টে বলা হইবে।*

* ফটো-ফিল্‌ম বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলাম

সপ্তম অধ্যায়

বীজ

কৃষিকার্য্যের প্রধান দুই অঙ্গ ক্ষেত্র ও বীজ। যেমন মাতা ও পিতা।* পিতা কিম্বা মাতা কিম্বা উভয়ই দুর্ব্বল বা কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে; অথবা একজন সুস্থ ও বলিষ্ঠ মানুষ শীত বাত ইত্যাদি দুঃখকষ্ট যতটা সহিতে পারে, রুগ্ন ও দুর্ব্বল মানুষ তাহা কখনই পারে না। সেইরূপ রুগ্ন ও নিস্তেজ গাছপালা হইতে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহার গাছেও শীত, বাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রব তেমন সহিতে পারে না, কাজেই ফললাভেও বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে বীজ সংগ্রহ বা উৎপন্ন করিবার বেলায় সতর্ক হওয়া উচিত।

উৎপন্ন ফসলের হার কমিয়া যাওয়া ও গাছপালা অফলা হওয়া কিম্বা অকালে মরিয়া যাওয়ার এক কারণ মাটির দোষ বা উপযুক্ত সার ও কর্ষণের অভাব। অন্যতম প্রধান কারণ বীজের দোষ। বীজে দোষ থাকিলে কেবল মাটির তদ্বির করিয়া বা জমিতে প্রচুর পরিমাণ সার দিয়াও পরিমিত ফল লাভ করা দুরাশা মাত্র। অপুষ্ট, অকালপক্ক ও অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের ফসল ওজনে হালকা হয়, কাজেই ভাল বীজ হইতেই পারে না; তদ্ভিন্ন অযত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত, গাদা-পচা এবং কুলদোষজাত যে ফসল, তাহা বীজের পক্ষে

---

* এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে আধুনিক বিজ্ঞান মতে মাতৃবীজ ও পিতৃবীজ মিলিত হইয়াই নূতন জীবনের উন্মেষ হয়। কাজেই পিতা যেমন বীজদাতা, তদ্রূপ মাতাও বীজদাত্রী; অধিকন্তু মাতা ক্ষেত্রও বটে। আমাদের আলোচ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যেই ক্ষেত্র ও বীজের সম্পর্ক সম্বন্ধে মাতা ও পিতার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

অতিশয় ক্ষতিকারক। অথচ এই প্রকার বীজই আমাদের দেশে অধিক ভাবে বপন করা হইয়া থাকে। এদেশে বীজ তোলা বা সংগ্রহ বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি নাই বলিলেই চলে। ফসল পাকিলে তাহা কাটিয়া বা উপড়াইয়া আনিয়া একস্থানে গাদা করিয়া রাখিয়া দেওয়া ও তাহা মাড়াইবার সময় যাহা ভাল মনে হয় তাহাই শুকাইয়া রাখিয়া দেওয়া দেশের প্রচলিত রীতি। দুঃখের বিষয়, এই নিয়মও সকল স্থানে রক্ষিত হয় না। কারণ কাটা ফসল হয়ত মাড়াইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া গাদা অবস্থায়ই কিছু দিন থাকিয়া যায়। এই কারণবশতঃ কিম্বা গাছের স্বাভাবিক রসেও ফসল গরম হইয়া উঠে। ফলে ইহা জ্বলিয়া যায় বা সিদ্ধ হওয়ার মত হইয়া যায় কিম্বা কোন কোনটার অঙ্কুর উদ্গম হইয়া পড়ে। এই সব দৃশ্য খুব সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। বীজের জন্য এইরূপ শস্যাদি কিছুতেই রাখা যাইতে পারে না, রাখা উচিতও নহে। কিন্তু কাহারও কাহারও হয়ত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বীজ রাখিবার অন্য সম্বল নাই। সেজন্য তাহাই শুকাইয়া বীজের জন্য রাখিয়া দেয় ও যথাসময়ে বপন করে এবং কেহ বীজের জন্য চাহিলে তাহা বিক্রয় করে। অধিকাংশ বীজ দেখিয়া দোষ-গুণ বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা ক্রেতার নাই। বিক্রেতাও ভাবিতে অক্ষম যে, ইহাতে ক্রেতার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহা যে বিক্রেতার দুরভিসন্ধিমূলক কাজ, তাহা বলা যায় না। কারণ সে তাহার নিজের জমিতেও ইহা বপন করিতে দ্বিধাবোধ করে না। ইহাই দেশের এক প্রকার প্রচলিত রীতি। বীজ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের কথা কি হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। দেশের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। অভাবের তাড়নায় অনেকেই নিয়মমত বীজ রাখিতে পারে না এবং বীজ বপনের সময় আগত হইলে যাহা-তাহা অথবা বাজারে খাদ্যশস্য যাহা বিকিকিনি হয়, তাহাই কিনিয়া আনিয়া বপন করিতে বাধ্য

হয়। ইহা যে দেশের উৎপন্ন শস্যাদির হার দ্রুত গতিতে কমিয়া যাইবার এক প্রধান কারণ, তাহা নিঃসংশয়েই বলা যায়। কিন্তু এ সকলের দেশব্যাপী প্রতিকার কি হইতে পারে তাহা এক কঠিন সমস্যা।

কুলদোষজাত বীজঃ—উপরে অযত্নে সংগৃহীত ও রক্ষিত বীজের কথা বলা হইল। এই প্রকার বীজের দ্বারা বংশপরম্পরায় জাত যে শস্যাদি, তাহাই কুলদোষজাত। তাহা সুপক্ক বেশ তাজা অবস্থায় সংগৃহীত হইলেও ক্ষেত্রে বপন করা উচিত নহে। কারণ বংশপরম্পরায় অযত্নসেবিত হওয়ায় ইহাদের বৈজিক শক্তি (যে শক্তি প্রভাবে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছপালা ফল ও শস্যাদিতে সুশোভিত হয়) কমিয়া যায়। সুতরাং এইরূপ বীজ বপন করিয়া পুরা ফসল পাইবার আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে এই প্রকার বীজই অধিক ভাবে বপন করা হইয়া থাকে। এই কারণে কোন্ জাতীয় শস্যাদির উৎপন্নের হার ঊর্দ্ধে কত হইতে পারে, তাহা দেশের কৃষকদিগের কোন কালে বুঝিবার সুবিধা হয় না। এ দেশে সচরাচর ভাল ফলন যাহা হইয়া থাকে, বিশুদ্ধ প্রণালীতে সংগৃহীত ও রক্ষিত বীজ হইলে তাহা হইতে ফলন যে আরও অনেক ভাল হইতে পারে, তাহা হাতে-কলমে করিয়া না দেখা পর্য্যন্ত বীজের দোষই যে উৎপন্ন দ্রব্য কম হইবার এক প্রধান কারণ তাহা বুঝিতে পারা কঠিন।

ফসল পাকিলে তাহা যখন কাটিয়া আনা হয় তখন মনোযোগ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে ইহাদের সবগুলি সমান পরিপক্ক হয় নাই। অর্থাৎ পরিপক্কতার হিসাবে ইহাদের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন শ্রেণীর শস্যই থাকে। এই তিন শ্রেণীর মিশ্রিত বীজের গাছে যে পুরা ফসল হইতে পারে না, তাহা বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্নে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্ট কতিপয় সাধারণ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ধান্যের কথাই বলা যাইতেছে। বিভিন্ন স্থানের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, একটি ভাল ধান্য হইতে যে গাছ হয় তাহা উপযুক্ত স্থানে বর্দ্ধিত হইতে দিলে তাহাতে ১৫।১৬টা পর্য্যন্ত ফেঁকড়া বাহির হয়। আশা করি, এই দৃশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন, এবং ইহাও দেখিয়া থাকিবেন যে, ধানের একটি ভাল ফেঁকড়াতে যে শীষ বাহির হয় তাহাতে দুই শত সংখ্যক ধান হইয়া থাকে। যদি গড়ে এক শত করিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে একটি বীজ ধান্য হইতে ১৫।১৬ শত ধান হয় অর্থাৎ বীজের ১৫।১৬ শত গুণ ধান হইবার কথা। আমরা সাধারণতঃ বিঘা প্রতি পনর সের করিয়া ধানের বীজ বপন করিয়া থাকি। ইহার ১৫।১৬ শত গুণ মানে প্রায় ছয় শত মণ ধান্য। কিন্তু তাহা যে হয় না ইহার কারণ মধ্যম অধম পরিপক্ক বীজ সকলটা অঙ্কুরিতই হয় না। যাহা হয় তাহাও অধিক রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রব সহিতে না পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায় এবং ইহার পরেও যাহা থাকে, তাহাও ভাল বীজের গাছের আওতায় পড়িয়া আপনা হইতেই ক্রমে ধ্বংস হইতে থাকে। তাহা ছাড়া উত্তম পরিপক্ক বীজের গাছগুলি মাটির সারাংশ বলপূর্ব্বক টানিয়া লওয়ায় দুর্ব্বল গাছগুলির যে খাদ্যাভাব ঘটে তাহাও তাহাদের ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া থাকে। এক কথায় বলিতে গেলে উত্তম পারপক্ক পুষ্ট ও শক্তিশালী বীজের গাছগুলিই শেষকাল পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিয়া ফল প্রসব করিয়া থাকে। সবরকম শস্যাদির সম্বন্ধেই ইহা সত্য। একটা ভাল সরিষার গাছে পাঁচ শতেরও অধিক সংখ্যক সরিষা হইয়া থাকে। কিন্তু ফসল তোলার পর আমরা বপন করা বীজের ১৫।১৬ গুণের বেশী সরিষা কদাচ পাই না।

উপরের লিখিত অবস্থা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ধান ও অন্যান্য শস্যাদির বীজ আমরা সাধারণতঃ যে পরিমাণ স্থানে বপন করিয়া থাকি, বীজ ভাল হইলে তদপেক্ষা অনেক অধিক স্থান

লাগিবে ; এবং এইরূপে প্রত্যেকটি গাছ প্রথম হইতেই উপযুক্ত স্থান পাইয়া অধিকতর পুষ্ট, শক্তিশালী এবং অধিক বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিবে। ইহার ফলে দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফলন বৃদ্ধি হওয়া একটুও বিচিত্র হইবে না। দেশের কৃষকদের মধ্যে কাহারও কাহারও অভ্যাস আছে যে, তাহারা ধানের ফলন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে সুপক্ক ধান কাটিয়া আনিবার পর ইহার ভাল ছড়া এক-একটি করিয়া হাতে বাছিয়া ও হাতে মাড়াইয়া বীজের জন্য রাখিয়া দেয় ও তাহা যথাসময়ে ক্ষেত্রে বপন করে। ইহাতে যে কেবল ধানের ফলন বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, পরন্তু নিখুঁত নির্দ্দোষ ধান হইয়া থাকে, অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ সকল অবস্থা দ্বারা ধান ও অন্যান্য শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য বীজের উন্নতি করিয়া লইবার আবশ্যকতা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা কি করিয়া হইতে পারে সে কথাই এখন বলা যাইতেছে।

বীজের উন্নতি করিবার উপায়ঃ—বীজের উন্নতি করিবার কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বংশপরম্পরায় অযত্নে সংগৃহীত বীজ দ্বারা শস্য উৎপন্ন হইতে থাকার ফলে ইহা অত্যন্ত বৈজিক শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারই উন্নতি করিয়া লইতেও তদনুরূপ দীর্ঘ সময়ের দরকার হইবে। কাজেই খুব ধৈর্য্য-সহকারে সে কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ভাল বীজ উৎপন্ন করা অভিপ্রায় হইলে ইহার জন্য পৃথক্ ক্ষেত্র প্রস্তুত করা দরকার এবং সেই জমিও যতদূর সম্ভব ভাল হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়সমূহে সার ও কর্ষণ সম্বন্ধে যত কথা বলা হইয়াছে তাহা পূর্ণমাত্রায় পালন করিয়া দেশের ভাল বীজ যাহা পাওয়া যায় তাহা বপন করিতে হইবে। কারণ অল্প কর্ষিত জমির শস্যাদির গাছের শিকড় স্বভাব-নিয়মেই অধিক বিস্তার লাভ করিতে পারে না। কাজেই শরীর গঠনের আবশ্যক উপাদান পূর্ণ মাত্রায় আহরণ করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। ইহার ফলে গাছ

দুর্ব্বল হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অপুষ্ট ফল প্রসব করিবার এক প্রধান কারণ হয়—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অধিকন্তু সে-সব জমির শস্যাদি পাকিবার বেলায় কম কর্ষিত বলিয়া সহজেই রসবিহীন হইয়া পড়ে, যাহার দরুন উচিত সময়ের পূর্ব্বেই ফসল পাকিয়া যায়। ভাল বীজোৎপন্ন জমির শস্যাদিতেও এই অকালপক্কতা দোষ ঘটিলে তাহা বীজের পক্ষে যে শক্তিহীন হইবে তাহা খুব স্বাভাবিক। সে-জন্য বীজের জন্য পৃথক ক্ষেত্র করা ও সব রকম যত্ন লওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে যে শস্যাদি উৎপন্ন হইবে, তাহা খুব সুপক্ক হইলে বেশ তাজা অবস্থায় উঠাইয়া বা কাটিয়া আনিয়া তখন তখনই মাড়াইয়া শুকাইয়া ভালরূপ ঝাড়িয়া যত্নের সহিত রাখিতে হইবে। শস্যাদি মাড়াইবার পর রৌদ্রে না দিয়া ধূলিবালি ইত্যাদি আবর্জ্জনাসহ কিছু সময় রাখিয়া দিলে কোন কোন জাতীয় শস্যের অঙ্কুরোদগম হইয়া পড়ে অথবা বিবর্ণ হইয়া উঠে ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এসব দৃষ্টান্তে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, বীজের শস্য মাড়াইবার পর তখন তখনই না শুকাইলে অঙ্কুরোদগম শক্তি অনেকটাই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এই সব কারণে বুদ্ধিমান কৃষকমাত্রেই বীজের ধান জমিতে থাকিতেই খুব শুকাইয়া, পরে কাটিয়া আনিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাড়াইয়া ও শুকাইয়া লইয়া থাকে।

যে-সকল শস্য গরু দ্বারা মাড়াইয়া বাহির করিবার রীতি আছে, তাহার অনেক অংশ গো-ক্ষুরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। ইহাতে অনেক শস্য যে বীজের পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ইহা বুঝিতে পারা বেশী কঠিন নহে। সুতরাং বীজের শস্যাদি গরু দ্বারা না মাড়ানোই সঙ্গত। এই প্রকার সযত্নে উৎপাদিত বীজ হইতে পরের মরসুমে যে বীজ উৎপন্ন হইবে তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল হইবে। এইভাবে ক্রমাগত আট-নয় পুরুষ চালাইলে ইহারা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিকৃষ্ট বীজের ভাগ

অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই প্রকার বীজ দেখিতে মনোরম এবং ওজনে বাজারের সাধারণ শস্য অপেক্ষা ভারী। অজ্ঞাত কোন স্থান হইতে বীজ ক্রয়কালে এই সব লক্ষণ দেখিয়াই সাধারণতঃ বীজের মূল্য অবধারণ করিতে হয়। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধানের সিঠায়ও গাছ হয়, এবং গাছেও ধানের শীষ বাহির হয়, কিন্তু তাহাতে চাউলের সত্ত্বামাত্রও থাকে না।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি কৃষিতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় হ্যালেট নামে জনৈক কৃষিবিদ্ ইংরেজ পণ্ডিতের কথা পাঠ করিয়াছিলাম। তিনি বীজের উন্নতির জন্য সারাজীবন খাটিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, উপরের লিখিত নিয়মে ক্রমাগত আট-নয় পুরুষ পর্য্যন্ত অতিশয় যত্নের সহিত বীজ করিলে যে বীজ হয় তাহা বাজারের সাধারণ বীজের সহিত এক ক্ষেত্রে একই নিয়মে পৃথক্ ভাবে বপন করিলে ফসলের দ্বিগুণ পার্থক্য হয়। এইরূপ পার্থক্য পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করায় ইহার পর হইতে সে-সব দেশের কৃষক সমাজের মধ্যে 'হ্যালেট পদ্ধতির বীজ' এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে-সব দেশের কৃষিবিদ্ পণ্ডিতগণের পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার ফল অহরহ প্রদর্শিত হওয়ায় এখন সাধারণ কৃষকেরাও আর যাহা-তাহা হইতে বীজ কিনিতে চায় না। সেজন্য ঐ সব দেশে বীজ উৎপাদন ও স্থানে স্থানে সরবরাহ করিবার জন্য বড় বড় ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা এখন অনেকেরই জানা কথা।

বীজ সম্বন্ধে সাবধানতাঃ—বীজের জন্য কীটদষ্ট জমির শস্য রাখা উচিত নহে। কারণ তাহাতে কীটাণু থাকিয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ফসলে কীটের আবির্ভাবের কারণ ঘটে।

বীজ অত্যুষ্ণ বা অতি শীতল ও অপবিত্র স্থানে রাখা উচিত নহে। টিনের ঘরে বীজ ভাল থাকে না। পাকা দালান কোঠায় বীজ রাখিলে তাহাতে ঘন ঘন রোদ লাগানো উচিত। যেখানেই বীজ

রক্ষিত হউক না কেন, ইহা দুই-তিন মাস অন্তর এক বার রৌদ্রে দিয়া শুকাইয়া লওয়া উচিত। সকল প্রকার বীজই বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে রৌদ্রে দিয়া গরম করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ করিলে সবগুলি বীজই শীঘ্র একসঙ্গে অঙ্কুরিত হয়। রৌদ্রে না দিয়া বীজ বপন করিলে সেরূপ শীঘ্র ও সমান ভাবে প্রায়ই অঙ্কুরিত হয় না। রৌদ্রে দিয়া বীজ বপন করিলে চারাগুলি অতিরিক্ত রৌদ্র বৃষ্টি ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রব অধিক সহিতে পারে। শিশি বোতলে বীজ রাখিলে অঙ্কুর উপাদান শক্তি অনেকটা নষ্ট হইয়া যায়। বীজ রাখার পক্ষে মৃন্ময় পাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। তাহাতে বীজ রাখিয়া শরা দিয়া মুখ ঢাকিয়া জোড় স্থানে কাদা বা কাঁচা গোময়ের প্রলেপ দিয়া শুকাইয়া লইলেই বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল থাকে।

সকল প্রকার শস্য, ফলফুল এবং শাকসবজীর বীজ-সংগ্রহ-পদ্ধতি এক প্রকার নহে। কাজেই ইহাদের সকল কথা এক স্থানে লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে না। তাহা বিভিন্ন প্রকার ফল ফুল ও শস্যাদির আবাদ-প্রণালী লিখিবার কালে আবশ্যকমত স্থানে স্থানে বলা যাইবে।

বিভিন্ন বীজের প্রকৃতিঃ—কোন কোন ফল ও তবকারীর মধ্যে এমন কতকগুলি আছে, যাহাদের একটার মধ্যে অনেকগুলি বীজ রহিয়াছে—যথা লাউ, বেগুন, কাঁঠাল, পেয়ারা, দাড়িম্ব ইত্যাদি। ঐ সকলের মধ্য স্থানের পুষ্ট বীজগুলিই বপন করিতে হইবে। আমরা বহু বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে ঐ সকলের উর্দ্ধ বা অধঃ ভাগের বীজের গাছের ফল মাতৃবৃক্ষের ফল হইতে ছোট হয়, আকারও বদলাইয়া যায়। ডিম্বাকার বা দীর্ঘাকৃতি ফলের উর্দ্ধভাগের বীজবপন করিলে ফল লম্বা ও আকারে ছোট হয় এবং অধোভাগের বীজের গাছের ফল ডিম্বাকৃতি ও ছোট হয়। ঐ সকল নিষিদ্ধ বীজের গাছের ফলের মধ্যে বীজের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া

থাকে। পেঁপের উর্দ্ধার্দ্ধ ভাগের বীজের গাছই অফলা হইয়া থাকে; ইহা আমাদের বহু বারের পরীক্ষিত। যে-সকল উৎকৃষ্ট ফলন্ত গাছ বহু দিন বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যবয়সের গাছের ফলই বীজের পক্ষে ভাল।

বীজ স্থানান্তরিত করণঃ—ইহা অতিশয় বিবেচ্য ও গুরুতর বিষয়। একই ফল যাহা সকল দেশেই হইয়া থাকে, সে-সবেরও বীজ বা চারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া বপন ও রোপণ করিলে ইহার ফল কি হইবে তাহা একাধিক বার পরীক্ষা না করিয়া বলা দুঃসাধ্য। অধিক দূর দেশের কথা বলিতেছি না। ভারতবর্ষেরই এক প্রদেশের ফল বা শস্যাদির বীজ লইয়া অপর প্রদেশে ফলাইতে গেলে তাহা নানা রূপেই নিরাশার কারণ হইয়া থাকে। অন্য প্রদেশ হইতে আনীত খেসারি, মসূরী, সোনামুগ ইত্যাদি কয়েকটি শস্যের বীজের ফলন আমরা কয়েক বার লক্ষ্য করিয়াছি। পাটনা অঞ্চল হইতে আনীত ঐ সব দাইলের বীজ এদেশে বপন করিলে ইহার গাছ খুব সতেজ হয়। কিন্তু রবিশস্যের দেশী বীজ বপন করিলে ফলন যাহা হইয়া থাকে তাহার তুলনায় সে-সব বীজের গাছের ফলন নগণ্য হয়। তবে সে-সকল বীজের দ্বারা এ দেশে যে বীজ উৎপন্ন করা যায় তাহা বপন করিলে ফলন ভালই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে বাজারে কেনা উৎকৃষ্ট আমেরিকান টমেটোর (বিলাতীবেগুনের) বীজের গাছে যেরূপ ভাল ফল পাওয়া যায়, সেই টমেটোর বীজের গাছে তদনুরূপ ফল প্রায়ই পাওয়া যায় না। আসল কথা এই যে দূরদেশাগত ভিন্ন জলবায়ু ও মাটিতে উৎপন্ন গাছের বীজ আপনাপন মাটি ও জলবায়ুতে পুরুষানুক্রমে ফলাইয়া দেখা প্রয়োজন। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া বিদেশ-জাত প্রত্যেক জাতীয় বীজই পরীক্ষা করিয়া বপন করা ভাল।

অষ্টম অধ্যায়

জলসেচন ও নিরানি

গাছপালার জীবনরক্ষার জন্য মাটিতে যতটা রস থাকা দরকার, তাহার অভাব হইতে থাকিলে ক্রমে তাহাদের বর্দ্ধনশীলতার হ্রাস হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই কারণে অত্যধিক শুষ্কতার সময় ও অবস্থানুসারে গাছপালার গোড়ায় ও ফসলের জমিতে সময় সময় জলসেচন করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। তাহা বলিয়া যখন ইচ্ছা বা যত ইচ্ছা জল দিতে পারা যায় না। কারণ অনবরত ও প্রয়োজনের অধিক জল সেচন করিতে থাকিলে গাছের গোড়ায় জল আটকাইয়া শিকড় পচিয়া গিয়া মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। আবার সেই অবস্থা এড়াইবার জন্য ক্রমাগত কয়েক দিন জল সেচন করিয়া বন্ধ করিতে গেলেও জল দেওয়া স্থানের উপরিভাগের মাটি শক্ত চাপ বাঁধিয়া গিয়া তাহাদের জীবন সংশয় করিয়া তুলে এবং ইহাই কোন-কোনটার জীবন-নাশের প্রধান কারণ হয়। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, জলসেচন করিয়া গাছপালা বা ফসলের উন্নতি করিতে হইলে জমির মাটির রস ও তাপের সামঞ্জস্য রক্ষার বিহিত উপায় করাই প্রধান কাজ। ইহার জন্য জল সেচনের দ্বারা মাটিতে আবশ্যক রসের সঞ্চার হইয়াছে বুঝিলেই জল সেচন বন্ধ করতঃ যখনই মাটিতে যো হইয়াছে দেখা যাইবে তখনই কোন উপযোগী অস্ত্রের দ্বারা মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই কাজে অবস্থানুসারে খুরপি, ছোট বা কাটা কোদাল (Frong) বা উভয়ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। গাছের প্রকৃতি ও জমির অবস্থানুসারে একদিন অথবা ক্রমাগত কয়েক দিন এক

বেলা অথবা দুই বেলাই জল সেচন করিয়া মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কাজ করিতে হইবে।

প্রয়োজনমত জল সেচনের পর যথাসময়ে মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া না দিলে যে গাছপালা অত্যন্ত ঝিমাইয়া পড়ে, ইহার কারণ জল সেচনের দ্বারা মাটিতে চাপ বাঁধিয়া গেলে মাটির ফাঁক বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া কৈশিকাকর্ষণের ক্রিয়া অচল হইয়া যায়। এই অবস্থায় গাছের শিকড় বায়ু ও রস এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হয় এবং তাহার ফলে গাছপালার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। কর্ষণের উপযোগিতা বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, কৈশিকাকর্ষণ-শক্তির মন্দ গতি নিবারণের জন্যই গাছপালার গোড়ার মাটি সময় সময় খুঁড়িয়া দেওয়ার প্রয়োজন হয়, সে-সব কথা এই স্থলে খুবই স্মরণীয়।

গাছপালা যত কচি বয়সের এবং কোমলস্বভাব হইবে, তাহাদের গোড়ায় জল সেচন করা সম্বন্ধে এই নিয়ম ঘন ঘন পালন করাই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবার এক প্রধান উপায়। অর্থাৎ যত বারই জল সেচন করা হয়, তত বারই জল সেচনের পর গোড়ার মাটিতে যো হইয়াছে দেখিলে তখনই মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। জল সেচন ও নিরানির কাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই কারণেই এতদুভয়ের আলোচনা একত্রে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।

গাছপালার প্রকৃতিভেদে তাহাদের জন্য জলসেচনের প্রণালীও কতকটা স্বতন্ত্র রকমের করিতে বাধ্য হইতে হয়। যেমন, ধান-জমিতে জল সেচন ও অন্যান্য গাছপালা এবং শাকসবজীর জমিতে জল সেচনের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

ধানের জমিতে জলসেচনঃ—ধান-জমিতে জল দেওয়া আবশ্যক হইলে আস্ত জমিখানাই ভাসাইয়া জল দেওয়া ও জল আটকাইয়া রাখা এবং প্রয়োজন সমাপনের পর জল নিষ্কাশিত করিয়া দেওয়াই রীতি। ধানের গাছের উন্নতি করিবার

ইহাই প্রধান উপায়। জল সেচনের অভাব বশতঃ কিম্বা অন্য কোন কারণে জমি শুকাইয়া গেলে মাটি সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হইয়া উঠে ও ধানের চারার বর্দ্ধনশক্তি কমিয়া যায়। সেরূপ হইলে পুনরায় প্রচুরমাত্রায় জল সেচন করিয়া জল আটকাইয়া রাখাই ইহার প্রতিকারের প্রধান উপায়। তাহা করিতে গেলে স্বভাব-নিয়মেই মাটি পুনরায় নরম হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারারও বিশেষ উন্নতি হইয়া থাকে।

রবিশস্যের জমি ঃ—সরিষা, নানারকম দাইল ইত্যাদি এমন কতকগুলি রবিশস্য আছে, যাহাদের জমিতে কোন কালেই নিরানি দিতে পারা যায় না ও নিরানি দিবার উপায়ও নাই। সেজন্য ঐ সব জমিতে জল সেচন করিতে গেলে, জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অবনতি হওয়া অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কাজেই সে-সব ফসলের জমিতে জল দিতে পারা যায় না। এই সকল ফসলের জমি ভালরূপ কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করাই ফসলের জীবন রক্ষা ও তাহার উন্নতি করিবার প্রধান উপায়। কারণ উত্তমরূপ কর্ষিত জমিতে কৈশিকাকর্ষণ-শক্তির প্রবাহ জোরে চলিতে থাকে বলিয়া জমির সরসতা বরাবর একরূপ থাকিতে পারে।

নবম অধ্যায়

বাস্তু-কৃষি

ফলফুল শাকসবজী ইত্যাদি যাহা কিছু বসতবাড়ীতে উৎপাদন করা হয়, তাহাই বাস্তু-কৃষি নামে অভিহিত। ধান, ইক্ষু, তামাক ও ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং পাট বাস্তু-কৃষির পর্য্যায়ভুক্ত নহে, কারণ এসকল মাঠের জমিতে উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। ইহা কৃষক-সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ী বিশেষের একচেটিয়া অধিকারে। কিন্তু অল্পবিস্তর প্রায় সকল শ্রেণীর লোককেই বাস্তু-কৃষি করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উৎকর্ষও সাধিত হয়। সেজন্য ইহাকে শিক্ষা ও সভ্যতার এক প্রধান অঙ্গ বা লক্ষণ বলিয়া আমরা অনায়াসেই ধরিয়া লইতে পারি। আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আজকাল ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, প্রভৃতি জড় ও জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়সমূহের পুঁথিগত জ্ঞান বিদ্যার্থীদিগকে মাতৃভাষায় শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু সেই শিক্ষাকে সজীব ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে রহস্যময়ী প্রকৃতি-দেবীর বিজ্ঞানাগারে নিরন্তর যে-সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। সেই জ্ঞান নিছক পুথিগত না হইয়া জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিবার উপায়স্বরূপ বিদ্যালয়সমূহে হাতে-কলমে কৃষিকার্য্যের চর্চ্চার পথ সুগম করিতে পারিলে বিজ্ঞানচর্চ্চাও সরস ও মার্জ্জিত হইবে, জড় ও জীববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বসাধারণও উপকৃত হইবে। আমার মতে বিদ্যালয়সমূহে বাস্তু-কৃষির প্রবর্ত্তন দ্বারাই ইহা সম্ভব। কারণ জড় ও জীববিজ্ঞানের বহু মুল তথ্য বাস্তু-কৃষি-কার্য্যেরই অঙ্গ, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, ফলফুল

শাকসবজী ইত্যাদি বসতবাড়ীর যথোপযুক্ত স্থানে জন্মাইয়া তদ্দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া লইতে পারিলে যে বিশেষ আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহা সুশিক্ষা ও সুরুচির পরিচায়ক। পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা আমরা একাধারে নিম্নলিখিত উপকারগুলি অতি সহজেই লাভ করিতে পারি ও করিয়া থাকি। যথা :— (১) আর্থিক লাভ, (২) কৃষিশিক্ষা, (৩) ঘরবাড়ীর পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও ইহার আনুষঙ্গিক স্বাস্থ্য লাভ, (৪) চরিত্র গঠনে সহায়তা, (৫) আনন্দ লাভ। এসব কি করিয়া হইতে পারে তাহাই এখন বলা যাইতেছে।

আর্থিক লাভ :— বসত বাড়ীতে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় ফলফুল শাকসবজী রীতিমত উৎপাদন করিতে পারিলে তদ্দ্বারা ঐ সব জিনিষের বাবদে ব্যয় আমাদের কতকটা বা সম্পূর্ণই বাঁচিয়া যায়। কাজেই ইহা একটা আয়ের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। পরন্তু সর্ব্বদা তাজা শাকসবজী ও ফলমূল ইচ্ছামত খাইতে পারা যায় এবং ইহাতে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় ইহাকেও একটা লাভই বলিতে হইবে। শাকসবজী বিক্রেতারা অনেক সময়ই অযোগ্য নানা প্রকার সার দিয়া শাকসবজী ফলাইয়া যাহা বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে, তাহা অনেক সময়েই স্বাদগ্রহণের ও খাইবার অযোগ্য মনে হয়। গৃহজাত দ্রব্যাদির সহিত এ সবগুলের তুলনাই হইতে পারে না। অবশ্য ইহার সাফল্য অনেকটাই গৃহস্বামীর উদ্যম ও অভিজ্ঞতা এবং স্থানের বিস্তৃতি অর্থাৎ সচ্ছলতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

আমাদের হাটে বাজারে যত সব ফলমূল শাকসবজী বেচাকেনা হয়, তাহার অধিকাংশই কৃষকেরা নিত্য নিত্য বসতবাড়ীতেই ফলায় এবং তাহারাও ইহাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকে। স্থান বিশেষে এই উপায়ে অর্থাৎ বসত-বাড়ীর উপরে আম কাঁঠাল নারিকেল ইত্যাদি উৎপাদন করা

একরূপ বাধ্যতামূলক নিয়মের মত হইয়া দাঁড়ায়। এ সকল উৎপাদন করা তাহাদের জীবিকা উপার্জ্জনের এক প্রধান অঙ্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। পক্ষান্তরে ভোগ্য ও ভোজ্য সমূহের মধ্যে এমন অনেকই আছে, যাহা এভাবে উৎপাদন না করিলে গরীবের পক্ষে পাইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সেজন্য তাহারা ইহার নানা উপায় বাল্যকাল হইতেই মনে-প্রাণে শিখিতে বাধ্য হয়।

কৃষি-শিক্ষাঃ—বসতবাড়ীর উপর ফল ফুল, শাকসবজী ইত্যাদি যেখানে যাহা উৎপাদন করা সম্ভব তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইহার সাফল্যের জন্য মাটির পরিচয়, বিভিন্ন জাতীয় সারের বিশেষ বিশেষ গুণ, কর্ষণ ও বিভিন্ন জাতীয় গাছপালার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যত কথা বলা হইয়াছে সে-সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আগ্রহ প্রয়োজনের খাতিরে এক শ্রেণীর লোকের আপনা হইতেই বাড়িয়া থাকে ও প্রত্যেক কাজই বার বার করিয়া শিখিতে বাধ্য হইতে হয় এবং তাহা হইতে চরিতার্থতা লাভের পথ ক্রমে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই উত্তরকালে কাহারও কাহারও বিস্তৃত আকারে কৃষি ও উদ্যান-রচনা কার্য্যে লিপ্ত হইবার প্রধান হেতু হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাকে নিঃসঙ্কোচেই কৃষি-শিক্ষার প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে।

ঘরবাড়ীর পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যলাভঃ—এ বিষয়ে আমি স্বয়ংই ভুক্তভোগী হইয়া যতটা শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি তাহাই এখানে বলিব। বসতবাড়ীর উপর গাছপালা অধিক ঘন রোপিত হইলে তদ্দ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ, আলোক ও বায়ু চলাচলের পথ রুদ্ধ হইয়া বাড়ীর লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া থাকে ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। যাঁহারা এইভাবে বসত-

বাড়ীর উপর অত্যধিক ঘন গাছপালা রোপণ করিয়া মানুষের স্বাস্থ্যহানির জাজ্জ্বল্যমান কারণ ঘটাইতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারা তদ্দ্বারা একাধারে তাঁহাদের অর্থাৎ মানুষের স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদ-প্রকৃতিবিষয়ক জ্ঞানের অভাবেরই সম্যক্ পরিচয় দিয়া থাকেন। কারণ জানা উচিত যে, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন বাসস্থানে উত্তাপ, আলোক ও বায়ু চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন, ফলফুলের গাছ ও শাকসব্জীর উন্নতির জন্য রোদ বাতাসের প্রয়োজন তুল্য রূপই। ঘন ঘন গাছপালা রোপণ করা হেতু বাড়ী অত্যন্ত ছায়াযুক্ত হইয়া পড়িলে গাছের পাতা পড়িয়া জল চলাচলের নালা-নর্দ্দমা বন্ধ হইয়া যায় এবং লতাপাতা পচিতে থাকিয়া আস্ত বাড়ীখানাই ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে হইয়া উঠে। ইহা যেমন মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল, তেমনি তদ্দ্বারা গাছপালারও স্বাস্থ্যহানি তুল্যরূপেই ঘটিয়া থাকে। যাহার দরুন তাহারা উচিত মত ফল, ফুল প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহস্বামীর গভীর মনস্তাপের কারণ ঘটাইয়া থাকে।*

এই স্থানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই নৈরাশ্যের কারণ দূর করিয়া আশানুরূপ ফল পাইতে হইলে, গাছপালা ও সবজী বাগ এবং বাড়ীর লোকের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকিতে পারে এই উভয় বিষয়ই বিবেচনা করিয়া যেখানে যাহা খাটে, তাহা রোপণ করা দরকার। তাহা করিতে গেলে বাড়ী ও বাগ-বাগিচার জল চলাচলের নালা, নর্দ্দমা এবং বাগ-বাগিচা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আসিয়া থাকে এবং

* গাছপালা ঘন রোপিত হইলে তাহা হইতে রোদ, বাতাস ও আলোর অভাব ও অনবরত গাছের পাতা পড়িয়া ও পচিয়া এবং জল চলাচলের নালা, নর্দ্দমা বন্ধ হইয়া কি করিয়া এই প্রকার নৈরাশ্যের কারণ ঘটাইয়া থাকে, তাহা মৎপ্রণীত "আয়কর ফলের চাষ" নামক পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

একাধারে উভয় ফলই পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গিয়া থাকে, যাহাকে মনুষ্য জীবনের সরসতা রক্ষার এক প্রধান উপায় বলিলে একটুও অত্যুক্তি হইবে না। বাস্তু-কৃষি যথানিয়মে করিতে গেলে সে-সবের কল্যাণার্থে প্রায় প্রতি দিনই একটু-আধটু শারীরিক পরিশ্রম করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে, যাহা মানুষের স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার অন্যতম বিজ্ঞানসম্মত উপায়।

চরিত্রগঠনে সহায়তাঃ—সারা জীবন এ সব কাজের অনুশীলন করিতে থাকার ফলে অনায়াসেই বলিতে পারিতেছি যে, যাঁহারা ফলফুল ও শাকসব্জী ফলাইয়া গৃহপ্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে ভালবাসেন তাঁহাদিগকে সে-সবের উন্নতি-চিন্তায় ও সৌন্দর্য্যে এতই আকৃষ্ট করিয়া রাখে যে, তাঁহাদের পক্ষে অনেক সময়ই তরুগুল্মরাশির সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে গিয়া নিজের দুঃখ কষ্টের ব্যাপার বিস্মৃত হইয়াই থাকিতে হয়। কাজেই অসঙ্গত রকমের কোন প্রকার ভোগ সুখের চিন্তা করিবার অবসর কম থাকে। সুতরাং ইহাকে চরিত্র-গঠনের একটা মস্ত বড় উপায় বলিতে পারা যায়।

আনন্দ লাভঃ—ফল পুষ্পে সুশোভিত গাছপালা চোখে পড়িলে কাহার না মনে বিশ্বস্রষ্টার মহিমা স্মরণ করাইয়া দিয়া আনন্দরসের উৎস খুলিয়া দেয়.? উপরন্তু মনের পবিত্রতা রক্ষার আনন্দ নিশ্চয়ই আছে—যাহাকে মনুষ্যজীবনের চরমোৎকর্ষ অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। এই দুইটির একাধারে মিলন হইলে যে দীন-দরিদ্রের মনকেও সর্ব্বদা অপার আনন্দরসে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

দশম অধ্যায়

ধানের চাষ

আসাম ও বাঙ্গালার কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ধানের চাষই প্রধান। প্রধান বলি এই জন্য যে, উভয় প্রদেশের অধিবাসীর পক্ষে ভাত না খাইয়া জীবন রক্ষা করা কঠিন। এতদঞ্চলে অন্ন বলিলে প্রধান ভাবে ধান চাউলকেই বুঝায়। সুতরাং আমাদের পক্ষে ধান্যের উৎপাদন-হার বাড়াইবার বিষয় চিন্তা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধান্যের উৎপাদন-হার দিন দিন কমিয়া যাইতেছে দেখিয়াও কেহ ইহার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন না। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে যে জমিতে ২০০ শত মণ ধান হইত সেই জমিতে এখন সুবৎসরেও কিঞ্চিদধিক ১০০ শত মণের বেশী হয় না, এইরূপ অভিযোগ প্রায় সর্ব্বত্রই শোনা যায়। তদুপরি মাঝে মাঝে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন ও কীটের উপদ্রবে কৃষকের বিপদের কারণ দিন দিনই বাড়াইয়া তুলিতেছে। এ সকলের প্রতিকারকল্পে আসামের কৃষি-বিভাগ বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ কলের সাহায্যে জল তুলিয়া আমন জমিতে বুরো ধান ফলাইবার উপায় করিয়া কোন কোন স্থানের অধিবাসীর বাঁচিবার উপায় করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা জানি এই সকল উপায় যে-যে স্থানে অবলম্বিত হইয়াছে, সে-সব স্থানের লোকের কতকটা উপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু সারা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় এ প্রচেষ্টাও নগণ্য ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পক্ষান্তরে স্থান বিশেষের লোকের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিতে গিয়া সারা দেশের লোকের বিপদের কথা ভুলিলে যে চলিতে পারে না, একথাও ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন আছে।

যাহারা কলের সাহায্যে জল তুলিয়া আমন জমিতে বুরো ধান ফলাইবার জন্য বাঁধ বাঁধা, খাল কাটা ও ইহার জন্য কৃষি-বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করাই কৃষকের অভাব মোচনের প্রধান উপায় বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে ধান্যের উৎপন্নের হার কমিয়া যাওয়ার যে ক্ষতি, তাহা জলপ্লাবন ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রবজনিত ক্ষতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। নৈসর্গিক উপদ্রব যে-যে স্থানে যে বৎসর হয় সে বৎসর সেই সকল স্থানে তজ্জনিত ক্ষতি সহ্য করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু ধানের উৎপন্নের হার কমিয়া যাওয়ার যে ক্ষতি, তাহা প্রতি সুবৎসরেও সারা দেশের অধিবাসীকেই ভোগ করিতে হয়। ইহার অনেকটাই কৃষকের অনভিজ্ঞতা বা অবৈধ কর্ম্মের ফল বলিতে হইবে। যে-সকল স্থানে ঘন ঘন জলপ্লাবনে ফসল নষ্ট হয় তথায় টানের জমিতে কলে জল তুলিয়া বুরো ধান ফলাইবার চেষ্টা করা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যে-সব স্থানে জলপ্লাবন হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই, তথায় এবং অন্যান্য স্থানেও প্রতি সুবৎসরেও লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির উৎপন্নের হার কেন কমিতে দেওয়া হইবে অথবা সেরূপ হইতেছে দেখিয়াও ইহার প্রতিকারের উপায় করিতে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে, ইহার অনুকূলে কি ভাল যুক্তি আছে বুঝিতে পারা যায় না। পক্ষান্তরে, ইহার ভবিষ্যৎ ভাবিতে গেলেও ভীত হইতে হয়। কারণ আমরা দেখিতেছি ধানের ফসল যতই কমিয়া যাইতেছে ততই আমাদের হাট-বাজারে বিদেশী চাউলের আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি অগ্রহায়ণ মাসে যে সময়ে সকলের ঘরেই অল্পবিস্তর ধান চাউল সঞ্চিত হইবার কথা, সেই সময়ে দূরদেশজাত চাউলের আমদানী অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে।

বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুন রেঙ্গুন চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়াছে। ইহাতে চাউল সর্ব্বত্রই দুর্ম্মূল্য ও স্থানে স্থানে অপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য

হইতেছে। ইহার দ্বারা কি আমাদের দেশে ধানচাষের অবনতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না? এইরূপ বলিবার কারণ এই যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের লোক রেঙ্গুন চাউলের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল অর্থাৎ তখন পর্য্যন্ত রেঙ্গুন চাউল এদেশে আমদানী হইত না। অথচ দেশে ধান-চাউলেরও এত অভাব দৃষ্ট হইত না। পাটচাষের অত্যন্ত বাড়াবাড়িই এই দুর্গতির কারণ হইয়াছে। আমি মৎপ্রণীত 'দেশের অভাব বৃদ্ধির কারণ' ও বহু-সংখ্যক প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে পাটচাষের বাড়া-বাড়িতে দেশের গো-শক্তি হীনবল হইয়াছে, যার দরুণ জমিতে কর্ষণের অভাব থাকিয়া যাওয়া স্বাভাবিকই হইতেছে। ইহাতে পাট-সহ সকল প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যেরই উৎপন্নের হার কমিয়া গিয়াছে। বীজের অবনতিও কোন কোন ফসলের অবনতির প্রধান কারণ হইতেছে। ধানের বীজ সম্বন্ধে একথা খুবই বলিতে পারা যায়।

এখন ধানের বীজের অপকৃষ্টতার দৃষ্টান্ত যাহা প্রায় সকলেরই দেখিবার সুবিধা হইতেছে, যাহা ধানের ফলন দ্রুত গতিতে কমিবার এক প্রধান কারণ বলিয়া ভাবিতে একটুও সংশয় রাখিতে পারা যায় না, তদ্বিষয়ে দু-একটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

কথাটা আমন ধানের সম্বন্ধেই বলিতে হইবে। সে-সব ধান পাকিবার সময়ে মাঠে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তঃসার-শূন্য নানা প্রকার বিট্‌লে ধানে ও উরি নামক ধানে (স্থানে স্থানে ইহার বহু নামান্তর আছে), যাহা পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতেই ঝড়িয়া পড়িয়া যায়, সে-সবে আস্ত মাঠই ছাইয়া ফেলিয়াছে ও তাহা বৎসরের পর বৎসর দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ধান-চাষের পক্ষে ইহার মত ক্ষতির বিষয় কিছুই হইতে পারে না। কারণ যে জমিতে সে-সব বিশ্রী ধানের গাছ হয় তাহা খুব ভাল দেখাইলেও ফসল তোলার পর অনেক সময় সিকি পরিমাণ ধানও তাহাতে পাওয়া যায় না। সে সকল ধানের শীষ না হওয়া পর্য্যন্ত

কেবল গাছ দেখিয়াই ইহার পরিচয় করিতে পারা যায় না, ইহা এক জটিল সমস্যা। যাহাদের চাষবাসের কাজের সহিত সামান্য সংস্রব আছে তাহাদেরই এ সকল অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা আছে, কিন্তু তাহা কি করিয়া জন্মায় সে জ্ঞানের অভাববশতঃ ইহাকে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ভাবিয়া ক্ষতি সহ্য করিতে বাধ্য হয়। ধানের ফলন ভাল করিতে হইলে সকলের আগে বিট্‌লে ও উরি ধান দূর করিবার উপায় করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে এই প্রকার অকেজো ধান কি করিয়া জন্মায় তাহাই আগে জানা দরকার। সেইজন্য ইহার সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

এক একটা মাঠে নানাজাতীয় ও নানারূপবিশিষ্ট ধানের বীজ বপন করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের শীষ বা ফুল বাহির হইবার সময় প্রায় সবই একসঙ্গে বাহির হয়, ইহা প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন। যাঁহারা ধানের ফুল হইতে কি করিয়া ধান জন্মায় দেখিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে ও বলিতে পারিবেন যে, এক মাঠে পাশাপাশি জমিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ধানের বীজ বপন করিলে সে-সবের গাছ যখন পুষ্পিত হয় তখন একজাতীয় ধানের ফুলের পরাগরেণু বা পুংবীর্য্য বায়ুভরে বা মক্ষিকার দ্বারা চালিত হইয়া অপর জাতীয় ফুলের গর্ভকোষে সহজেই পড়িতে পারে ও পড়িয়া থাকে। তাহা হইলে ইহা যে অভিনব আর এক প্রকার ধানের সৃষ্টি করিবে তাহা বুঝিতে পারা বেশী কঠিন মনে হয় না। এই কারণেই এই অভিনব ধানকে বিট্‌লে বা সঙ্কর-জাতি নামে অভিহিত করা হয়। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণ কোন বিশেষ বিশেষ দুই শ্রেণীর ধানের একটা ফুলের পরাগরেণু অপরটার গর্ভকোষে লইয়া গিয়া অপর অভিনব ও উৎকৃষ্টতর ধানের জাতির সৃষ্টি করিতেছেন,—তাহা হয়ত অনেকেই দেখিয়া বা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু মাঠে বপন করা নানারূপবিশিষ্ট ধানের একটা ফুলের পরাগরেণু যে স্বভাবের বশে

অপরটার গর্ভকোষে যাইয়া পড়ে তাহাতে সম্বন্ধ যোজনার কোনই শৃঙ্খলা থাকিতে পারে না ; বরঞ্চ অপসম্বন্ধই অধিক ঘটে বলিয়া নানারূপ বিশ্রী ও অন্তঃসারশূন্য ধানের সৃষ্টি অধিক হইয়া থাকে। এই সকল অন্তঃসারশূন্য ধানের গাছও হয় এবং তাহাতে রীতি-মত ধানের শীষও বাহির হয়। কিন্তু এসব ধান টিপিলে দেখা যায় তাহাতে চাউলের নামগন্ধও নাই। কাজেই জমিতে সেরূপ ধানের প্রভাব বাড়িতে দিলে তাহা বিষম ক্ষতির কারণ হয়। একই জাতীয় ধান চাউলের পড়্তা বা ওজনের মধ্যে সময় সময় যে বিষম প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দ্বারা উপরের লিখিত অবস্থাই প্রমাণিত করে।

উরি ধান যাহা পাকিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়িয়া পড়িয়া যায় তাহার উৎপত্তি যে ঠিক এই ভাবেই হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহা স্বভাবজাত এক প্রকার অমর জাতীয় ধান। কৃষি-বিশেষজ্ঞদের মতে যাহা পূর্ব্ব বারে আপনা হইতেই ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা অবিকৃত থাকিয়া পর বৎসরে যথাসময়ে অঙ্কুরিত হয় ও গাছের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া থাকে। তাহা হইলে ইহার ফুলের পরাগরেণু অপর যে-কোন ধানের ফুলের গর্ভকোষে যাইয়া পড়িতে পারে। তাহা হইতে অভিনব আর এক প্রকার ধানের সৃষ্টি হইবে ও ইহারা স্বভাব-নিয়মে কতকটা সেই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট না হইয়াই পারে না। ইহার নানারূপ নিদর্শনও পাওয়া যায়। আমরা দেখিয়াছি, যে জমিতে উরি ধান বেশী হয়, সেই জমিতে উরির চেহারাবিশিষ্ট বিট্‌লের ভাগ বেশী হয় এবং উরির ফুলের পরাগরেণু হইতে অন্যান্য ধানকেও বিট্‌লে করিয়া থাকে ইহাই প্রমাণিত করে। বলিতে দুঃখ হয়, এই জ্ঞানের অভাব-বশতঃ দেশের চাষীদের কোন কালেই বুঝিবার সুবিধা হয় না যে, ধানের ফলনের হার উর্দ্ধে কত অধিক হইতে পারে। ফলে যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হয়। ধানের জমিতে

একবার উরি প্রবেশ করিলে সেই জমিতে ফলনের হার উত্তরোত্তর বেজায় কমিয়া যায়। উরি দূর করা যে খুব কঠিন ব্যাপার তাহা চাষীমাত্রেরই পুরাপুরি ধারণায় আছে এবং তাহা অতি পূর্ব্বেও ছিল। আমরা ছেলেবেলায় দেখিতাম ইহার প্রতিকার কল্পে অধিকাংশ চাষীই ভাল ফলানো-জমির ধান কাটিয়া আনয়ন করিবার পর পুষ্ট ছড়া একটি একটি করিয়া হাতে বাছিয়া ২।১ বিঘা জমির বীজ-পরিমাণ ধান পৃথক্ সঞ্চিত করিয়া রাখিত ও পর বৎসর ভাল এক বিঘা জমিতে যত্নের সহিত বপন করিত। তাহাতে যে ধান হইত তাহা স্বভাব-নিয়মে অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ ও পুষ্ট হইতে পারিত এবং পর বৎসর সেই ধান সব জমিতে বপন করা হইত। ফলে সে-সব জমির ধান অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল হইতে পারিত। ধানের বীজ সম্বন্ধে মুশকিল এই যে, একবার মাত্র বীজ বাছাই করিয়া বন্ধ করিয়া দিলে ২।৩ পুরুষ যাইতে না যাইতে আবার মাঠে নানা জাতীয় ধানের সংস্রবে গিয়া ক্রমে বিট্‌লের ভাগ বাড়িয়া থাকে। সেজন্য প্রতি বৎসরই ২।১ বিঘা জমির বীজ-পরিমাণ ধান হাতে বাছিয়া রাখা দেশময় একটা সুন্দর প্রথার মত ছিল বলিয়া ধান ভাল জন্মাইতে পারিত। দেশের অভাব-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিরই অবস্থা এই যে, তাহারা যথাসময়ে বীজ সংগ্রহ বা সঞ্চয় করিয়া রাখিতে অক্ষম। রাখিতে পারিলেও পেটের জ্বালায় তাহারা তাহা খাইয়া ফেলিতে বাধ্য হয়। সেজন্য বীজ বপনের সময় আগত হইলে বাজারে সচরাচর যে ধান বেচা-কেনা হয়, প্রায়ই তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া বপন করিতে বাধ্য হয়। সপ্তম অধ্যায়ে একপ্রকার বীজকে কুলদোষজাত অর্থাৎ বহু পুরুষ পরম্পরায় যথেচ্ছভাবে উৎপাদিত বীজ হইতে জাত বীজ বলা হইয়াছে এবং এই প্রকার বীজ বপন করিয়া যে পুরা ফসল পাওয়া আশা করা যাইতে পারে না, একথাও বলা হইয়াছে। এই প্রকার

কেনা বীজের সহিত যে উরি ও বিট্‌লের ভাগ অল্পবিস্তর আসিয়াই থাকে তাহা নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারা যায়, আর ইহাই যে ধানের উৎপন্নের হার দ্রুত গতিতে কমিয়া যাইবার প্রধান কারণ হইতেছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় রাখা যায় না।

পূরা ফসল পাইতে হইলে ভাল বীজেরই দরকার। বীজের ধান হইতে বিট্‌লে ও উরির ভাগ হাতে বাছাই করিয়া কমাইয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ঠিক ঠিক শক্তিশালী বীজ পাইতে হইলে একই বীজের ক্রমাগত ৮।৯ পুরুষ পর্য্যন্ত খুব যত্নের সহিত বংশবৃদ্ধি করা দরকার। বীজ ঠিক ঠিক শক্তিশালী হইলে ইহার গাছগুলি অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও প্লাবনের জলের ধাক্কা ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রব অধিক সহ্য করিতে পারে, ইহা আমাদের বিশেষ-ভাবে ও বহুবারের পরীক্ষিত। এই কারণবশতঃ একমাত্র জল-প্লাবনকেই কৃষকের অভাব-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া ভাবিতে পারি না। পক্ষান্তরে, একাধারে জমির কর্ষণের অভাব ও অপর দিকে বীজের দোষ—এই উভয়ই ধানের উৎপন্নের হার দিন দিন কমিয়া যাইবার প্রধান কারণ হইতেছে।

আমন ধানের বীজ সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম বলিয়া বুঝিতে হইবে না যে, কেবল আমন ধানেই বিট্‌লের সৃষ্টি হইয়া থাকে। জাতিতে অনেক হইলে এবং তাহা পাশাপাশি জমিতে বপন করিলে শাল কিম্বা আউশ কিম্বা বোরো যে-কোন ধানই হউক, তাহাতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিট্‌লের (বর্ণসঙ্করের) সৃষ্টি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। এতদ্দারা বুঝিতে হইবে যে, ঠিক ঠিক একই সময়ে ফুল হয় এরূপ বিভিন্ন জাতীয় ধান পাশাপাশি জমিতে বপন না করিবার ব্যবস্থা করিয়া সাঙ্কর্য্য নিবারণের উপায় অনায়াসে করা যাইতে পারে। কিন্তু তদ্দারা উরি দূর করা যাইতে পারে না। তাহা দূর করিতে হইলে উরিপ্রবণ জমিতে রীতিমত হালচাষ করিয়া বীজ বপনের সময় উত্তীর্ণ হইতে দেওয়াই উচিত। যখন

দেখা যাইবে যে তাহাতে উরির চারা সহ অন্যান্য কতকটা তৃণ জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে, তখন ধানের চারামাত্রই উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া হালচাষ করতঃ ধানের চারা রোপণ করাই উরি দূর করিবার প্রধান উপায়। তাহা না করিলে আগাছা থাকিয়া গিয়া ইহারাই যে সাঙ্কর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে ও করিবে তাহা বুঝিতে পারা কঠিন নহে।

এতদ্দেশে ভাল বীজ বলিয়া ধানের বীজ বেচা-কেনার কোন ব্যবসা নাই। কাজেই ভাল বীজ পাইতে হইলে প্রত্যেকেরই যত্নপূর্ব্বক বীজ উৎপাদন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ধানের বীজ কেনা অপরিহার্য্য হইলে যেখান সেখান হইতে না কিনিয়া স্থানীয় বা নিকটবর্ত্তী সরকারী কৃষিবিভাগ-পরিচালিত কৃষিক্ষেত্র হইতে কেনাই সঙ্গত। কারণ আমরা জানি তাহারা বীজ সম্বন্ধে খুইই সতর্ক এবং তাহাদের নিকটধান যাহা পাওয়া যাইবে তাহা নিজেদের বাছাই করা মূল বীজ হইতে পুরুষপরম্পরায় যত্নের সহিত জাত বলিয়া নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কর্ষণঃ—প্রথমেই বলা হইয়াছে যে পাটচাযের বাড়াবাড়িতে দেশের গোশক্তি হীনবল হইয়াছে, যাহার দরুণ সব জমিতেই অল্প বিস্তর কর্ষণের অভাব ঘটিয়াছে। ধান জমিতে ঐরূপ হইতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। সুকর্ষণ মানে এক সময়ে অনেক বার চাষ না দিয়া প্রতি মাসে দুই এক বার করিয়া চাষ দিয়া আগাছার প্রভাব নষ্ট করিয়া যথাসময়ে মই দিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। অগ্রহায়ণ মাসে ফসল তোলার পর প্রতিমাসে দুই একবার করিয়া জমিতে চাষ দিলে বীজ বপন করিবার সময় পর্য্যন্ত ৭।৮ বার চাষ পড়ে।

সারের কথাঃ—অতঃপর ধানের জমিতে সারের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার যাহা ধানের ফলন বৃদ্ধি করিবার অন্যতম প্রধান উপায়। জমি সরস হইলে এবং তাহা ভালরূপ কর্ষণ করিতে পারিলে ধানের চাষে সার ব্যবহার করিবার

কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু জমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর হইলে ভালমত কর্ষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সার ব্যবহার করা খুবই দরকার। অনুর্ব্বর জমিতে ধানের চাষে সার ব্যবহার না করা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। ধানের জমিতে সার ব্যবহার করা সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী পরীক্ষার ফল যতটা জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে ধান জমির পক্ষে খৈল সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার পর আমরা খুব নীরস জমিতে—যাহাতে বিনা সারে বিশেষ যত্নের সহিত বীজ বপন করিলেও তিন চার মণের অধিক ধান পাওয়া যায় না, এরূপ জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় খৈল ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, খুব নীরস জমিতে প্রতি বিঘায় একবার চারি মণ খৈল দিলে ক্রমাগত ৩।৪টা ফসলই গড়ে ৯।১০ মণ করিয়া পাওয়া যায়। নীরস জমিতে হাড়ের গুড়া ব্যবহার করিয়াও আমরা খুব ভাল ফল পাইয়াছি। ব্যাপব ব্যবহারের জন্য হাড়ের গুড়া প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। দুর্মূল্যতাও ইহা ব্যবহারের এক অন্তরায়।*

যে-সব জমিতে ক্রমাগত কয়েক বৎসব পাটের চাষ করা হইয়াছিল, তথায় সম্প্রতি যাহারা ধানের চাষ করিতেছিল, সেই সকল জমির ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে ধান চাষে সারের আবশ্যকতা কতদূর তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। ধানের ফসল উর্দ্ধে কত হইতে পারে তাহা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য আমরা পরীক্ষাস্বরূপ বহু বারই বিভিন্ন রকম জমিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে ধান উৎপাদন করিতে গিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, প্রতি বিঘা জমিতে দশ মণ হিসাবে ধান উৎপাদন করিতে পারা বিশেষ কঠিন কাজ নয়। এজন্য প্রধানভাবে সুকর্ষণ ও ভাল বীজ এবং অবস্থা বুঝিয়া সময় সময় কতক সার দেওয়াই দরকার।

* এ সব বিবরণ মৎপ্রণীত "দেশের অভাব বৃদ্ধির কারণ" নামক পুস্তিকায় বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া এ স্থানে লেখা গেল না।

বিঘা প্রতি দশ মণ হিসাবে ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিলাম বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে ইহাই ধানের ফলনের চরম সীমা। আমরা পরীক্ষা করিতে যাইয়া অনেক বারই প্রতি বিঘায় ১৬।১৭ মণ হিসাবে ধান পাইয়াছিলাম।* অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও হয়ত পাওয়া যাইবে আশা করি। কিন্তু বর্ত্তমানে ধানের মাঠে গেলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে গড়পড়তা চারি মণের হিসাবে হইবে কিনা তাহাই সংশয়। ইহার কারণ-স্বরূপ উরি ও বিট্‌লে ধানের প্রভাবের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহা ছাড়া স্থানে স্থানে যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, সুবৎসরেও মাঠের চারি আনা জমিতেই প্রতি বিঘায় ২।৩ মণের অধিক ধান হয় না এবং অনেক জমি একেবারে ধলি† হইয়া যায়, তখন কদাচিৎ কোন জমিতে দশ মণ ধান হইলেও গড়পড়তা চারি মণের অধিক হইবে কিনা তদ্বিষয়ে সংশয়ান্বিত না হইয়া পারা যায় না। উৎপন্ন দ্রব্যের হার এভাবে কমিতে দিলে কৃষকের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। কারণ কৃষকের কার্য্য শস্য উৎপাদন করা। তাহাতে অক্ষম হইলে তাহাকে নিষ্করভূমি যথেষ্ট পরিমাণে দিলেও সে বাঁচিতে পারিবে না, ইহা বুঝিতে পারা অধিক কঠিন নয়।

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, সুন্দরবন ও সাহাবাজপুর প্রভৃতি সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে সাধারণ যত্নেই বিঘা প্রতি ১৪।১৫ মণ করিয়া ধান হইতেছে। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি

---

* এস্থলে পাঠকের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একাধারে সুকর্ষণ, উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন ও উত্তম পরিচর্য্যা দ্বারা আমি বিঘা প্রতি ৪৩ মণ (তেতাল্লিশ মণ) হারে ধান ফলাইতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু দেশের হালের গরুর অকর্ম্মণ্যতা ও কৃষকসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে এরূপ ফলনের সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনায় বা কিছু বলিতে যাওয়ার কোন সার্থকতা আছে কিনা সন্দেহ হওয়ায় তাহা হইতে বিরত হইলাম।

† কৃষক সমাজে এই শব্দটির বহুল প্রচলন আছে। "ধলি" শব্দের অর্থ জলপ্লাবনজনিত অফলা বা অজন্মা।

আমাদের অঞ্চলেও এই রকম ধান হইত। সেজন্য প্রত্যেক বাড়ী-তেই গোলাভরা ধান মজুত থাকিত, যার দরুণ এক বৎসর অজন্মা হইলেও কৃষককে বিশেষ অভাবে পড়িতে হইত না। দেশের কৃষক কুলকে, বিশেষ করিয়া ধানচাষীকে সুপরিচালিত করিতে হইলে আবার সেই অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইহা এমন কোন কঠিন কাজ নয় যে, করিতে পারা যাইবে না। এজন্য একাধারে সুকর্ষণ, ভাল বীজ ও যথা সময়ে উপযোগী সার ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক। ইহার অভাব হেতুই কৃষকের দুরবস্থা ঘটিয়াছে বলিয়া বার বার বলা হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে সভ্য দেশবাসীমাত্রেই কৃষির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট,—কত অল্প পরিমিত স্থানে কত অধিক ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায় সেই চেষ্টায়ই তাহারা ব্যস্ত। ফলে যাহারা এক-সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য বিদেশীদের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ছিল, তাহারা এখন অনেকটা স্বাবলম্বী হইতে পারিয়াছে। আর আমাদের দেশ যাহা শস্যশ্যামলা বলিয়া চির আখ্যাত, যে দেশে জল, বায়ু ও মাটির গুণে সাধারণ যত্নেই প্রচুর শস্যাদি জন্মাইতে পারা যায়, সেই দেশের লোকই আমরা চাউলের জন্য রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশে না গেলে প্রাণেই বাঁচিতে পারি না। আমরা জানি কলিকাতা প্রভৃতি শহরের বাজারে যত চাউল কেনা-বেচা হয়, ইহার বেশীর ভাগ বোধ হয় আসিত ব্রহ্মদেশ হইতে। কলা, আনারস ইত্যাদি জাহাজবোঝাই হইয়া সিঙ্গাপুর হইতে হরদম আসিতেছিল। যেন আমাদের দেশে সে-সব ফলাইবারই স্থানাভাব! এসকল কি আমাদের কৃষির অবনতির প্রমাণ নহে? বাঁচিতে হইলে এসকলের প্রতিকারের জন্য সমগ্র দেশকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

আসাম ও বাঙ্গালা প্রদেশের কৃষিবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্ট পাঠে জানা যাইতেছে যে, উক্ত দুই প্রদেশের ধানচাষের জমির মোট পরিমাণ পৌনে তিন কোটী একর অর্থাৎ প্রায় নয় কোটী

বিঘার মত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধানের ফলন বেজায় কমিয়া গিয়াছে। বেশী না-ই হউক, যদি বিঘা প্রতি তুই মণও কমিয়া থাকে, তাহা হইলে একমাত্র ধানের চাষেই উক্ত তুই প্রদেশে ১৮ কোটী মণ ধান কমিয়া গিয়াছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই মোটামুটি হিসাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিলে আশা করি ধানচাষের উন্নতির আবশ্যকতা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

দেশময় ধানের ফলন বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশে টাকা পয়সার সচ্ছলতা কত দূর বাড়িবে বা বাড়িবে না, সে কথা আমি বড় ভাবি না। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে যে দেশের লোক শান্তিতে বাস করিতে পারিবে, এ কথা খুবই বলিতে পারা যায়। এই অবস্থা আনয়ন করিতে হইলে কৃষিবল, গোমহিষাদি ও কৃষিজাত প্রত্যেক দ্রব্যেরই বীজের উন্নতি করিয়া লওয়াও প্রধান কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে পাটের চাষকে সংযত করিয়া লওয়া বিশেষ দরকার। ইহার জন্য পাটচাষের জমির পরিমাণ কমাইয়া পাটের উৎপাদন হার বাড়াইতে পারা যে অধিক লাভজনক, তাহা দেশের চাষীদিগকে বুঝাইবার বিহিত উপায় করা প্রয়োজন। এই কাজে সরকারী কৃষি-বিভাগেরই বিশেষভাবে মনযোগী হওয়া উচিত মনে হয়। এইভাবে পাটের জমি কমাইলে একাধারে পাটের উৎপাদন হার ও ধানের জমির পরিমাণ বেজায় বাড়িয়া যাইবে। মোটকথা, পাটের জমি কমাইবার উপর এখন দেশের মঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

ধানচাষের উন্নতির উপায় দেখাইতে গিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহা কেন করিলাম? যে-দেশের শতকরা ৭০।৮০ জনই হাতে কলমে কৃষক এবং কৃষিই যে-দেশের প্রধান আয়জনক ব্যবসা, সেই দেশের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া গুরুতর কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথা ভাবিতে পারা যায় না। ইতিহাসে দেখা

যায় যে, যে-দিন ভারতের সুদিন ছিল, সে সময়ে দেশে টাকায় বিকাইত আট মণ চাউল। প্রত্যেক জিনিষই তখন এইরূপ সুলভ ছিল। এতদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, দারুণ পেটের চিন্তা দূর করিতে পারাই সকল প্রকার উন্নতি সাধনের প্রথম ও প্রধান সোপান। আবার যখন দেখি যে, একমাত্র খাদ্য-বস্তুর অভাবই কোন কোন মহাবীরের যুদ্ধপরাভবেরও প্রধান কারণ হইয়াছিল, তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, দেশরক্ষা, স্বজন রক্ষা, সমাজ রক্ষা করিয়া সুখে বাস করিতে হইলে অগ্রে দেশময় খাদ্যবস্তুর সচ্ছলতা রক্ষা করাই প্রধান কাজ। আবার যখন নিজেই অনুভব করিতে পারি যে, একবেলা না খাইলেই বেজায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ি এবং ক্রমাগত কয়েক বেলা না খাইলে প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হয়, তখন খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাহা বুঝিবার জন্য অন্যের সাহায্য লইবার কোনই প্রয়োজন হয় না এবং খাদ্যবস্তুকেই প্রাণ বলিতে ইচ্ছা করে। খাদ্যবস্তুর এ-সকল মহিমা দেখিয়াই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকর্ত্তা ঋষি তদ্‌রচিত গ্রন্থে "অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্‌ব্রতম্," অর্থাৎ বহু অন্ন অর্জ্জন করিবে ও তাহা ব্রত, বলিয়া পরে ইহাই যে মানুষের চতুর্বর্গ ফল লাভের প্রধান উপায় তাহা নানা যুক্তি সহকারে বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

'অন্ন' বলিতে, প্রকৃতিগত অবস্থানুসারে যে-দেশের লোকের শরীর রক্ষার পক্ষে যাহা উপযোগী বা প্রধান খাদ্য, তাহাই বুঝিতে হইবে মনে করি। সুতরাং আমাদের পক্ষে অগ্রে ধানচাষের উন্নতির উপায়, পশ্চাৎ রবিশস্যাদির চাষের উন্নতির উপায় দেখাই সঙ্গত। কেননা ধানই আসাম ও বাঙ্গালার অধিবাসীদের জীবন-ধারণের প্রধান সম্বল, একথা প্রথমেই বলা হইয়াছে।

তদ্‌ব্রতম্—আমি বলি যাহা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারা যায় না, সেই ধান চাষের উপায় ও উন্নতি সাধনে কর্ত্তব্য জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

রবিশস্য

রবিশস্য চাষের আবশ্যকতাঃ—হেমন্ত ও শীত-ঋতুতে যে সকল ফসল উৎপাদন করিতে হয়, তাহাই রবিশস্য বলিয়া গণ্য হয়। যথাঃ—নানা জাতীয় দাল, গম (গোধুম), যব, ভূট্টা, পেঁয়াজ, রসুন, তামাক ইত্যাদি। এ সকল সংখ্যায় অনেক। ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ স্থানের কৃষিজীবীদিগের রবিশস্যই প্রধান চাষের দ্রব্য এবং তাহা করিয়া তাহারা চিরকাল জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। কেবল তাহাই নহে, সে-সব অঞ্চলে স্বভাবজাত গো-খাদ্যের সমূহ অভাব সত্ত্বেও যে তাহাদের গরু স্বভাবতই উন্নত, রবিশস্যের চাষের বাহুল্যই ইহার প্রধান কারণ, এ কথা পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এসকল অবস্থা হইতে চাষীর পক্ষে রবিশস্যের চাষ করায় যে বিশেষ লাভ আছে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। বর্ষাকালে যে-সব স্থানে ঘন ঘন জলপ্লাবন হয়, সে-সব স্থানের চাষীদের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে রবিশস্যের চাষ করাই তাহাদের প্লাবনজনিত ক্ষতি সামলাইবার প্রধান উপায়। ধান ও পাটের চাষই আসাম ও বাঙ্গালার চাষীদের জীবিকা রক্ষার প্রধান সম্বল। জলপ্লাবনে এই দুইটি ফসল নষ্ট হইলে তাহারা সহজেই অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ে। আমরা মনে করি রবিশস্যের চাষের অল্পতা ও অভাবই ইহার প্রধান কারণ। কারণ চাষীর পক্ষে রীতিমত রবিশস্যের চাষ করা সারা বৎসরের রোজগারের অর্দ্ধেকেরও অধিক।

বিগত ১৩২২ সালে ভয়াবহ জলপ্লাবনের পর অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহোদয় বিপন্ন চাষীদের বাঁচিবার উপায় কি করা যাইতে পারে, প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিলে ইহার উত্তরে আমি

তাহাকে ঠিক উপরের লিখিত কথাগুলিই লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ইহার পর তাঁহারই প্রেরণায় আমাকে "দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায়, প্রচুর রবিশস্যের আবাদ" নাম দিয়া একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিতে গিয়া তাহাতে কতিপয় রবিশস্যের আবাদ প্রণালী লিখিতে বাধ্য হই। ঐ পুস্তিকা তাঁহার অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হইয়া আসাম কৃষি-বিভাগের মারফতে বিনা মূল্যে বিতরিত হয় এবং তদ্দ্বারা কতক ফলও হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। এই কারণে এতদঞ্চলে যাহা হইতে পারে ও স্থানে স্থানে হইতে দেখা গিয়াছে এবং আমরা যে-যে রবিশস্যের চাষ চার দশক বৎসর যাবৎ সর্ব্বদা করিয়া আসিতেছি—এইরূপ কয়টির আবাদ প্রণালী নিম্নে লেখা যাইতেছে।

সোনা মুগ ঃ—ইহা প্রায় সব রকম জমিতেই হয়। জমিতে তিন-চার বার চাষ-মৈ দিয়া বীজ বপন করিলেই কাজ বেশ চলে। আশ্বিন মাসই সোনা মুগের বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। সুবৎসর হইলে তাহা কার্ত্তিক মাসে বপন করিলেও ফলন ভালই হয়। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হইলে ফল প্রায়ই ভাল হয় না। সেজন্য আকাশের ভাবগতি বুঝিয়াই বীজ বপন করিতে হয়। দেশোৎপন্ন বীজের ফলনই ভাল হয়, এবং ফলন ভাল হইলে এক বিঘা জমিতে চারি মণ পর্য্যন্ত মুগ হইয়া থাকে। বিদেশী অর্থাৎ অন্য প্রদেশজাত বীজ বপন করিলে গাছ বেশ ভালই হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অনুপাতে ফলন তেমন কিছুই হয় না, ইহা আমরা বহু বার করিয়া নিঃসংশয় হইয়াই লিখিতে পারিতেছি। বীজ যথাসময়ে বপন করিলে পৌষের মাঝামাঝিই ফসল তোলার কার্য্য শেষ হয়। বীজ বিঘা প্রতি চার সের লাগে। দালের মধ্যে সোনা মুগ খাইতে ভাল ও নির্দ্দোষ এবং মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

মাস কলাই ঃ—ইহা প্রায় সব রকম জমিতেই হয় এবং বীজ

বপনের সময় ও প্রণালী এবং উৎপন্নের হার সোনা মুগেরই মত। বড় বড় নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের চাষীরা নদীর তীরের পলি পড়া জমিতে কাদা থাকিতে কাদার উপর বীজ ছড়াইয়া দিয়াই বপনের কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ইহাতে ফলনের হার কতক কম হইয়া থাকে। কিন্তু বিনা পরিশ্রমে হয় বলিয়া তাহাতে বিশেষ লাভই হয়। ফসল তোলার কার্য্য মাঘ মাস মধ্যেই শেষ হয়। বীজ বিঘা প্রতি পাঁচ সের লাগে।

কলাইয়ের চাষ গো-খাদ্যের অভাব নিবারণের উৎকৃষ্ট উপায়। কলাই ও কলাইয়ের কাঁচা গাছ গো-জাতির অতিশয় প্রিয় খাদ্য। উহা গো-শরীরের পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক এবং গাভীগণের দুগ্ধবর্দ্ধক। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের প্রখর রৌদ্রের সময় ব্যতীত বৎসরের সব সময়েই কলাই বীজ বপন করিয়া ইহার কাঁচা কোমল গাছের দ্বারা গো-খাদ্যের অভাব নিবারণ ও তাহাদের তুষ্টি ও পুষ্টি সাধন করা যায়।

খেঁসারিঃ—ইহার ঠিক ঠিক বপন কাল কার্ত্তিক মাস। ঐ সময়ে বপন করা জমিতেই ফলন ভাল হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে ইহা পুরা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত বপন করিতে দেখা যায়।

খেঁসারির চাষ দুই প্রকারে করা হইয়া থাকে। এক প্রকার জমি রীতিমত হালচাষ করিয়া ও অন্য প্রকার কাদার উপর বীজ ছড়াইয়া দিয়া হয়। কোন কোন স্থানের চাষীরা আমন ধান কাটিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ জমির উপর বীজ ছড়াইয়া দেয়। পরে ধান কাটা হইলে সে-সব অঙ্কুরিত হইয়া নাড়া বা খড়ের উপর গাছ লতাইয়া ফল ধরে। উক্ত নানা প্রকার বপন করা জমির মধ্যে কথিত জমিরই খেসারির ফলন ভাল হয় এবং তাহাই খাইতে ভাল। ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের চাষীরা খেঁসারির চাষ প্রধানতঃ গো-খাদ্যের জন্যই করিয়া থাকে। ইহার কাঁচা গাছ, পাতা, ফল, ক্ষুদ, কণা, খোসা, ও শুক্‌না গাছ সবই গোজাতির অতিশয় প্রিয়

ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার ফসল তোলার কার্য্য শেষ হইতে প্রায় সারা চৈত্র মাসই লাগিয়া থাকে।

জমি ভাল হইলে দুই-তিন বার চাষ-মৈ দিয়া বীজ ছড়াইয়া এক বার চাষ-মৈ দিয়া এক দিন অন্তর পুনরায় আর এক বার চাষ-মৈ দিয়া রাখার ফলই ভাল হয়। এসব কাজে ত্রুটি না হইলে বিঘা প্রতি ৭।৮ মণ খেঁসারির কলই* পাওয়া যায়। খেঁসারির বীজ বিঘা প্রতি পাঁচ সের লাগে। ইহারও দেশোৎপন্ন বীজ বপনের ফলই ভাল হইয়া থাকে।

মসুরীঃ—কার্ত্তিক মাসই ইহা বপনের ঠিক সময়। জমি ভালরূপ কর্ষণ না করিয়া বীজ বপন করিলে মসুরীর ফলন ভাল হয় না, একথা স্মরণ রাখিয়াই মসুরীর চাষে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। জমি ভালরূপ কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করিলে বিঘা প্রতি পাঁচ-ছয় মণ মসুরীর কলই পাওয়া যায়। জমি অনুর্ব্বর হইলে গোময় সার দেওয়া খুব উচিত। বীজ বিঘা প্রতি ছয় সের লাগে। যথা সময়ে বীজ বপন করিলে ফাল্গুন মাস মধ্যেই ফসল তোলার কার্য্য শেষ হয়। মসুরীর চূণি গাভীগণের দুগ্ধবর্দ্ধক গুণের জন্য বিশেষ আদরের বস্তু।

ছোলা ও মটরঃ—ইহাদের জমি প্রস্তুত, বীজ বপনের সময় ও ফসল তোলা ইত্যাদি সবই মসুরীর মত। ছোলা ও মটর যত্নের সহিত ফলাইতে পারিলে বিঘা প্রতি চারি মণ পর্য্যন্ত হয়। ছোলার বীজ প্রতি বিঘায় সাত সের ও মটরের বীজ পাঁচ সের লাগে। ছোলা ও মটরের খোসা ও ক্ষুদ-কণা গরুর প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। আস্ত ছোলা অশ্ব ও গো-শরীরের বল ও চর্ব্বিবর্দ্ধক গুণের জন্য অদ্বিতীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কঠিন পরিশ্রমের কাজের বলদ ও অশ্বাদির বল অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

* খেঁসারির কলই শব্দের অর্থ খোসা সহ খেঁসারি দাল। যাহারা দালের চাষ করে, তাহারা 'কলই' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে।

তিসি ঃ—কৃষিজাত বস্তুসমূহের মধ্যে তিসির ব্যবহার অতিশয় ীর্ণ রকমের। সেজন্য কোন কালেই ইহার কাট্‌তির বিরাম নাই। এঁটেলের ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটি ও খুব উর্ব্বরা জমিই তিসির চাষের পক্ষে উপযোগী। ইহার চাষে শ্রম ও ব্যয়-বাহুল্য বিশেষ কিছু নাই বলিলেও চলে। জমিতে ঘনভাবে দুই বার চাষ-মৈ দিয়া বিঘা প্রতি পাঁচ সের হিসাবে বীজ ছড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে আর এক বার চাষ-মৈ দিয়া জমি শক্ত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কার্ত্তিক মাসই বীজ বপনের প্রকৃত সময়। ভাটি বা বর্ষাপ্লাবিত অঞ্চলের চাষীরা পুরা অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বীজ বপনের কাজ করিয়া থাকে। তাহাতে ব্যয়বাহুল্য নাই বলিয়া তদ্দারা বিশেষ লাভই হইয়া থাকে। মাঘ মাসে ফসল তোলার কার্য্য প্রায় শেষ হয়। ফসল পাকিলে ইহার গাছ গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া আনিয়া গো-দ্বারা মাড়াইয়া ফসল বাহির করিতে হয়। তিসির তৈল বাজারের বড় একটা পণ্য দ্রব্য। দুগ্ধবতী গাভীর পক্ষে তিসির খৈলের বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। তিসির মূল্য সস্তার সময়েও প্রতি মণ চারি টাকার কম নহে এবং সময় সময় দশ টাকা পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।

গম বা গোধূম ঃ—ইহা তৃণজাতীয় শস্য। ইহার গাছের দৃশ্য ও চাষের প্রণালী অনেকটা ধানেরই মত। রবিশস্যাদির মধ্যে গম চাষের বিস্তৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং ইহা লাভজনক চাষের জিনিস। কিন্তু তাহা এতদঞ্চলের চাষীদের ধারণায় থাকা দূরে থাকুক, অনেকে বোধ হয় ইহার নাম পর্য্যন্ত অবগত নহে। আটা, ময়দা ও সুজির সহিত প্রায় সকলেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু তাহা যে গম দ্বারাই তৈরী হয়, তাহা বোধ হয় অল্প লোকেই জানে। চাউল যেমন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য, তেমনি আটা ময়দা পশ্চিমাঞ্চলবাসীর প্রধান খাদ্য। সেজন্য তথায় গমের চাষ এক প্রকার বাধ্যতামূলকই বলিতে হইবে। তাহা বলিয়া এতদঞ্চলে গমের

চাষ করিলে তাহা অবিক্রীত থাকিয়া যাইবে এরূপ মনে করা ভুল। কারণ বিদেশে ভারতবর্ষ-জাত গমের রপ্তানি ধান ও পাট অপেক্ষা কম নহে। সুতরাং যাহাদের জায়গার সচ্ছলতা আছে তাহাদের পক্ষে গমের চাষে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত উচিত মনে হয়। অন্ততঃ পরীক্ষাস্বরূপ কিছু চাষ করিয়া সংশয় দূর করা

আমরা কয়েক বারই পরীক্ষাস্বরূপ এক বিঘা জমিতে গম ফলাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, উপযুক্ত যত্নের অভাব না হইলে আমাদের জমিতে চাষ করিলে নিরাশার কোনই কারণ নাই। পরন্তু ইহা বেশ লাভজনক কৃষি। পশ্চিম দেশের চাষা লোক যাহারা এদেশে স্থায়ী ভাবে স্থানে স্থানে বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গমের চাষ করিয়া থাকে। তদ্দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে, গমের চাষের পক্ষে এতদঞ্চলের মাটি অনুপযোগী নহে।

বহুদিন হয় একবার বিহার অঞ্চলে গিয়াছিলাম। তখন আমার সে-সব স্থানের কৃষি-পদ্ধতি দেখিবার ও তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার যে সুযোগ হইয়াছিল তাহা হইতে এই শিক্ষাই পাইয়াছি যে, গমের চাষের লাভালাভ অনেকটা আমাদের পাট চাষের মত যত্নের ইতরবিশেষের উপরই অবধারিত হইয়া থাকে। পাটের ফলন যেমন যত্নের তারতম্য হেতু বিঘা প্রতি দুই-তিন মণ হইতে ১২।১৪ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে গমের উৎপন্নের হারও কতকটা সেইরূপ। সে-সব স্থানের চাষীরা বলিয়া থাকে যে, দোফলা জমিতে অর্থাৎ যে-জমিতে বৎসরের মধ্যে একাধিক-বার বিভিন্ন শস্যাদির চাষ করা হয়, তাহাতে বিশেষ যত্নের সহিত গম বপন করিলেও প্রতি বিঘায় চারি মণের অধিক গম পাওয়া যায় না। এবং সে-সব জমিতে ফলানো গমের গাছ প্রখর রৌদ্রের তাপ ইত্যাদি নৈসর্গিক উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া নানরূপ নৈরাশ্যের

কারণ জন্মাইয়া থাকে। কিন্তু যে জমিতে বৎসরের মধ্যে এক বার মাত্র গমই বপন করা হয়, সে জমিতে এক বার ফসল তোলার পর আবার বীজ বপন না করা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে চাষ ও সময় সময় গোময়, ও ছাই মাটি ইত্যাদি আবর্জ্জনা রাশি সার রূপে নিক্ষেপ করিতে পারা যায় বলিয়া বিঘা প্রতি ফলন দশ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে এবং রৌদ্রের তাপ খুব বাড়িলেও ইহার ফলন সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোন কারণ থাকে না। সেরূপ ভাল ভাবে ফলানো গমের মূল্য সর্ব্বদাই অধিক পাওয়া যায়। কারণ গমের ভালমন্দের উপরই আটা ময়দা ইত্যাদির ইতরবিশেষ বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে।

উপরে গমের উৎপন্নের হারের বৈষম্যের কথা যাহা বলা হইয়াছে, ইহাকে অসম্ভব ভাবিবার কোন কারণ নাই। দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া কর্ষণের উপযোগিতা বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে যাহা যাহা বলা হইয়াছে এতদ্দ্বারা তাহাই বুঝিবার পক্ষে বেশ সুবিধা করিয়া দিতেছে।

গমের জমির মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। কার্ত্তিকের প্রথম ভাগেই বীজ বপন করা ভাল। বীজ বিঘা প্রতি দশ সের লাগে। ফাল্গুন চৈত্র মাস মধ্যে ফসল তোলার কার্য্য শেষ হয়। ইহার অনেকটা বীজ বপনের সময়ের অগ্র-পশ্চাৎ হওয়ার নিমিত্ত শীঘ্র বা দেরী হইয়া থাকে। ফসল পাকিলে তাহা কাটিয়া আনিয়া গরু দ্বারা মাড়াইয়া অথবা এক একটি আটি হাতে ধরিয়া ওজনে ভারী একটা কাঠের টুকরার উপর আস্তে আস্তে আঘাত করিয়া খড় বা বিচালি হইতে পৃথক করিতে হয়। গমের বিচালি পশ্চিমাঞ্চলের লোকের গরু ঘোড়ার একটা বিশেষ গণনীয় খাদ্য। গম দ্বারা আটা ময়দা ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে তাহা উদুখলে কুটিয়া ইহার পাতলা বাকল ছাড়াইয়া লইতে হয়। ঐ পাতলা বাকল বা ভুষি (Wheat bran) গো ও অশ্ব-

শরীরের অত্যন্ত বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকর, এবং গাভীগণের দুগ্ধবর্দ্ধক, অথচ খুব সহজপাচ্য খাদ্য! যে-সকল গরু দাল জাতীয় শস্যখাদ্য ও খৈল ইত্যাদি গুরুপাক খাদ্য খাইয়া হজম করিতে পারে না, তাহাদের পক্ষেই ইহা অধিক উপযোগী।

যব ঃ—ইহাও তৃণজাতীয়, এবং গাছের দৃশ্য, বপনকাল, জমি প্রস্তুত, বীজের পরিমাণ এবং ফসল তোলার নিয়ম ইত্যাদি প্রায় সবই গমের মত। যবও পশ্চিমাঞ্চলের লোকের একটি প্রধান খাদ্য। ইহার মূল্য গম অপেক্ষা কতক স্থলভ, একারণ গরীব লোকেরা ইহাই অধিক ভাবে খায় বলিয়া মনে হয়।

যই ঃ—ইহাও তৃণজাতীয়, এবং চাষের প্রণালী, বপনকাল, ফসল তোলা ইত্যাদি সবই গম ও যবের মত। ইহা মানুষেরও খাদ্য। ইহা ঘোড়ার পক্ষে বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য এবং ইহার জন্যই প্রধানতঃ যব চাষ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় যব বিদেশেও প্রচুর রপ্তানি হইয়া থাকে।

ভূট্টা ঃ—ইহাকে রবিশস্য বলা যাইতে পারে না। কারণ ভুট্টার বপন কাল চৈত্র বৈশাখ ও ফসল তোলার সময় শ্রাবণ মাস। তবুও যে ইহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম, ইহার কারণ ভুট্টা গো-খাদ্যের অভাব পূরণের পক্ষে একটা বড় জিনিস। ভুট্টা মানুষ গরু উভয়েরই পুষ্টিকর খাদ্য। ভুট্টার কাঁচা গাছ গরুর অতিশয় প্রিয়। ভুট্টার মধ্যবয়সের কাঁচা গাছ কাটিয়া আনিয়া তখন তখনই টুকরা টুকরা করিয়া মাটিতে প্রোথিত করিয়া রাখিলে, (যাহাকে সাইলেজ করা বলা হইয়া থাকে*) তদ্দারা ঘাসের স্বাভাবিক অভাব কালে গো-খাদ্যের অভাব দূর করা খুব সহজ হয় এবং ইহাতে গো-শরীর বেশ ভাল থাকে।

শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জেলার পার্ব্বত্য জাতীয়েরা এবং বোধ

---

* মৎপ্রণীত "গো-পালন শিক্ষা" গ্রন্থের সাইলেজ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

হয়, অন্য বহু স্থানেরও পার্ব্বত্য জাতিরা ভুট্টার চাষ অধিক করে। ভুট্টা পাকিলে তাহারা কাঁচা খায় ও তাহা শুকাইয়া খৈ করিয়াও খায়। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেও ভুট্টার ময়দা দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া বা খৈ করিয়াও খায় এবং ইহার খোসা ভূষি গরুকে খাইতে দেয়। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরাও ভুট্টা বপন করিয়া দেখিয়াছি; ইহা আমাদের জমিতে বেশ ভালই হইয়া থাকে। ইহা গবাদির অতিশয় প্রিয় বলিয়া তাহা হইতে রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন, সেজন্য ইহাদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়াই ভুট্টার চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ভুট্টা তৃণজাতীয়। মাঘ ফাল্গুন মাসে ইহার জমি চারি পাঁচ বার চাষ-মৈ দিয়া রাখিয়া চৈত্র বৈশাখে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর বিঘা প্রতি ছয় সের বীজ বপন করিয়া আর একবার ভালমত চাষ-মৈ দিয়া রাখা ও ফসল পাকিলে যথাসময়ে কাটিয়া আনাই কাজ।

পেঁয়াজ (পলাণ্ডু)ঃ—কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে পেঁয়াজের চাষ খুব লাভজনক। ইহা প্রত্যেক বাজার বন্দরের একটা বড়রকমের বেচা-কেনার জিনিস। জমি ভাল হইলে এবং উপযুক্ত যত্নের অভাব না হইলে বিঘা প্রতি ৮০।৯০ মণ পর্য্যন্ত পেঁয়াজ হইয়া থাকে, ইহা আমরা ক্রমাগত ৮।১০ বৎসর পর্য্যন্ত হাতে-কলমে করিয়াই বলিতে পারিতেছি। পেঁয়াজ সঞ্চিত রাখিতে গেলে শুকাইয়া ও কতক পচিয়া গিয়া পুনঃ বপন কাল পর্য্যন্ত অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়া যায়। নূতন পেঁয়াজ সস্তার বাজারে প্রতি মণ এক টাকাতে পর্য্যন্ত বেচা-কেনা হয়। কিন্তু পুরাতন পেঁয়াজ সময় সময় ৮।১০ টাকারও অধিক হইয়া থাকে। একারণ যাহাদের পক্ষে সম্ভব তাহারা পেঁয়াজ পুরাতন করিয়াই বিক্রয় করে এবং এই উপায়ে পেঁয়াজের চাষ ও বেচা-কেনা করিয়া কোন কোন স্থানের চাষীদিগকে বিশেষ সচ্ছল ও অবস্থাপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে।

পেঁয়াজের জমিঃ—অধিক বালির ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটিতেই পেঁয়াজ অধিক জন্মায়। পেঁয়াজের জমিতে সময় সময় জল সেচনের উপর ইহার চাষের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং ঢালু জমি পেঁয়াজ চাষের পক্ষে ভাল হইতে পারে না। সেজন্য পেঁয়াজের চাষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই জমি সমান ও জল সেচনের সুবিধা আছে কিনা তাহা দেখা বিশেষ দরকার। যে-সব জমি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয় তাহাতে পেঁয়াজের চাষ করিতে হইলে সাব দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কারণ তাহাতে যে পরিমাণ সারের দরকার তাহা সাধারণতঃ প্লাবনের জলের সহিতই আসিয়া থাকে। কিন্তু টানের জমিতে পেঁয়াজ বপন করিতে হইলে সার দেওয়াই উচিত। গোময় সারই পেঁয়াজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পেঁয়াজের জমির কর্ষণ ও সার দেওয়ার কাজ যত অধিক সময় হাতে রাখিয়া করা যায়, ফলন তত ভাল হইয়া থাকে। জমিতে সার ছড়াইবার পর অন্ততঃ এক পশ্‌লা বৃষ্টি না হইয়া গেলে কীটের উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা থাকে।

পেঁয়াজের জমি গভীরভাবে কর্ষিত ও মাটি ধূলিবৎ চূর্ণিত হওয়া বিশেষ দরকার। বর্ষা অন্তে যখনই মাটিতে যো হইয়াছে দেখা যাইবে তখনই কর্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ক্রমে চাষ করিতে থাকিলে স্বভাব-নিয়মেই মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ ও কোমল হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলেই বীজ বপন করা কর্ত্তব্য। ঋতু রক্ষার অনুরোধে বাধ্য হইয়া খুব ঘন ঘন চাষ-মৈ দিয়া ও বলপ্রয়োগে মাটি চূর্ণ করিয়া বীজ বপন করিলে ইহার গাছ রীতিমত সতেজ হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ফলনও আশানুরূপ ভাল হইবে না। পূর্ব্ব বৎসরের সুরক্ষিত পেঁয়াজই বপন করিতে হয়। ইহার আলগা খোসা ও পুরাতন শিকড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দুই তিনটি কড়া একত্র রাখিয়া রোপণ করিতে হয়। বিঘা প্রতি দুই হইতে আড়াই মণ পর্য্যন্ত বীজ লাগে।

জমি প্রস্তুত হইলে তিন-পোয়া হাত দূরে দূরে লাঙ্গল টানিয়া খাদের মধ্যে সাত-আট অঙ্গুলি অন্তর এক একটি বীজ খাড়া ভাবে ধরিয়া মাটি হাতে টানিয়া সমান করতঃ আস্ত বীজই মাটিতে ডুবাইয়া দিতে হইবে। চাষীরা সাধারণতঃ বীজ লাঙ্গলের খাদে না বসাইয়া দাঁড়ার উপরই গুজিয়া বসাইয়া থাকে। ইহার ফল এই হয় যে, পেঁয়াজের গাছ কতক বড় হইবার পর যখন লাঙ্গল টানিয়া দাঁড়ার উপর বা গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইবার দরকার হয় ও তাহাতে যে পরিমাণ মাটির দরকার, ইহার অনেকটা অভাব হইয়া থাকে। কাজেই গাছের গোড়ার মাটিতে কতকটা শুষ্কতা দোষ আসা অনিবার্য্য হয়, যাহা তাহাদের ঠিক ঠিক পুষ্ট হইবার পথের বিষম অন্তরায় হইয়াই দাঁড়ায়। খাদের মধ্যে বীজ বপন করিলে সে-সব দোষ ঘটিতে পারে না বলিয়া পেঁয়াজ সহজেই বেশ পুষ্ট হইতে পারে। এই ভাবে বীজ বপনের পর গাছ উঠিয়া পাতা পাঁচ-ছয় অঙ্গুলি লম্বা হইলে ভালমত এক পশ্‌লা জল সেচন করিয়া দুই অথবা তিন দিন পর জমিতে যখনই যো হইয়াছে দেখা যাইবে তখনই দুই সারির মধ্যে ছোট লাঙ্গল টানিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে লাঙ্গল টানিলে জল দেওয়ার দরুণ মাটিতে সাধারণতঃ যে চট্ বাঁধিয়া যায় তাহা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়া আপনা হইতেই গড়িয়া উঠে, অথচ জল সেচনের দ্বারা মাটিতে যে রসের সঞ্চার হয় তাহা অনেক সময় পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে বলিয়া পেঁয়াজ রীতিমত পুষ্ট হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, জল সেচনের পর যথাসময়ে মাটির চট্ ভাঙ্গিয়া না দিলে মাটি দ্রুত টানিয়া পড়ে ও ইহাতে ফসলের উন্নতি না হইয়া বিশেষ অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। সেজন্ত পেঁয়াজের জমিতে যত বারই জল দেওয়ার দরকার হইবে তত বারই জল সেচনের পর লাঙ্গল টানিয়া দেওয়া দরকার। জল

কত বার দিতে হইবে তাহা জমির রসের অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঠিক করিতে হয়।

পেঁয়াজ দুই প্রকার,—দেশী ও বোম্বাই। এতদঞ্চলে দেশী পেঁয়াজেরই ফলন অধিক হয় এবং বাজার-বন্দরে ইহারই কাটতি বেশী। কাজেই পেঁয়াজের চাষ করিতে হইলে দেশী পেঁয়াজের চাষই করা উচিত।

রসুন ঃ—খুব উর্ব্বর ও রসাল জমিতেই রসুনের ফলন ভাল হইয়া থাকে। বস্তুতঃ রসুন চাষের সাফল্য অনেকটাই জমি নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করে। ইহা প্রকৃতই লাভের কৃষি। আমরা এক অবস্থাপন্ন ভদ্র মুসলমান পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছি। তাঁহাদের সম্বন্ধে এইরূপ কথা শুনা যায় যে, রসুনের চাষেই তাঁহারা অবস্থার উন্নতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। রসুনের আবাদ প্রণালী ও তদ্বির সবই পেঁয়াজের মত। ইহার ফলনের হার পেঁয়াজ অপেক্ষা কম, কিন্তু মূল্যের হার সর্ব্বদাই বেশী। ইহার কাট্তিও যথেষ্ট বলিয়া লাভজনক হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাদের উপযুক্ত স্থান আছে তাহাদের পক্ষে রসুনের চাষে বিরত থাকা উচিত নয়। ইহাতে বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি আধ মণ লাগে। এক একটা রসুনে বহুসংখ্যক কড়া থাকে। রসুন ভাঙ্গিয়া এক একটি কড়া করিয়া রোপণ করিতে হয়। সেজন্য বীজের পরিমাণ কম লাগিয়া থাকে।

তামাক ঃ—ইহা প্রত্যেক বাজার-বন্দরের একটা বড়রকমের পণ্যদ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে ইহার মত লাভের কৃষি অতি অল্পই দেখা যায়। তামাকের বিশ্বব্যাপী ব্যবহার-বাহুল্যের কথা ভাবিতে বসিলে মনে হয় যে, ইহা যতই উৎপাদন করা হউক না কেন, কোন কালেই ইহার অনাদর হইবে না। তামাকের মধ্যে অনেক জাতি আছে। ভাল জাতি নির্ব্বাচন ও চাষের যত্নাধিক্যের উপরই ইহার লাভের পরিমাণ অবধারিত হইয়া থাকে। তামাকের

বাজার দর ইহার গুণানুসারে প্রতিমণ তিন টাকা হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত শুনিয়াছি। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ফলন ভাল হইলে কৃষিজাত দ্রব্য স্বভাবতঃই দেখিতে মনোরম ও গুণে উৎকৃষ্ট হয় এবং এই কারণে মূল্যও অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া থাকে। এই প্রভেদ তামাকের মধ্যে যত বেশী দেখিতে পাওয়া যায় তেমনটি আর কোন জিনিসে হইতে প্রায় দেখা যায় না। তামাকের চাষ করিয়া ঠিক ঠিক লাভবান হইতে হইলে, উৎকৃষ্ট জমি ও উত্তম জাতীয় বীজ নির্ব্বাচন আবশ্যক, এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজেও যে বিশেষ যত্ন লইতে হইবে তাহাও বুঝিতে কোন অসুবিধা হয় না। এসব বিষয়ে ক্রটী না হইলে এক বিঘা জমিতে দশ মণ পর্য্যন্ত তামাক হইয়া থাকে।

তামাক চাষের সাফল্য প্রধানতঃ জমিতে প্রচুর পরিমাণ সার দেওয়া ও তামাকের গাছ বড় হইতে থাকিলে যথাসময়ে ইহার কুঁড়ি (পত্রাঙ্কুর) ও আগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং সারা মরসুমের মধ্যে আবশ্যকমত অন্ততঃ দুই বার প্রচুর পরিমাণে জল সেচনের উপর নির্ভর করে। ইহার কোন এক কাজে ক্রটী হইলে অন্যান্য যত্নের ফলকেও ব্যর্থ করিয়া দেয়। এইরূপ দৃশ্য স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্র এবং প্রায় সকল চাষীরাই নিজ নিজ ব্যবহারের জন্য অল্প-বিস্তর তামাকের চাষ করিয়া থাকে। বিগত ১৩৩৬ সালের আকস্মিক জলপ্লাবনের দরুণ আমাদের অঞ্চলের কৃষিজীবিগণ অভাবের তাড়নায় অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন তাহাদের অধিকাংশই তামাকের চাষকে নিজেদের অভাব ঘুচাইবার একটা বড়রকমের উপায় করিয়া লইয়াছিল; ফলে বিদেশ-জাত তামাকের আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল। পক্ষান্তরে, আমাদের অঞ্চলে জাত তামাক বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল। ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরে তামাক চাষের

বাড়াবাড়ির দরুণ দর অত্যন্ত সুলভ হইয়া পড়ায় চাষীদের অনেকেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া তামাকের চাষ ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে আবার রংপুর-তামাকের আমদানী ও দর ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, চাষের কাজে উপযুক্ত যত্নের অভাব রাখিয়া কেবল বেশী পরিমাণ তামাক পাইবার আশায় নিকৃষ্ট জাতের তামাকের চাষ করাই ইহার দর কমিবার ও সঙ্গে সঙ্গে চাষীদের নিরুদ্যম হইবার প্রধান কারণ হইয়াছিল। এইরূপ মনে করিবার হেতু এই যে, সেই সুলভতার সময়েও যাহারা ভাল তামাক ফলাইতে পারিয়াছিল তাহারা উচিত মূল্য পাইতে বঞ্চিত হয় নাই। নীরস তামাক যখন দুই বা আড়াই টাকায় মণে বিকাইতেছিল তখনও দেশী ভাল তামাক পনর টাকা দরে বিকাইয়াছিল। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এতদঞ্চলের মাটি তামাক চাষের পক্ষে অনুপযোগী নহে, এবং অতিরিক্ত ব্যয় দিয়া অতিরিক্ত লাভ করিবার যে পদ্ধতি রহিয়াছে, তামাকের চাষে তাহা অবলম্বন করিলে তদ্দ্বারা আশাতীত রকমের লাভ করা যাইতে পারে।

তামাকের জমি ঃ—এঁটেলের ভাগযুক্ত দোআঁশ অথচ রসাল জমিতেই তামাক ভাল ফলিতে দেখা যায়। যেখানে ঐরূপ জমির অভাব সেখানে উপযুক্ত ব্যয় বিধান করিয়াই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হয়। আর একটি প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলে বর্ষা ঋতুর কয়েক মাস অধিক বারি-পাত হয় বলিয়া মাটি যেমন অত্যধিক আর্দ্র থাকে তেমনি ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হেমন্ত ও শীত ঋতুতে মাটি স্বভাবতঃই অত্যধিক শুষ্ক হইয়া পড়ে, এবং ইহার দরুন জল সেচনের ব্যবস্থা না করিয়া আলু, পেঁয়াজ ও তামাক ইত্যাদি ফলাইতে গেলে অন্য প্রকার শত শ্রমেও ঠিক ঠিক সাফল্যলাভ করা কঠিন হয়। সেজন্য তামাকের জমি নির্ব্বাচনকালে তথায় আবশ্যকমত জলসেচন করিতে পারা যাইবে কিনা তাহা অগ্রেই দেখিতে হইবে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, তামাকের জমিতে অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। কিন্তু অধিক সার দেওয়া জমির গাছপালার গোড়ায় যথাসময়ে জল সেচন না করিলে শুষ্কতার সময়ে মাটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে; ফলে সারের গুণ প্রকাশ না পাইয়া বিশেষ অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। তামাকের চারা রোপণ করিবার বেলায় সে-সব কথা স্মরণ রাখা খুবই দরকার। জমি ভাল হইলে একটা লাভজনক কৃষির সাফল্যের জন্য জমিতে কুয়া খনন করিয়া জলাভাব দূরীকরণে চেষ্টিত হওয়া অসঙ্গত মনে হয় না।

জমি প্রস্তুত ঃ—তামাক ভাল পাইতে হইলে চারা রোপণের কার্য্য কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহ মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। সেই হিসাবে জমি ঠিক ঠিক মত প্রস্তুত করিতে হইলে শ্রাবণের প্রথম হইতেই চাষের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া বিশেষ দরকার। যেখানে অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা দরকার সেখানে একটু বেশী সময় হাতে না রাখিয়া চাষের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সার ও মাটির মিশ্রণের কার্য্য ভাল হইতে পারে না। এইরূপে প্রস্তুত জমি চারার বৃদ্ধিশীলতার এক প্রধান অন্তরায় এবং সময় সময় নানা রোগ সৃষ্টি ও কীটের আবির্ভাবেরও প্রধান কারণ হইয়া থাকে। এ বিষয়টি ইতিপূর্ব্বে স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে। কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে চারা রোপণ করিলে জমিতে অত্যধিক শুষ্কতা দোষ ঘটিবার পূর্ব্বেই তামাকের চারা একপ্রকার বড় হইয়া যায়; ফলে জল সেচনের প্রয়োজনীয়তাও অনেকটা কমিয়া যায় এবং গাছের স্থিতিকাল অনেক দিন পর্য্যন্ত হইতে পারে বলিয়া পাতা অধিক পুরু হইতে ও পাকিতে পারে। এসব গুণের অভাব বা আধিক্যের উপর তামাকের মূল্য বিস্তর কমিবেশী হইয়া থাকে। ইহার জন্যই চারা রোপণের কার্য্য কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহেই শেষ করা বিশেষ দরকার। কাজেই শ্রাবণের প্রথম হইতেই কর্ষণ ও সার ছড়াইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

সারের কথা ঃ—তামাকের জমির পক্ষে গোময় গোমূত্রই ফলপ্রদ সার। ইহার দৃষ্টান্ত—দেশের চাষীরা সাধারণতঃই গো-শালার ভাটি দিকের চারা জমি, যাহাতে সর্ব্বদাই গোময় গোমূত্র ধোয়া জল ও গো-শালার আবর্জ্জনা গিয়া পড়ে, সে-সব স্থানেই অধিক ভাবে তামাক জন্মাইয়া থাকে। ইহার ফল প্রায় সর্ব্বত্রই ভাল হয় দেখিয়া তামাকের জমিতে গোময় সারের উপযোগিতা সম্বন্ধে বেশ নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। কিন্তু বিস্তৃত আকারে তামাকের চাষ করিতে হইলে তত গোময় সংগ্রহ করা সর্ব্বত্র সুলভ না হইবারই কথা। সেরূপ হইলে বাধ্য হইয়াই গোময়ের সহিত খৈল, পচা কচুরি, হাড়ের গুড়া ইত্যাদি মিশাইয়া ভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, এরূপ করিতে পারিলে ফলও ভাল হইয়া থাকে। সম্প্রতি স্থানে স্থানে নাইট্রেট্ অফ সোডার ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তামাক জমিতে ইহার একটা পরিমাণ আগে হইতে স্থির করিয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। কারণ ইহা প্রধানতঃ মাটিব বলাবল বুঝিয়া স্থির করিতে হয়, এবং দুই-এক বার করিলে পরিমাণ স্থির করিবার মত জ্ঞান আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে।

নাইট্রেট অব সোডা খুব দ্রুত ক্রিয়াশীল সার। অন্যান্য সারের সহকারী রূপে দিলে সে-সব সারের ক্রিয়াকেও দ্রুত বাড়াইয়া তুলিতে পারে, এজন্যও ইহা দেওয়া দরকার। প্রথমে চারা গাছের গোড়ায় এক তোলা আধ তোলা করিয়া দিলে ইহার ক্রিয়া গাছের গোড়ায়ই নিবদ্ধ থাকে বলিয়া সেরূপ বল প্রকাশ করিতে পারে না। কেহ কেহ তামাকের চারা রোপণের পর গাছ চার-ছয় ইঞ্চি উচ্চ হইলে চারার গোড়ায় এক তোলা আধ তোলা করিয়া নাইট্রেড অব সোডা দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহা আমরা ভাল মনে করি না। কারণ এ ভাবে দিলে ইহার ক্রিয়া গাছের গোড়ায়ই নিবদ্ধ থাকে, আর খুব তেজস্কর পদার্থ বলিয়া ইহা কোন কোন চারার মৃত্যুর কারণ হইতেও দেখা গিয়াছে। জমিতে

অন্যান্য সার ছড়াইবার কালে ইহাদের সহকারী রূপে একই সঙ্গে দিলে, অন্যান্য সার যাহা দেওয়া যায় সেই সকলকেও দ্রুত ক্রিয়াশীল করিয়া তুলিতে পারে বলিয়া শেষোক্ত পদ্ধতিতেই নাইট্রেট অব সোডা ব্যবহার করা আমরা ভাল মনে করি।

তামাকের জাতিঃ—তামাক বহুজাতীয়; এজন্য ইহাদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথা অনেকের জানা থাকিলেও উৎকৃষ্ট জাতীয় তামাকের বীজ সংগ্রহ করিতে পারা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে প্রায় সম্ভব হয় না। এই কারণে মতিহারী তামাকের চাষই এতদঞ্চলের লোকের একচেটিয়া হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ মতিহারী তামাক অত্যন্ত তেজস্কর এবং যথেচ্ছ ভাবে রোপণ করিলেও অল্প-বিস্তর হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা ধূমপান একপ্রকার চালাইতে পারা যায়। অন্যান্য ভাল তামাক এই রূপ যেন-তেন প্রকারে ফলাইতে পারা যায় না। সে-সব তামাক যথেচ্ছভাবে ফলাইতে গেলে যেরূপ হয়, তাহা প্রায় ধূমপানের অযোগ্য হইয়া থাকে। মোট কথা, ভাল জাতীয় তামাকের গুণ ফুটাইয়া তোলা বিশেষ যত্ন সাপেক্ষ। সেরূপ করিতে সমর্থ হইলে এবং আগ্রহ থাকিলে ভাল তামাকের বীজ পাওয়া বিশেষ কঠিন নয়। সরকারী কৃষি-বিভাগকে জানাইলে তাহারা ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন।

চারা প্রস্তুতঃ—তামাক চাষের সাফল্য অনেকটাই ইহার চারার উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। সুতরাং যেখানে কার্ত্তিকের প্রথম ভাগেই চারা রোপণ করার অভিপ্রায় থাকে, সেখানে তদনুরূপ সময় হাতে রাখিয়াই ইহার বীজতলা প্রস্তুতের কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। চারা রোপণের স্থানে হাল জুড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বীজ-তলার যায়গায় কোদালি করিবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহা ঘন ঘন করা ও তথায় কতক অর্দ্ধ-পচা গোময় সার ছড়াইয়া

দেওয়া দরকার। বীজতলার মাটি খুব নির্ম্মল ও ধূলিবৎ চূর্ণ হওয়া দরকার। তথায় তামাকের বীজ বপন করিলে পিপীলিকার আক্রমণ ঘটিয়া থাকে। বীজতলার স্থানে ঘন ঘন কোদালি করিয়া রোদ-বাতাস লাগিতে দেওয়াই পিপীলিকার উপদ্রব প্রশমিত করিবার প্রধান উপায়। খুব শক্ত ও কষ্টসহিষ্ণু চারা পাইতে হইলে বীজ-তলার স্থান খুব আটরোদে হওয়া দরকার ও বৃষ্টির জলের স্রোত হইতে বাঁচাইবার জন্য বীজতলা সরজমি হইতে চার-পাঁচ ইঞ্চি উচ্চ করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ইহার জন্য আবশ্যক হইলে সূচনাতেই অন্য স্থান হইতে ভাল মাটি আনিয়া উচ্চ করিয়া লইতে হইবে।

বীজ বপনঃ—তামাকের বীজ বপন-প্রণালী দুই রকম এবং আবশ্যক মত ইহার যে-কোন প্রণালীই অবলম্বন করা যাইতে পারে ও করিতেও হয়। একপ্রকার শুষ্ক বীজ বপন করা ও অন্য প্রকার বীজকে কাপড়ের পুটলিতে বাঁধিয়া ভিজাইয়া অঙ্কুর উদ্গম করিয়া বপন করা। উক্ত দুই প্রকার বীজ বপন-প্রণালীর মধ্যে শুষ্ক বীজ বপনোৎপন্ন চারাই খুব কষ্টসহিষ্ণু হয়। ফলে চারা জমিতে বসাইবার পর সহজেই বাঁচিয়া উঠে ও শীঘ্র বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। কিন্তু শুষ্ক বীজ বপন করিলে ইহার অঙ্কুর উদ্গম হইতে কতককাল বিলম্ব ঘটিয়া থাকে এবং এই কারণে অনেক সময়ই চারা রোপণ কার্য্যে অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কতক বিলম্ব করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কারণে বেশীর ভাগ লোকেই বীজের অঙ্কুর বাহির করিয়াই বপন করিয়া থাকে। আমরা তাহা পছন্দ করি না এই কারণে যে, সে-সব চারা উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ই পচিয়া যায়। বিশেষতঃ চারা উঠিবার সময় বৃষ্টি বাদলা হইলে বৃষ্টির জলের হাত হইতে রক্ষাকল্পে উপরে যে আচ্ছাদন দেওয়া হয় তাহার দরুন উপযুক্ত উত্তাপ ও বায়ু চলাচলের অভাববশতঃ চারা পচিয়া যাইতে থাকে।

উভয় প্রকার বীজই ছিটাইয়া বপন করিতে হয়। বীজ ছিটাই-বার সঙ্গে সঙ্গে খুব ঘন ও অগভীর ভাবে কোদালি করিয়া মাটি সমান করতঃ তদুপরি একটা বাঁশের চাঁচ বিছাইয়া ইহার উপরে পায়ের দ্বারা চাপিয়া মাটি খুব শক্ত করিয়া লইয়া চাঁচটা উঠাইয়া লওয়া ও প্রতিদিনই দুই বেলা আন্দাজমত জল দেওয়া ও বৃষ্টির সময় ব্যতীত অন্য সব সময়ই অনাবৃত রাখা আবশ্যক। শুষ্ক বীজের চারা উঠিয়া রোপণের উপযুক্ত হইতে কতক দেরী হইয়া থাকে একথা প্রথমেই বলা হইয়াছে, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে দুই সপ্তাহ সময় হাতে রাখিয়াই বীজ বপন করা দরকার। তামাকের চারা এক মাসের হই-লেই জমিতে রোপণ করা যায়। সুতরাং শুষ্ক বীজ ব্যবহার করিতে হইলে ভাদ্রের শেষভাগেই বীজতলায় বীজ বপন করিতে হইবে।

চারা রোপণ ও তদ্বির :—তামাক চারার রোপণ-প্রণালীও দুই প্রকার। এক প্রকার—চারা রোপণের স্থান ঠিক করিয়া লইয়া তথায় খুরপির এক কোণ দ্বারা অথবা বাঁশের একটা ধারাল অস্ত্র তৈয়ার করিয়া লইয়া তদ্দারা ছোট গর্ত্ত করিয়া চারা বসাইয়া মাটি হাতে চাপিয়া খুব শক্ত করিয়া দেওয়া। অন্য প্রকার—ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কতক জল ঢালিয়া দিয়া ঐ অস্ত্রের সাহায্যে তরল কাদা করতঃ ইহার উপর আস্তে আস্তে চারার শিকড় আন্দাজমত দাবাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া। উক্ত দুই প্রণালীর মধ্যে শেষোক্ত প্রণালীই ভাল। কারণ কাদার উপর চারা বসাইবার সময় শিকড় বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে ও দুই-চারি মিনিটের মধ্যেই কাদা শুকাইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শিকড়কে বেশ আঁকড়াইয়া ধরে বলিয়া প্রায়ই মরে না। পক্ষান্তরে, এভাবে কাজ খুব শীঘ্র করা যায়। জমির মাটি খুব শুষ্ক মনে হইলে চারা বসাইবার পর দিন প্রাতে ঝাঁজরি দ্বারা এক বার মাত্র জল দিলেই চলে। অনেকে তাহাও করে না। কিন্তু কাদা শুকাইবার সঙ্গে চতুর্দ্দিকে যে একটা ফাট ধরে তাহাতে রৌদ্র বাতাস প্রবেশ

করিতে পারে বলিয়া ইহাই কোন কোন চারার মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। চারা রোপণের পর দিন এক বেলা জল সেচন করিয়া দিলে সেই ফাট অনেকটাই বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া প্রায়ই ইহার মৃত্যু হয় না। প্রথমোক্ত প্রণালীতে চারা রোপণ করিতে গেলে চারার শিকড় অত্যন্ত ছোট বলিয়া চারার গোড়ার মাটি বেশ চাপিয়া দিলেও কোন কোনটাতে কতক ফাঁক থাকিয়া যাওয়া অনিবার্য্য হয়। ইহার দরুন ক্রমাগত তিন-চার দিনই অল্প অল্প জল সেচন করিতে বাধ্য হইতে হয়, এবং এরূপ করা সত্ত্বেও কোন কোন চারার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে।

চারা রোপণের পর দুই সপ্তাহ আন্দাজ গত হইলে যখন দেখা যাইবে যে, ইহা কিছু বৃদ্ধি হইতে সুরু হইয়াছে, তখন সমস্ত জমিতে নিড়ানি যন্ত্র দ্বারা এক বার অগভীর ভাবে নিড়াইয়া দিয়া চারার গোড়ার মাটি হাতে চাপিয়া শক্ত করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর আবশ্যকমত জল সেচন ও নিড়ানি দেওয়া ও সময়মত মাটি-সংলগ্ন পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া গোড়ায় ধরাইয়া দেওয়া, সময় সময় কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং আট-দশটি পাতা হইলে গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।

ফসল তোলা ঃ—যত্নের তারতম্যের উপরই তামাকের গুণের হ্রাস-বৃদ্ধি ও মূল্য অবধারিত হইয়া থাকে। বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভাল ফলানো উৎকৃষ্ট জাতীয় তামাকের গাছও কাটিয়া আনিয়া খোলা জায়গায় যথেচ্ছভাবে ফেলিয়া রাখিলে ইহার তেজ ও গন্ধের বিস্বাদ বিন্দুমাত্রও থাকে না এবং তাহা বিশ্রী গন্ধযুক্ত ও ধূমপানের অযোগ্য হইয়া থাকে। তাহা না হইতে পারে, ইহার জন্য তামাক গাছ কাটিবার পূর্ব্বেই যে ঘরে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে সেই ঘরে লম্বা ভাবে আবশ্যক মত দড়ি টানাইয়া লইতে হইবে, যেন গাছগুলি আনিয়াই ঐ দড়ির উপর সারিবন্দী করিয়া ঝুলাইয়া রাখিতে পারা যায়।

তামাক পাতা রীতিমত পাকিলেই গাছের গোড়া কাটিতে হয়। প্রাতে গাছের গোড়া কাটিয়া তাহা সমস্ত দিন সেই স্থানেই রাখিয়া দিতে হইবে। গাছের গোড়া কাটিয়া তখন তখনই তাহা স্থানান্তরিত করিতে গেলে পাতা ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া সেই স্থানেই রাখিয়া সারাদিনের রোদ লাগাইয়া কতকটা মোটা করিয়া লওয়া দরকার। অপরাহ্নে গাছগুলি আনিয়া দড়ির উপর ঘনভাবে ঝুলাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে.এবং যে পর্য্যন্ত না ডাঁটা সহ পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। পাতা সম্পূর্ণ শুকাইয়া গেলে দা-এর দ্বারা পাতাগুলি কাণ্ডের গা ঘেসিয়া কাটিয়া আন্দাজমত আঁটি বাঁধিয়া ডাঁটার দিক উপরে রাখিয়া বড় বড় চুবড়ি বোঝাই করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। খুব রোদের সময় পাতা কাটিতে গেলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায় ও ইহাতে সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। সেজন্য পাতা কাটার কাজটা প্রাতে, সায়াহ্নে অথবা ঠাণ্ডা দিনে খুব সতর্কতার সহিত করিতে হইবে। এইভাবে পাতা কাটা ও আঁটি বাঁধার কাজ শেষ হইলে প্রখর রোদে চোবরি সহ দুই দিন ভালরূপে শুকাইয়া বস্তাবন্দি করিয়া এমন ভাবে রাখিতে হইবে যে, তামাকের গায়ে বাতাস ও ঠাণ্ডা লাগিতে না পারে। এইরূপ যত্নে উৎপাদিত ও সুরক্ষিত তামাক ধূমপায়ীর পক্ষে বিশেষ আদরের বস্তু এবং সেরূপ তামাকের মূল্য অধিকই হইয়া থাকে।

আলু ঃ—ইহা অত্যন্ত লাভজনক কৃষি এবং প্রত্যেক হাট-বাজারের একটা বড়রকমের পণ্যদ্রব্য। আলুর মধ্যে আমাদের শরীরেব বল ও পুষ্টিকারক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সেজন্য ইহা খাদ্য হিসাবেও বড় জিনিস। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে আলুর চাষ কম হইয়া থাকে। তাহা না হইলে সুদূর রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মণ করিয়া আলু আমাদের দেশে আমদানী করিবার কোনই প্রয়োজন হইত না। আমরা জানি কলিকাতা প্রভৃতি

বড় বড় সহরে যত আলু বেচা-কেনা হয় তাহার বৃহদংশই রেঙ্গুনজাত। অথচ প্রায় সকলেরই ধারণা—আলুর চাষ বিশেষ লাভজনক কৃষি। সেইজন্য আলুর চাষের কথা লিখিতে গিয়া আমার বার বারই মনে হইতেছে যে, আসাম ও বাঙ্গালার কৃষক নৈসর্গিক কোন কারণে ফসল নষ্ট হইলে যত সহজে দুর্ভিক্ষের হাতে গিয়া পড়িতে ও ইহার জন্য বেজায় রকমের দুঃখ কষ্ট সহিতে পারে, তেমনি একটু ফুরসৎ পাইলে সমস্ত দুঃখ-দুর্দ্দশার কথাই সে সহজে ভুলিয়াও যাইতে পারে। আমার এইরূপ মনে করিবার কারণ এই যে, বিগত ১৩৩৬ সালের ভয়াবহ জলপ্লাবনের পর খাদ্যাভাবের জ্বালায় জর্জ্জরিত ও নিরুপায় হইয়া বহু লোক আলুর চাষকেই তাহাদের প্রাণে বাঁচিবার প্রধান উপায় করিয়া লইয়াছিল—কেহ কেহ আলু খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছিল, কেহ-বা আলু বেচিয়া জীবিকার সংস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল. ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন! এসব কারণবশতঃ পল্লীবাসী ছোট বড় প্রায় সকলেই আলুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে আলুর চাষও ক্রমে মন্দীভূত হয়। কাজেই ইহার লাভালাভ সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আলুর জমি—আমরা বহু বার পরীক্ষা-স্বরূপ বিভিন্ন প্রণালীতে আলু ফলাইতে গিয়া দেখিয়াছি যে, কঠিন এঁটেল মাটি ব্যতীত প্রায় সব জায়গায়ই আলু অল্প-বিস্তর জন্মিয়া থাকে; বিগত কয় বৎসরের আলুর চাষের বাড়াবাড়ির দ্বারাও ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং এখন আলুর ফলন বৃদ্ধির উপায়ই বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

গভীর কর্ষণ ও উপযুক্ত সারের ব্যবস্থা করা প্রায় সবরকম কন্দমূল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষেই বিশেষ দরকার, একথা বুঝিতে বিশেষ কোন অসুবিধায় পড়িতে হয় না। আলুর জমি সম্বন্ধে ইহা

অধিকতর প্রযোজ্য। জমি প্রস্তুত করিতে হইলে যে কতক বেশী সময় হাতে রাখিয়াই কর্ষণ ও সার ছড়াইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে তাহা স্থানে স্থানে বিস্তৃত ভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহা অনেকেই এখন ধারণা করিয়া লইয়াছেন মনে করি। এখানে আর একটি কথা একটু নূতন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

আলুর চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইলেই আলু গাছের নানা রোগ ও কীটের উপদ্রব এড়াইবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করা বিশেষ দরকার হইয়া পড়ে। ইহার জন্যও আমরা অধিক সময় হাতে রাখিয়া আলুর জমি গভীর কর্ষণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কারণ বার বার গভীর কর্ষণের দ্বারা মাটিতে রোদ বাতাস লাগিবার সুবিধা করিয়া দেওয়া যে ফসলের নানা রোগের বীজাণু ও কীট-পতঙ্গাদির আকর্ষক পদার্থসমূহ ধ্বংস করিবার অন্যতম প্রধান উপায়, ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারই বলিতে হইবে। গভীর কর্ষণের ফলে মাটি যতদূর সম্ভব নির্দ্দোষ হইয়া থাকে। ইহার দরুন আলুগুলি স্বভাব-নিয়মেই তাহাদের আবশ্যক উপাদান প্রচুর পরিমাণে আহরণ করিতে পারিয়া বিশেষ পুষ্ট হইতে পারে। আলুর চাষের লাভ একাধারে আলুর সংখ্যাধিক্য ও বৃহদায়তন হইবার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে, একথা বুঝিতে পারা কঠিন নহে। আর এ সব বহুল পরিমাণে নির্ভর করে মাটির উপাদান-সমূহকে নির্দ্দোষ করিয়া তুলিবার উপর। আলুর জমিতে সময় সময় জল সেচন করিবার বিশেষ দরকার হয়। সেজন্য ঢালু জমি আলুর চাষের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না।

জমি প্রথমে বড় আকারের কাটা কোদাল দিয়া গভীর ভাবে কোদালি করিয়া লইয়া পরে ভাল লাঙ্গল দ্বারা যথারীতি হাল চাষ করিয়া আলু রোপণ করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ফলন দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে যাহা হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী ও অল্পায়াসসাধ্য হয়। কন্দমূল জাতীয় উদ্ভিদের জমি গভীর ভাবে কর্ষিত হইলে তাহারা

মাটি হইতে তাহাদের শরীর-গঠনোপযোগী উপাদান সহজে আহরণ করিতে পারে বলিয়া আলু আকারে বড় হইতে পারে ও আলুর সংখ্যাধিক্য সহজেই হয়।

গভীররূপে কর্ষিত জমি প্রখর রৌদ্রের সময়ও সহসা টানিয়া যাইতে পারে না। ইহার দরুন জল সেচনের প্রয়োজন স্বভাব-নিয়মেই অনেকটা কমিয়া যায়। এসব কথা কর্ষণ অধ্যায়ে বিস্তৃত-ভাবে বলা হইয়াছে। আলুর জমি গভীর করিয়া কর্ষিত হইলে ইহার গাছগুলি একটু অধিক সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, আলুও আকারে বড় হইবার সুযোগ লাভ করে, ইহা বুঝিতে পারা কঠিন নয়।

আলুর জমির সারঃ—সার কোন্‌টা দেওয়া ভাল, ইহা কতকটা চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। আলুর জমিতে অধিক গোময় সার দিলে নানাপ্রকার কীটের উপদ্রব কতকটা ইচ্ছাপূর্ব্বকই সৃষ্টি করা হইয়া থাকে বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অন্য কীট-পতঙ্গাদির বিষয় যাহা হউক, অধিক গোময় সার দেওয়ার ফলে মাটির নীচে এমন একপ্রকার কীটের আবির্ভাব হইয়া থাকে যাহারা আলুর গাত্রে গহ্বর করিয়া ক্ষত-বিক্ষত না করিয়া ছাড়ে না। ইহা আলুর চাষে হতাশ হইবার একটা সঙ্গত কারণ। আলুর জমিতে গোময় সার দেওয়ার অন্যতম দোষ এই যে, কন্দমূল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে অত্যধিক নাইট্রোজেনের ভাগযুক্ত সার দেওয়া ভাল মনে করি না। কারণ তদ্দ্বারা লতাপাতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে বা সারের সমস্ত শক্তি লতা-পাতার পুষ্টি সাধনে ধাইয়া পড়ায় আলু তেমন বড় আকারের হইতে পারে না, সংখ্যায়ও অনেক কম হয়। এই সব কারণবশতঃ আমরা আলুর জমির জন্য গোময় সার স্পর্শও করি না এবং খৈল সারই সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, আলুর জমির পক্ষে রেড়ীর খৈলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। কিন্তু তাহা পাওয়া সর্ব্বত্র সহজ নয় বলিয়া সরিষার খৈলই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

এই খৈল উচিত পরিমাণে এবং যথাসময়ে ব্যবহার করিতে পারিলে ফলন ভালই হইয়া থাকে।

একমাত্র খৈল সারের উপর নির্ভর করিয়া আলু ফলাইতে হইলে বিঘাপ্রতি কমপক্ষে দশ মণ ব্যবহার করা একান্তই উচিত এবং তাহা বীজ বপনের অন্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ পূর্ব্বে জমিতে ছড়ানো প্রয়োজন। খৈল ব্যবহার করিয়া শীঘ্র ফল পাইতে হইলে বা শীঘ্র বীজ বপন করিতে হইলে তাহা ভালরূপ গুঁড়া করিয়া চাষের সময় দুই-তিন স্তরে ছড়াইতে হয়। খৈল খুব তেজস্কর পদার্থ। ইহার মধ্যে মাটিকে শীঘ্র দ্রব করিবার শক্তি আছে বলিয়া মাটিতে স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদ-খাদ্য যাহা থাকে সে সকলকেও শীঘ্র ফুটাইয়া বা কাজের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে। এসব কথা তৃতীয় অধ্যায়ে খৈল সারের গুণ বর্ণনা করিবার সময় বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। খৈলে ঐ সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় আলুর জমিতে দিলে আলু-গুলি বেশ পুষ্ট হইতে পারে।

যাঁহারা ব্যয়বাহুল্য ভাবিয়া আলুর জমিতে খৈল সার ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন, একথা অনায়াসেই বলিতে পারা যায়। কারণ ইহাকে যাঁহারা অতিরিক্ত ব্যয় মনে করিয়া থাকেন তাঁহাদের একথাও বুঝা উচিত যে, ইহা যেমন একটা অতিরিক্ত ব্যয় তেমনি ইহা প্রয়োগ করিলে একটা অতিরিক্ত লাভও পাওয়া গিয়া থাকে, বিনা সারে আলু ফলাইতে গেলে যাহা পাইবার পক্ষে প্রায় দ্বিগুণ জমির দরকার। আমাদের অঞ্চলের জমিতে আলুর ফলন সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহার নিরিখে পাঁচ বিঘা জমির আলু যদি দুই বিঘাতেই পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তিন বিঘা জমির চাষের ব্যয়, খাজনা, বীজ খরচ, গবাদির অত্যাচার হইতে ফসল রক্ষার ব্যয় ইত্যাদি দিয়া যাহা বাঁচিতে পারে, তদ্দ্বারা দুই বিঘা জমির উল্লিখিত সারের খরচ অনায়াসেই চলিতে পারে। এই অবস্থায় উৎপন্নের প্রচলিত হারে যেখানে পাঁচ বিঘা জমিতে এক শত

মণ করিয়া আলু পাওয়া যাইতেছে, ঐ পরিমাণ আলু দুই বিঘাতে পাওয়া গেলে তাহা যে অধিক লাভজনক হইবে ইহা হিসাব করিয়া দেখিবার বিষয়। প্রকৃতপক্ষে আলুর ফলনের উচ্চ হার কত তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। কেহ বলেন—বীজের দশগুণ, কেহ বিশ, কেহ ত্রিশ, চল্লিশ কিংবা তদূর্দ্ধ গুণ। এ সকল কথা সময় সময় কাগজপত্রের মারফত জানা যায়। যিনি যতটা পাইয়াছেন, তিনি ততটা লিখিয়াছেন। ইহা দ্বারা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ আমরা দেখিতেছি, একমাত্র যত্নের তারতম্য ও মাটির উপযোগিতার উপরই আলুর ফলনের হার একই স্থানে আকাশ-পাতাল প্রভেদ হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সেরূপ যত্ন করিতে পারা প্রচুর অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ, যাহা লাভ করিতে হইলে প্রবল আগ্রহ ও অসীম ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। আলু অধিক পাওয়া মানে অধিকসংখ্যক আলু পাওয়া নহে। আলু আকারে যত বড় হইবে, সংখ্যায় কিছু কম হইলেও তাহা ওজনে তত অধিক হইবে। সেরূপ বৃহদাকার আলু পাওয়া একাধারে উপযোগী সার নির্ব্বাচন ও জমির অবস্থা বুঝিয়া ইহার পরিমাণ স্থির করা, গভীর কর্ষণ, জল সেচন ও নিড়ানি বা দাঁড়া বাঁধা ও ইহার প্রত্যেক কার্য্য যথাসময়ে সম্পাদন করিবার উপরই নির্ভর করে।

আলু ভাল পাইতে হইলে জমিতে খৈলের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ ছাই দেওয়া—বিশেষ করিয়া যে মাটি যত অধিক শক্ত, তথায় তত অধিক ছাই ব্যবহার করা ভাল। কন্দমূল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে ছাই সার যে বিশেষ উপযোগী তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

বীজ নির্ব্বাচন :—বীজের দোষগুণের উপর প্রত্যেক জিনিসেরই লাভালাভ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং আলুর বেলায়ও ইহার অন্যথা হইবার উপায় নাই। আবার বিভিন্ন স্থানজাত আলু-

বীজ রোপণের ফল সকল স্থানে একরূপ হয় না বরং যথেষ্ট ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। কোন্ জাতীয় আলুর বপনের ফল যে ভাল হইবে, তাহা যাহারা নানা স্থানে জাত বীজ বপন করিয়া ফলাফল দেখিয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই ভাবে নানা স্থানের বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক পরীক্ষা করিতে পারা সম্ভব নহে। কাজেই যে স্থানে যাহা পাওয়া যায় এবং ইহাদের মধ্যে যাহা ভাল তাহাই বপন করা দরকার। এতদঞ্চলে নাইনিতাল আলু বপনের ফলই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়, ইহা আমরা অনেক বারই ফলাইয়া দেখিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমানে চেরাপুঞ্জি ও শিলঙে জাত আলু এবং দেশী দুই তিন প্রকার আলুর আমদানী বাড়িয়া যাওয়ায় নাইনিতাল আলু সচরাচর পাওয়া যায় না। কাজেই সকলেই দেশী কিংবা শিলঙে জাত আলুই বপন করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল তাহাই দেখিতে হইবে।

দেশী আলু সবই আকারে ছোট। কিন্তু খুব সাংখ্যাধিক্য হয়। এই কারণে ওজন মন্দ হয় না। কিন্তু আকারে ছোট বলিয়া মূল্য কম। এসব কারণে বর্ত্তমানে অধিকাংশ লোকেই শিলঙের আলুই বপন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহার নির্ব্বাচনের দোষ-গুণের উপর ফলনের যথেষ্ট ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। যাঁহারা শিলঙের আলু বপন করাই ভাল মনে করিয়া থাকেন তাঁহাদের সকলে হয়ত অবগত নহেন যে, শিলঙে বৎসরের মধ্যে দুই বার (হেমন্তে ও বর্ষায়) আলু ফলানো হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে হেমন্ত কালের আলু-বপনের ফলই ভাল হয়। আমরা কার্ত্তিক মাসেই আলুর বীজ বপন করিয়া থাকি। ঐ সময়ে শিলঙের আলু যাহা আমদানী হয় তাহার অধিকাংশই বর্ষাকালের ফলানো এবং তাহার বহিরাংশ দেখিয়াই চিনিতে পারা যায়। বর্ষার ফলনো আলুর খোসা টান ও চক্‌চকে, ইহা যেন রসে ভরা এবং দেখিতে নেহাৎ ছোট। এই হেতু ইহা রোপণ করিলে সকলটার গাছ উঠে না এবং যাহা

উঠে তাহাও অনেক দেরিতে অত্যন্ত দুর্ব্বলপ্রকৃতি হইয়া উঠিয়া থাকে। ইহার ফল সর্ব্বদাই নৈরাশ্যজনক হইয়া থাকে। হেমন্ত কালের ফলানো আলু রোপণ সময়ে চামড়া কতকটা মোটা বা কুঞ্চিত হইয়া পড়ে ও চোখের গহ্বরগুলি সুস্পষ্ট এবং কোনটার বা অঙ্কুর উদ্গম হইয়াছে দেখা যায়। বর্ষার ফলানো আলুর তুলনায় ইহা ওজনে অনেক হাল্‌কা। এই জাতীয় মধ্যমাকারের ও লম্বা ধরণের নীরোগ আলুই বীজের পক্ষে ভাল। এই প্রকার আলু—যাহা ২০।২২টায় এক সের ওজন হয়, তাহাই আমরা বপন করিয়া থাকি। আগ্রহ থাকিলে এই প্রকার আলু পাওয়া কঠিন হয় না। বীজের আলু বপনের দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে ঘরের ভিতর মেঝের উপর কতক বালি বিছাইয়া তদুপরি ছড়াইয়া রাখিয়া দিলে স্বভাবনিয়মেই তাহা কতকটা অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে ও এই কারণে রোপণের পর শীঘ্র গাছ উঠিয়া থাকে এবং তাহা পচিবার সুযোগ পায় না।

বীজ বপনঃ—জমি প্রস্তুতের কাজ শেষ করিয়াই আলু বপন করিতে হইবে। অনেক সময় এমন হয় যে, ঋতুর অনুরোধে বা চারা রোপণের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া জমি প্রস্তুতের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই কোন কোন জাতীয় চারা রোপণ করিতে বাধ্য হইতে হয় এবং পরে ঘন ঘন নিড়ানি দিয়া জমি প্রস্তুতের অসম্পূর্ণতা দোষ সারিয়া লইতে পারা যায় ও লইতে হয়। আলু বপনের কার্য্যে সেরূপ কোন ব্যবস্থা না হওয়াই সঙ্গত। কারণ আলুর গাছের জীবন মাত্র তিন মাসকাল স্থায়ী হয় ও ইহার মধ্যেই আলু ধরিয়া যা-কিছু বড় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় তাহাদের খাদ্য-উপাদানকে ঠিক ঠিক উপযোগী করিয়া লইবার জন্য বীজ বপনের পরেও প্রতীক্ষা করিতে হইলে আলু ধরিতে দেরি হইয়া পড়িবে। কাজেই তাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিবে না। ইহা বিবেচনা করিয়াই আলুর জমি প্রস্তুতের কার্য্যে কতক বেশী সময়

হাতে রাখিয়া প্রবৃত্ত হওয়া এবং ইহার প্রত্যেক কাজ যথারীতি সম্পাদন করা উচিত।

জমি ঠিক ঠিক প্রস্তুত হইলে পাঁচ পোয়া হাত দূরে দূরে লাঙ্গল টানিয়া পালটের মধ্যে এক ফুট অন্তর এক একটি করিয়া বীজ আলু রাখিয়া পালটের উপরের মাটি হাতে টানিয়া সমান করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য ;

দাঁড়া-বাঁধা ও জলসেচন :—আলুর চারা উঠিয়া ৫।৬ ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হইলে সবটা জমিতে এক বার প্রচুর জলসেচন করিয়া ২।৩ দিন পরে মাটিতে যো হইয়াছে দেখিলেই প্রত্যেক দুই সারির মধ্যে ঈষৎ গভীরভাবে লাঙ্গল টানিয়া দুই ধারের মাটি হাতে টানিয়া অনতিউচ্চ দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। আমরা প্রথম বারের এই লাঙ্গল টানার কাজে লাঙ্গলের পরিবর্ত্তে 'গার্ডেনিং কাল্‌টিভেটার'* নামক হাত-লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাতে সবটা জায়গার মাটিই কতক খুঁড়িয়া চাপ ভাঙ্গিয়া দিবার অত্যন্ত সুবিধা হয়, অতি অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে মাটি বেশ ঝরঝরে করিয়া লইতে পারা যায় এবং দাঁড়া বাঁধিবার সময় চারাগুলির সুখসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাটি ধরাইয়া দেওয়া সহজ হয়। বীজ বপনের সময় হইতে এই পর্য্যন্ত কাজে কমিবেশী এক মাস লাগিয়া যায়। ইহার পর যখন দেখা যাইবে যে গাছগুলি লতাইয়া দাঁড়ার বাহিরের খাদের মধ্যে গিয়া এলোমেলো হইয়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন আবার জলসেচন করিয়া মাটিতে যো হইলে গভীরভাবে লাঙ্গল টানিয়া দুই পার্শ্বের ঝরা মাটি হাতে করিয়া তুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া তুলিবার সময় প্রত্যেক চারার মাথায় কিয়দংশ আন্দাজমত কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। আলু গাছের

---

* গার্ডেনিং কালটিভেটারের (Gardening Cultivator) চিত্র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

মাথা কাটিয়া-ছাঁটিয়া দেওয়ার কথা যাহা বলা হইল, তাহা না করিলে সার-মাটির সমস্ত শক্তি লতাপাতার বৃদ্ধিশীলতার দিকে ধাইয়া পড়ায় লতাপাতা খুব বাড়িতে থাকে। এই কারণে আলু আকারে ক্ষুদ্র ও সংখ্যায় কম হওয়া স্বাভাবিক হয়। কথিত সময়ে লতার মাথা ছাঁটিয়া ফেলিলে গাছ লম্বা না হইয়া মোটা হইতে থাকে ও তাহাতে ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা হইয়া গাছ বেশ ঝাঁকালো হইয়া উঠে, তখন দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আলুর ফলন ভালই হইবে

আলু রোপণের পর কিঞ্চিদধিক দুই মাস গত হইলে পশ্চিমাঞ্চলের আলু চাষীরা এক বার হাতে করিয়া আলু গাছের গোড়ার মাটি খুব সতর্কতার সহিত খুঁড়িয়া বড় বড় আলুগুলি পাড়িয়া লইয়া তখন তখনই আবার মাটি ঠিক করে এবং দুই তিন দিন গত হইলে পুনরায় জলসেচন করিয়া মাটিতে যো হইলে লাঙ্গল টানিয়া দাঁড়া ঠিক করিয়া দেয়। এইরূপ করিলে নেহাৎ ছোট আলু যাহা থাকিয়া যায় তাহাও অধিক পুষ্ট হইতে থাকে। ইহা আলুর ফলন বৃদ্ধি করিবার অন্যতম উপায় তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু আমাদের অঞ্চলে সেরূপ করিতে গেলে প্রকৃতিই তাহাতে বাধা জন্মাইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে আমাদের অঞ্চলের মত অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এই কারণবশতঃ সে-সব স্থানে আমাদের অনেক আগে আলু রোপণ করিতে পারা যায় ও যত্নের দ্বারা গাছগুলিকে দীর্ঘজীবী করিয়া লইতে পারে। এইভাবে দীর্ঘজীবী করিয়া তোলা গাছের শক্তি ও সময়ের সচ্ছলতার উপরই নির্ভর করে। গাছের বৃদ্ধিশীলতা বন্ধ হইয়া যখন একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে তখন একসঙ্গে সমস্ত আলুই তুলিয়া ফেলিতে হয়।

সরিষা :—রবিশস্যাদির মধ্যে ইহার প্রাধান্য সামান্য নহে। ইহা তিন প্রকার। লাল রঙের সরিষায় প্রচুর তৈল হয়, কৃষকদের

ভাষায় ইহা লেংরি সরিষা বলিয়া অভিহিত। লাল রঙের অপর এক জাতীয় সরিষার চাষ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানের চাষীরা ফলাইয়া থাকে। কার্ত্তিক মাসে নদীর জল কমিতে আরম্ভ করিলেই তাহা ছিটাইয়া বপন করে। ইহাকে ছিটা বা আছেরা সরিষা বলা হইয়া থাকে। ইহার তৈল লেংরি সরিষার ৳ আন্দাজ হয়। অপর প্রকার সরিষা সাদা বা পীত রং বিশিষ্ট। ইহার দ্বারাও তৈল হয়। সাধারণতঃ তরিতরকারিতে খাইবার জন্যই ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, সরিষার চাষে কৃষকদিগের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। এই কারণে খাঁটি সরিষার তৈল ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া হইয়া উঠিতেছে। এই ফসলের বড় শত্রু এক জাতীয় পোকা। পোকায় সরিষা ফসলের বড় ক্ষতি করে বলিয়াই ইহার চাষে চাষীরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। আমার মতে যথাসময় বীজ বপন করিতে না যাওয়াই পোকায় কাটিবার এক কারণ। সচরাচর দেখা যায় যে, কার্ত্তিকের প্রথম ভাগে যে বীজ বপন করা হয়, তাহার ফসল ক্বচিৎ পোকায় নষ্ট করে। কিন্তু দেশের কৃষকগণ অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত সরিষার বীজ বপন করে এবং ইহাতে পোকার উপদ্রব বেশী ঘটে। আমরা জানি হালের গরুর অকর্ম্মণ্যতা বা অল্পতাবশতঃ অধিকাংশ কৃষকই যথাসময়ে যথারীতি জমিতে চাষ দিতে পারে না এবং যাহা দেয় তাহাও পরবর্ত্তী নালিয়া ইত্যাদি ফসলের উপকারার্থেই দিয়া থাকে।

সরিষা বড় সুখী জাতীয় ফসল। ইহার জমি কতক সময় হাতে রাখিয়াই চাষ করা ও যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার দিয়া প্রস্তুত করা দরকার। জমি যথারীতি তৈরি হইলে বিঘা প্রতি আড়াই সের বীজ ছিটাইয়া বপন করতঃ সঙ্গে সঙ্গে একবার চাষ ও পরে মৈ দিয়া রাখিতে হইবে। পরে এক দিন বিশ্রাম দিয়া আবার চাষ-মৈ দিলেই কাজ হইল। তারপর ফসল না তোলা পর্য্যন্ত গরু-ছাগলের অত্যাচার হইতে ফসল রক্ষা করাই একমাত্র

কাজ। ফলন ভাল হইলে বিঘা প্রতি চারি মণ হিসাবে হইয়া থাকে।

রাই-সরিষা ঃ-- ইহাও সরিষার মত এক সময়েই বপন করিতে হয়। চাষ করিবার রীতি সরিষারই মত। ইহা হইতেও ভাল তৈল হয়। বিঘা প্রতি সওয়া সের বীজ লাগে। কারণ ইহার গাছ সরিষা অপেক্ষা বড় ও ডালপালাযুক্ত হয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। ইহার ফলন ভাল হইলে সরিষা অপেক্ষাও অধিক হারে ফসল পাওয়া যায়।

লঙ্কা মরিচ ঃ--লঙ্কা মরিচ প্রত্যেক বাজার বন্দরের একটি অপরিহার্য্য রকমের পণ্যদ্রব্য এবং ইহার চাষেও বিশেষ লাভ আছে। লঙ্কার ফলন ভাল হইলে একবিঘা জমিতে ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। লঙ্কার নানা জাতি, তদনুসারে ইহার মূল্য প্রতিমণ কোন কালেই ৮।১০ হইতে ১৫।২০ টাকার বড় কম হয় না। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একবার ভাল লঙ্কার মূল্য প্রতিমণ ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

লঙ্কা মরিচ চাষের সাফল্য মাটির উপযোগিতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। অধিক এঁটেলের ভাগ যুক্ত দোআঁশ মাটি যাহা স্বভাবতঃই খুব উর্ব্বরা এবং আমার বোধ হয় যে-মাটিতে লোহা প্রভৃতি খনিজ পদার্থের ভাগ অধিক সে-সব স্থানেই লঙ্কার গাছ ও ফলন সামান্য যত্নেই ভাল হইয়া থাকে। নিরেট বেলে মাটিতে প্রচুর সার দিয়া বিশেষ যত্ন করিলেও ফলন সেরূপ ভাল হয় না। বার বার মরিচ চাষের পরীক্ষা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, মাটি উপযোগী না হইলে তাহা না করাই উচিত অথবা পরীক্ষা না করিয়া লঙ্কার বিস্তৃত চাষে প্রবৃত্ত না হওয়াই সঙ্গত। অনুপযোগী মাটিতে লঙ্কার চাষ করিলে তাহাতে ঝাল কম হয়। লঙ্কার মূল্য ইহার ঝালের তীক্ষ্ণতার অনুপাতেই অবধারিত হইয়া থাকে। কাজেই স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

স্থান ও ঋতুর অবস্থা বিবেচনায় ভাদ্র হইতে সারা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত লঙ্কার চারা রোপণ করিতে পারা যায়। জমি ৪।৫ বার ভালভাবে চাষ-মৈ দিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। আমাদের অঞ্চলের লঙ্কা-চাষীরা বীজতলায় চারা করিয়া ৩।৪ অঙ্গুলী লম্বা হইলে জমিতে নিয়া সারিবন্দী করিয়া রোপণ করে ও সারা মরসুমের মধ্যে দুই-তিনবার নিড়ানি দিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়া বাঁধিয়া দেয়। লঙ্কার জমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইলে গাছ সহজেই নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও মরিয়া যায়। কাজেই বৃষ্টি-প্রবণ স্থানে লঙ্কার চাষ করিতে হইলে দাঁড়া বাঁধা ও চারি ধারের পয়ঃপ্রণালী দুরস্ত রাখা বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার। পাটনা অঞ্চল ভাল লঙ্কার জন্য প্রসিদ্ধ। তথায় দেখিয়াছি, চাষীরা লঙ্কার বীজ উত্তম কর্ষিত জমির উপর ছিটাইয়া বপন করতঃ সঙ্গে সঙ্গে আর একবার চাষ-মৈ দিয়া রাখিয়া দেয় এবং চারা উঠিয়া তিন-চারি ইঞ্চি লম্বা হইলে নিড়ানি দেয় ও নিড়ানি দিবার সময় চারার ঘনতা ভাঙ্গিয়া ও গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়াই কাজ শেষ করে।

বীজ সম্বন্ধে সাবধানতা:—বীজের জন্য যে-সব লঙ্কা রাখিতে হইবে তাহা উত্তম পরিপক্ক হওয়া এবং গাছ হইতে পাড়িয়াই রোদে দিয়া ভালমত শুকাইয়া আস্ত রাখিয়া দিতে হইবে। লঙ্কাচাষীদের মধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার আছে যে, বীজ বপনের অধিক পূর্ব্বে তাহা খোসার ভিতর হইতে বাহির করিয়া রাখিয়া দিলে ঐ বীজের গাছে ফলন কম হয়। সেজন্য তাহারা বীজ তলায় ফেলিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খোসা ছাড়াইয়া লয়।

শকরকন্দ:—স্থানে স্থানে ইহাকে মিঠা আলু বলা হইয়া থাকে। ইহা সাদা লাল দুই প্রকার। ইহা অতিশয় লাভজনক কৃষি। যত্নের সহিত ফলাইতে পারিলে এক বিঘা জমিতে ৭০।৮০ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা গরীবের প্রাণ-রক্ষক এবং দুর্ভিক্ষের সময় বহুলোকের খাদ্যাভাব মিটাইবার এক প্রধান উপকরণ।

সেজন্য ইহার চাষের বাহুল্য বড় কম নহে। নদী-চরের পলিপড়া জমিতেই শকরকন্দ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয় ও অল্পায়াসেই হইয়া থাকে। সেই জন্য নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের চাষীরাই ইহার চাষ অধিক ভাবে করিয়া থাকে। মেঘনা ও পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানের চাষীদের শকরকন্দ একটি প্রধান চাষের দ্রব্য। শকরকন্দ ও ইহার লতাপাতা গরুর অত্যন্ত প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা খাইলে গাভীগণের দুধের জোর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়িয়া থাকে। প্রয়োজনের এই গুরুত্ববোধে ইহার চাষ চাষীমাত্রেরই অল্পবিস্তর করা উচিত মনে হয়। কারণ শকরকন্দ ফলাইয়া ঘরে সঞ্চিত করিয়া রাখিলে তদ্দ্বারা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত গো-খাদ্যের অভাব মিটানো সহজ হয়; অথচ গো-শরীরও ইহাতে বেশ ভাল থাকিতে পারে।

শকরকন্দের লতা দ্বারাই চারা রোপণ করিতে হয়। বর্ষাকালে যে-স্থান জলমগ্ন হয় না, এইরূপ স্থানে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সামান্য চাষ-মৈ দিয়া ৩।৪ হাত দূরে দূরে আস্ত কন্দ পুঁতিয়া রাখিলে তাহা হইতে গাছ ফুটিয়া বাহির হয়। সে-সব এক ফুট আন্দাজ লম্বা হইলে নিড়ানি দিয়া গোড়ায় কতক মাটি ধরাইয়া দিলে কিছুদিন যাইতে না যাইতে সেই গাছ লতাইয়া সমস্ত স্থান ছাইয়া ফেলে ও ইহার প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হয়। ঐ লতাই যথা-সময়ে শিকড়সমেত উঠাইয়া প্রত্যেক গ্রন্থি মাঝে রাখিয়া কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করত এক একটি করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া রোপণ করিতে হয়। সেই গ্রন্থি হইতে শিকড় বাহির হইয়া মাটিতে লাগিয়া যায় ও তাহা হইতে নূতন লতার উদ্গম হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিকড় যাহা বাহির হয় তাহাই সময়ে কন্দে পরিণত হইয়া থাকে। দুই কাঠা পরিমাণ জায়গায় আস্ত কন্দ পুঁতিলে যে লতা বাহির হয় তদ্দ্বারা এক বিঘারও অধিক জমির চারা রোপণের কাজ চলে।

কার্ত্তিক মাসই জমিতে চারা রোপণের সময়। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে জমিতে ক্রমাগত চারি-পাঁচ বার চাষ-মৈ দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া দরকার। ইহার পর সওয়া হাত দূরে লাঙ্গল টানিয়া উপরোক্ত নিয়মে কর্ত্তিত লতার টুকরা এক ফুট দূরে দূরে এক একটি করিয়া লাঙ্গলের পালটের মধ্যে বসাইয়া পার্শ্বের মাটি হাতে টানিয়া সমান করিয়া চাপিয়া দিলেই চলে। তাহা হইতে নূতন লতা বাহির হইয়া যখন এক ফুট আন্দাজ লম্বা হয়, তখন দুই সারির মধ্যে লাঙ্গল টানিয়া অনতিউচ্চ দাঁড়া বাঁধিয়া হাতে করিয়া লতার গোড়ার মাটি ধরাইয়া দিতে হয়। এই পর্য্যন্ত কাজ হইতে সারা পৌষ মাসই লাগিয়া থাকে। ইহার পর যখন দেখা যাইবে যে, লতা লম্বা হইয়া দাঁড়ার বাহিরে নীচে যাইয়া পড়িতেছে, তখন পুনরায় অপেক্ষাকৃত গভীর ভাবে লাঙ্গল টানিয়া পরে মাটি হাতে টানিয়া লতার গোড়ার গ্রন্থিগুলি ভালরূপ ঢাকিয়া ও দাঁড়া অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার করিয়া দিলেই হইল। ইহার পর কন্দ না তোলা পর্য্যন্ত গবাদি হইতে রক্ষা করাই প্রধান কাজ। ইহার পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন দেখা যাইবে যে গাছগুলি আপনা হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, তখন কন্দ তুলিয়া বিক্রয় করিতে হয়। কন্দ তুলিবার কালে লতা-পাতা যাহা বাদ দেওয়া যায়, তাহা গরুকে খাইতে দিলে তাহাদিগকে অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে দৃশ্য বড়ই আনন্দ-দায়ক হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাক-সব্‌জী

শাক-সব্‌জী প্রায় সকল মানুষেরই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য। ব্যবসায়ের দিক দিয়া শাক-সব্‌জীর উৎপাদন লাভের জিনিষ। শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের চাষীদের কাহারও কাহারও একমাত্র শাক-সব্‌জী উৎপাদনই প্রধান চাষের কাজ এবং তাহা করিয়া অনেকে বেশ সচ্ছল অবস্থায় দিন যাপন করিতে পারিতেছে। অভিজ্ঞতা থাকিলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বসতবাড়ীর উপরে প্রয়োজনীয় তরিতরকারী ও নিত্য নূতন শাক-সব্‌জী ফলাইয়া নিজে খাইয়া ও বিলাইয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারে। সে-সব করিতে হইলে যার যার প্রয়োজন মত দুই-চারি কাঠা ভাল জায়গা নির্ব্বাচন করিয়া শক্ত বেড়া দিয়া গরু-ছাগলের প্রবেশাধিকার বন্ধ করিয়া লওয়াই প্রথম কাজ।

স্থান-নির্ব্বাচন ঃ—শাক-সব্‌জীর কতকগুলি গাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী (যেমন বারমেসে লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদি), কতকগুলি মরসুমী ও কতকগুলি লতানে, যেমন লাউ, কুমড়া, বেগুন ইত্যাদি। ইহাদের জাতি ও শ্রেণী অনুসারে কোন্‌টা কোন স্থানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে, তাহা অগ্রেই স্থির করিয়া লইয়া যাহার পক্ষে যে-সার উপযোগী সে-স্থানে সে-সব সার দিয়া জমি প্রস্তুত করা উচিত। কেননা, কোন এক জাতীয় সার সকল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে সমান ফলপ্রদ নহে, ইহা সার অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। কোন স্থানের মাটি কোন কোন সব্‌জীবিশেষের চাষের পক্ষে অনুকূল না হইলে অন্য স্থান হইতে ভাল মাটি কাটাইয়া আনিয়া মাটির দোষ দূর করাই এ কাজে কৃতকার্য্য

হইবার প্রধান উপায়। আমরা ইহাতে পুরাতন পুষ্করিণীর তলার মাটি (পঙ্ক) অধিক ব্যবহার করিয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা আশাতীত ফল পাইয়াছি ও পাইতেছি। অতি নীরস জমির উপরও চারি ইঞ্চি আন্দাজ পুরু করিয়া একবার পঙ্ক দিয়া লইলে, ক্রমাগত পাঁচ-সাত বৎসর পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রায় সবরকম শাক-সব্জীই ফলানো যায়।

সব্জীবাগ মধ্যে বৃষ্টিজল বসিতে দেওয়া অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইহার জন্য বৃষ্টির সূচনাতেই জল নিষ্কাশনের জন্য আবশ্যক নালা-নর্দ্দমা ঠিক করিয়া লওয়া বিশেষ দরকার। নীরস জমিতে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু পঙ্ক দিয়া লইলে বাগ মধ্যে বৃষ্টির জল বসিবার আশঙ্কাও কতিপয় বৎসরের জন্য দূর হইয়া থাকে। বাগের উচ্চ স্থানে অধিক কাল স্থায়ী গাছগুলি বসাইবার ব্যবস্থা করাই সঙ্গত। সে-সব গাছ নীচু দিকে বসাইলে নালা-নর্দ্দমা খুব ঠিক থাকিলেও জলের ঝোঁক নীচের দিকে থাকা স্বাভাবিক বলিয়া গাছের উন্নতির পথে বাধা জন্মাইয়া থাকে। যে-সকল লতানে গাছে উচ্চ মাচা অথবা অন্য প্রকার আশ্রয় করিয়া দিবার দরকার হয়, তাহা বাগের উত্তর দিকে হওয়া উচিত। অন্যান্য দিকে বসাইলে সেই সকল গাছের ছায়াতে অনেক স্থান অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে এবং ছায়াতে কিছু করিতে গেলেও তাহা প্রায় হয় না।

জমি প্রস্তুত ঃ -শাক-সব্জীর জমি বারমেসে হওয়াই উচিত। সেরূপ জমিতে সর্ব্বপ্রকার শাক-সব্জীই সহজে ফলিতে পারে, আর বারমেসে জমির শাক-সব্জী খাইতেও ভাল। একবার কোন শাক-সব্জী ফলাইয়া জমি ফেলিয়া রাখিলে পূর্ব্বে দেওয়া সারের বল পাইয়া তাহাতে ঘাস-জঙ্গল দ্রুত গজাইয়া উঠিয়া জমির বল একেবারে নিঃশেষ করিয়া দেয়। কাজেই তথায় আবার কোন জিনিষ ফলাইতে হইলে স্বভাব-নিয়মেই শ্রম, সময় এবং সারের অধিক প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ করিয়াও অনেক ক্ষেত্রে

সকল জিনিষ ঠিক সময়ে ফলাইতে পারা যায় না। জমিখানা বারমেসে করিয়া লওয়াই উল্লিখিত অসুবিধা সমূহ দূর করিবার প্রধান উপায়। সার ও কর্ষণ অধ্যায়ে সে-সবের ব্যবহার-প্রণালী যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা পালন করিয়া একবার শাক-সব্জী ফলাইলেও যখন ইহার যে অংশের উৎপন্ন জিনিষ শেষ হয়, সেই অংশটা তখন তখনই কোদালি করিয়া এবং আবশ্যকমত কতক সার দিয়া রাখিতে পারিলে তথায় ঋতু অনুসারে সকল জাতীয় শাক-সব্জী ফলানোই অত্যন্ত সহজ হয়।

হাপোর বা বীজতলাঃ—বারমাসের শাক-সব্জী ফলাইতে হইলে ইহাদের চারা করিবার জন্য স্বতন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক ; প্রচলিত ভাষায় ইহাকে বীজতলা বা হাপোর (nursery) বলা হয়। ঐ স্থানটিও বারমেসে জমি করিয়া লওয়া বিশেষ দরকার। প্রত্যেক বারই নূতন ভাবে জায়গা প্রস্তুত করিয়া চারা করিতে গেলে সময় ও শ্রম বেশী লাগে এবং তাহা করিয়াও প্রাকৃতিক নানা বাধাবিঘ্ন বশতঃ সব চারা যথাসময়ে করিতে পারা যায় না। ইহা ছাড়া একটা নূতন স্থান তৈরি করিয়াই ঋতুর অনুরোধে তাহাতে শীঘ্র চারা করিতে গেলে সাধারণতঃ পিপীলিকা ইত্যাদির উপদ্রব হেতু সকলই নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। এই কারণে স্থায়ী বীজতলা করিয়া ইহার মাটি যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ নির্ম্মল করিয়া লইতে পারা যায়. তাহার জন্য তৎপর হওয়া প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, বীজতলার মাটির গুণাগুণের উপরই চারার সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এবং চারার উৎকর্ষের উপর ভবিষ্যতের ফল অনেকটাই অবধারিত হইয়া থাকে। একবার একটা স্থায়ী ভাল বীজতলা করিয়া লইতে পারিলে তাহাতে সকল ঋতুরই আবশ্যক চারা স্বল্পায়াসে করিতে পারা যায়। বীজতলা প্রয়োজন মত ছোট বড় করিতে হয়। ইহাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়া নানা জাতীয় চারা একসঙ্গে করা যাইতে পারে ও তাহা

করিতেই হয়। যে-স্থানে বৃষ্টির জল দাঁড়াইতে না পারে ও সারাদিন রোদ বাতাস পাইবার সুবিধা হয় এরূপ স্থানে বীজতলা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

বীজতলার মাটি বেশীর ভাগ বালি-সংযুক্ত দোআঁশ ও কাঁকর-শূন্য হওয়া দরকার। মাটিতে খোলামকুচি থাকিলে চারার তদ্বির ও তাহা উত্তোলন করিবার সময় অনেক চারা ইহার সংঘর্ষে নষ্ট হইয়া যায়। সকল স্থানের মাটি বীজতলার উপযোগী হয় না। সেজন্য অনেক সময় পৃথক্ স্থান হইতে উপযোগী মাটি আনিয়া বীজতলা তৈরি করিতে হয়। পৃথক্ স্থান হইতে মাটি আনিয়া একটা খোলা জায়গায় রাখিতে হইবে। তাহাতে যত্নে-রক্ষিত খুব সামান্য পরিমাণ পচা গোময় ও কিঞ্চিৎ খৈলের সূক্ষ্ম গুঁড়া একত্রে মিলাইয়া ছড়াইয়া রাখিয়া দিতে হইবে ও দুই-তিন দিন পর পর একবার উলট-পালট করিয়া তাহাতে রোদ বাতাস কুয়াশা লাগিতে দিতে হইবে। এই সারসংযুক্ত মাটি যখন আপনা হইতে খুব হালকা ও ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া যাইবে, তখন ইহা এক পোয়া বর্গ-ইঞ্চি ছিদ্রবিশিষ্ট চালনি দ্বারা চালনি করিয়া লওয়া আবশ্যক। এইভাবে মাটি প্রস্তুত করিতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বীজতলার জন্য। নির্দ্দিষ্ট স্থানও ঘন ঘন কোদালি করিতে হইবে। এই স্থান ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া গেলে সমান' করিয়া চালুনি করা মাটি তথায় নিয়া পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করতঃ বিছাইয়া ইহার কিনারাগুলি কতক এঁটেলের ভাগযুক্ত মাটি দ্বারা বাঁধিয়া পিটিয়া শক্ত করিয়া লওয়া দরকার। তাহা না করিলে মধ্যস্থানের চালুনি করা মাটি সহজেই ছড়াইয়া পড়িতে পারে এবং প্রখর রৌদ্রের দিনে অধিক জলসেচন করিয়াও বীজতলার সরসতা রক্ষা করা কঠিন হয়।

বীজতলায় সারের পরিমাণ :—বীজতলার মাটিতে গোময়, খৈল ইত্যাদি দিবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে তাহা যেন সব্‌জীবাগে যে-হারে খৈল গোময় ইত্যাদি দেওয়া

হয় সেই হারের অর্দ্ধেকের অধিক না হয়। কারণ অধিক বলযুক্ত স্থানের কোন চারা লইয়া কম বলের স্থানে বসাইলে তাহা স্বভাবতঃই নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং এই কারণে কোন কোন চারা বাঁচানো অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। তাছাড়া অধিক বলের জায়গায় চারা করিতে গেলে সে-সব সহজেই লম্বা হইয়া লতাইয়া পড়ে, যাহা তাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশার প্রধান কারণ হয়। এহেন বীজতলার মাটিতে সামান্য পরিমাণ গোময় ও খৈলের গুঁড়া ব্যবহার করিবার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। চারাকে নীরোগ, পুষ্ট ও কষ্টসহিষ্ণু করিয়া লইবার জন্য বীজতলার মাটির উৎকর্ষ-সাধনের উপায় – দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া মাটি প্রস্তুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ও বার মাসের মধ্যে কোন সময়েই তথায় ঘাস বা আগাছা অঙ্কুরিত হইতে না দেওয়া।

যার যার নিজ প্রয়োজন মত সব্জী চারা উৎপাদন করিবার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ বর্গফুট বীজতলা করিলেই বেশ কাজ চলে। ঐস্থানে বৃষ্টির জল ও প্রখর রৌদ্রের তাপ হইতে চারা রক্ষার জন্য দোচালা ঘরের আকারে অর্থাৎ তিন সারি বাঁশের ছোট খুঁটি পুতিয়া ও মধ্যের সারি দুই তিন ইঞ্চি উচ্চ করিয়া তদুপরি মারুলের আকারে তিনটি বাঁশ আঁটিয়া লওয়া দরকার, যেন আবশ্যকমত ঐস্থান দরমা ইত্যাদি দ্বারা খুব শীঘ্র আচ্ছাদিত করিয়া লওয়া যায়, এবং প্রয়োজন সাধনের পর উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এক বার চারা তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তথায় পুনরায় কোন বীজ বপন করা দরকার হইলে ইহার মাটির শোধনের জন্য ক্রমাগত তিন-চারি দিন ঘন ঘন কোদালি করিয়া রোদ-বাতাস লাগাইয়া লওয়া বিশেষ দরকার। বার বার চারা করিলে মাটির বল কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক, কাজেই চারা মনোমত হইতে পারে না। সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেলে বিশ্রাম সময়ে আবশ্যক মত সামান্য পরিমাণ পচা গোময় ও খৈলের গুঁড়া মিলাইয়া লওয়া উচিত। এই প্রকার যত্নে রক্ষিত

বীজতলা প্রায় সব রকম সব্‌জী ও মরসুমী ফুলের চারা প্রস্তুতের পক্ষে খুব উপযোগী হইয়া থাকে।

যন্ত্রাদি—কাজের শ্রম, সময় এবং ব্যয়বাহুল্য কমাইয়া কাজ ভাল করিতে পারা যন্ত্রাদির উৎকর্ষ ও উপযোগিতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে একথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সব্‌জী-বাগ করিয়া অল্পায়াসে কৃতকার্য্য হইতে হইলে ভাল কোদাল, ছোট বড় কাটা কোদাল, হাত-লাঙ্গল (gardening cultivator), একাধিক রকমের খুরপি, কাটা খুরপি (hand fork) ও জলসেচনের একাধিক রকমের ঝাঁজরি (watering can) ইত্যাদি রাখা খুবই দরকার।* যে-সকল সব্‌জীর জমি গভীর কোদালি করা আবশ্যক তথায় বৃহদাকারের কাটা কোদাল না হইলে অধিক সময় ও শ্রম ব্যয় করিয়াও আবশ্যকমত গভীর কোদালি করিতে পারা যায় না। জলসেচনের কাজে ঝাঁজরি না হইলে অনেক সময় লাগাইয়াও ভালমত জল দিতে পারা যায় না এবং কচি চারার উপর অন্য উপায়ে জল দিতে গেলে তাহা চারার অনিষ্টের বা মৃত্যুর কারণ হয়। আবার বীজতলায় বা গামলার মধ্যে বপন করা বীজের উপর উত্তমরূপে জল সেচন করিতে হইলে যে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ঝাঁজরি ব্যবহার করা দরকার, তাহা আপনা হইতেই অনুভূত হইয়া থাকে। সব্‌জীবাগ রচনায় প্রবৃত্ত হইলে এইরূপ প্রত্যেকটি কাজের জন্য বিশেষ যন্ত্রের আবশ্যকতা অনুভূত হইবে। কাজের সুবিধা বা উৎকর্ষ সাধনের আকাঙ্ক্ষাই বস্তুতঃ কৃষি-যন্ত্রাদির উৎকর্ষের ও নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবনের উৎস। কৃষিপ্রগতি ক্ষীণগতি হইলে কৃষি-যন্ত্রাদির অপকর্ষ ঘটে, উদ্ভাবনী শক্তিও শিথিল হইয়া যায়।

* কৃষি-যন্ত্রাদির চিত্র ও ব্যবহার প্রণালী দ্রষ্টব্য

বাঁধাকপি

কপিচাষের সময় নির্ণয়ঃ—স্থানের প্রকৃতিগত অবস্থা অর্থাৎ শীত বাত বৃষ্টির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়া ঠিক সময়ে কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার উপরই প্রধানতঃ শাক-সব্জী-চাষের সাফল্য নির্ভর করে। কপি ইত্যাদি বিজাতীয় সব্জী চাষের বেলাই এই সকল বিষয়ের উপর বেশী নজর দেওয়া দরকার। দেখা যায়, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে যে-সময়ে কপির চারা রোপণ করা হয়, ঠিক সেই সময়ে শ্রীহট্ট ও পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে তাহা করিতে গেলে বৃষ্টি-বাদলার আতিশয্যই কপি-চাষের প্রধান অন্তরায় হইয়া থাকে। আবার পশ্চিমবঙ্গে যে-সময় কপির চারা রোপণের পক্ষে উপযোগী, সেই সময়ে শিলং অঞ্চলে তাহা করিতে গেলে দারুণ শীতই তাহাতে বাধা জন্মাইয়া থাকে। শেষোক্ত স্থলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসই কপির চারা রোপণের ঠিক সময় এবং শ্রাবণ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত তাহা বেচা-কেনা হইয়া থাকে। এই সময়ে অন্যান্য অঞ্চলে ইহা খুবই দুর্লভ। প্রকৃতির এই সকল প্রভেদ বা লীলাবৈচিত্র্য দেখিয়া চাষবাসের কাজে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতির আনুকূল্য লাভের উপায়ই সর্ব্বাগ্রে খুঁজিতে হইবে।

কপির মাটিঃ—প্রায় সবরকম মাটিতেই কপি অল্পবিস্তর জন্মিয়া থাকে, সেজন্য মাটির দোষগুণ বিচার না করিয়াই অনেকে কপির চাষে প্রবৃত্ত হয়। এই কারণে সকল জায়গার কপি খাইতে একরূপ সুস্বাদু হয় না এবং আকার ও সৌন্দর্য্যের মধ্যেও যথেষ্ট ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। অযোগ্য সার ব্যবহার এই প্রভেদের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহা পশ্চাৎ যথাস্থানে বলিব। ভাল কপি পাইতে হইলে যথাযোগ্য মাটি ও সার নির্ব্বাচনে বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া দরকার। যাঁহারা দুই-চারি শত কপির চারা রোপণ করিবেন তাঁহাদের পক্ষে কিছু দূর হইতে উপযোগী মাটি

কাটাইয়া আনিয়া ভাল মাটির অভাব দূর করিয়া লওয়াই উচিত। একবার মাত্র ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া নূতন মাটি বিছাইয়া লইলে কতিপয় বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। আমরা এই উপায় অবলম্বনে নীরস জমিতে উৎপন্ন কপির স্বাদ, সৌন্দর্য্য ও আকারের আশ্চর্য্য রকমের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিয়াছি।

অধিক এঁটেলের ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটিই বাঁধাকপির চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে-স্থানে তাহা পাইবার উপায় নাই, তথায় পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক আনিয়া ভাল মাটির অভাব অনেকটা দূর করিতে পারা যায় এবং ইহার ফল ভালই হইয়া থাকে। পঙ্কের মধ্যে অনেক ভাল উপাদানের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে, তাহা সার অধ্যায়ে একবার বলা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহা স্মরণ রাখা দরকার।

কপির সারঃ-গোময়ই এতদঞ্চলের প্রচলিত সার এবং তাহা দিয়াই অধিকাংশ লোকে কপি ফলাইয়া থাকে। কারণ তাহাতে পয়সা খরচ হয় না। অন্যান্য সারের গুণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবও গোময় ব্যবহারের আর একটি কারণ। কপির জমিতে প্রচুর পরিমাণে গোময় সার দিলেও কপি বেশ বড় হয়। কিন্তু তাহা কতকটা ফাঁপা ধরণের হয়; এই কারণে ওজনেও হালকা এবং স্বাদ-বিহীন হয়। বড় বড় শহরের নিকটবর্ত্তী বেশীর ভাগ সব্জীচাষীরা মানুষের বিষ্ঠাই সাররূপে প্রয়োগ করিয়া অধিক কপি ফলায়। সে-সব কপির আকার ও স্বাদ একরূপ মন্দ হয় না। কিন্তু তাহাও ফাঁপা ধরণের ও ওজনে বেজায় হাল্কা হয়। ফলে, বেচা-কেনার ক্ষেত্রে মূল্য কম হইয়া থাকে। আমরা দীর্ঘকাল পরীক্ষা-স্বরূপ কপির জমিতে নানা জাতীয় সার একক ও বিমিশ্র ভাবে ব্যবহার দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কপির জমিতে গোময়, বিষ্ঠা ইত্যাদি যাহাই দেওয়া হউক, ইহার সহিত যথেষ্ট পরিমাণে খৈল ব্যবহার করাই একাধারে কপির স্বাদ, সৌন্দর্য্য ও ওজন

বাড়াইবার প্রধান উপায়। ইহার সহিত হাড়ের গুঁড়া কতক ব্যবহার করিলে ফল আরও অধিক ভাল হইয়া থাকে। যে-স্থানে হাড়ের গুঁড়া অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য, তথায় যত্নে রক্ষিত অর্দ্ধ-পচা গোময় ও খৈল বিমিশ্র ভাবে ব্যবহার করিয়াই সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। মোট কথা, কপির জমিতে অন্যান্য সার যাহাই হউক, ইহার সহিত খৈল দিতেই হইবে। খৈল সারের কপির তাল অত্যন্ত শক্ত হয় বলিয়া আয়তন ও আকারের অনুপাতে ইহা অধিক ভারী হয় এবং খাইতেও অধিক সুস্বাদু হইয়া থাকে। জমির স্বাভাবিক বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সারের পরিমাণ স্থির করিতে হয়। তাহা পশ্চাৎ যথাস্থানে বলা হইবে।

কপির জমি প্রস্তুত ঃ—ভাল কপি অল্পায়াসে পাইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা যেমন আমাদের খাদ্যবস্তু খুব ভাল হইলেও ইহার পাক বা রন্ধন-কার্য্য ভাল না হইলে খাইয়া সুখী হইতে পারি না এবং একারণ তদ্দ্বারা আমাদের শরীরেরও ঠিক ঠিক উন্নতি হইতে পারে না, তেমনি কপির জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ সার ব্যবহার করিয়াও যদি ইহার জমি প্রস্তুত-কার্য্য যথানিয়মে সমাধা করা না হয় তাহা হইলে উদ্যম অনেকটাই পণ্ড হইয়া যাইবে।

কপির জমি বারমেসে হওয়া উচিত। কারণ তাহাতে সার পরিমাণে কতকটা কম লাগিয়া থাকে এবং অল্পায়াসেও কপি জন্মাইতে পারা যায়। জমি বারমেসে না হইলে আষাঢ় মাসে প্রখর রৌদ্রের দিনে মাটিতে বেশ যো আছে দেখিলেই কোদালি আরম্ভ করিতে হইবে। এই কাজে বড় আকারের কোদাল ব্যবহার করাই ভাল। কারণ তদ্দ্বারা শ্রমের মাত্রা যথেষ্ট কমাইয়াও গভীর কোদালি করিতে পারা যায়। প্রথম বার কোদালি করিবার সময়ে খুব বড় বড় চাকা উঠাইয়া তাহা যতদূর সম্ভব শুকাইতে দিতে হইবে। ঐ সময়ে ঘন ঘন বারিপাত

হয় বলিয়া দ্বিতীয় তৃতীয় বারের কোদালি করিবার যো যে কখন পাওয়া যাইবে তাহা অনেকটাই অনিশ্চিত থাকে; এই কারণবশতঃ জমি তৈরির কাজে স্বভাবতঃ কতকটা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে বলিয়াই একটু অধিক সময় হাতে রাখিয়া কোদালি করিতে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার।

প্রথম কোদালি করিবার পর পনর দিন মধ্যে, বৃষ্টি বাদলা যাহাই হউক, মাটি যখনই খুব শুষ্ক দেখা যাইবে, তখন আর একবার অপেক্ষাকৃত ঘনভাবে কোদালি করিয়া ঘাস-জঙ্গল শিকড় সমেত যাহা ভাসিয়া উঠে তাহা যতদূর সম্ভব দূর করিয়া কাঠা প্রতি আধ মণ গুঁড়া খৈল (সরিষার) ও যত্নে-রক্ষিত অর্দ্ধ-পচা গোময় পাঁচ মণ ভালরূপে ছড়াইয়া সঙ্গে সঙ্গে আবার পূর্ব্বাপেক্ষাও ঘনভাবে কোদালি করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। হাড়ের গুঁড়া দিবার সুবিধা থাকিলে তাহাও দশ সের ঐ সঙ্গেই ছড়াইতে হইবে। সকল সার একসঙ্গে জমিতে দিলে ইহাদের পচন-ক্রিয়া একসঙ্গে একযোগে সাধিত হইতে পারে বলিয়া সে-সবের তেজে মাটির মধ্যে ঘাস ও আগাছার অঙ্কুর যাহা থাকে তাহা দুই চারি দিন যাইতে না যাইতেই মরিয়া লাল হইয়া উঠে এবং মাটির রকম কতকটা বদলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্দ্বারা মাটির মধ্যে উদ্ভিদের খাদ্য-উপাদান যাহা থাকে তাহাও যে শীঘ্রই নিঃশেষে কাজে লাগিবে তাহা বুঝিবার অত্যন্ত সুবিধা হয়। যাহা হউক, সার ছড়াইবার পর আট-দশ দিন গত হইলে জমির মাটি যখনই শুষ্ক দেখা যাইবে তখনই একবার পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনভাবে কোদালি করিতে হইবে এবং যদি জমির মাটিতে এঁটেলের ভাগ বেশী থাকে তবে কাঠা প্রতি আরও দশ সের খৈলের গুঁড়া ছড়াইয়াই কোদালি করিতে হইবে। হাড়ের গুঁড়া পূর্ব্বে না দেওয়া হইয়া থাকিলে দশ সেরের স্থলে আধমণ খৈল ব্যবহার করাই উচিত। কারণ অধিক এঁটেলের ভাগযুক্ত কঠিন মাটিকে দ্রব করিয়া শীঘ্র কাজের উপযোগী

করিয়া তুলিবার পক্ষে খৈলের শক্তি অপরিসীম এবং ঐরূপ মাটিতেই খৈল ব্যবহারের ফল সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। একথা বিভিন্ন সারের গুণ-বর্ণন প্রসঙ্গেও একবার বলা হইয়াছে। বৃষ্টি-প্রবণ স্থানে এই পর্য্যন্ত কাজ হইতে সারা ভাদ্রমাসই লাগিয়া যায়। যাহা হউক, তৃতীয় বার কোদালি করার পর জমির যো বুঝিয়া আট-দশ দিন পর পর কোদালি করিতে হইবে এবং চার-পাঁচ বার কোদালি করিবার পর প্রত্যেক বারের কোদালির সময়ই জমির পুরানো ঘাসের শিকড় ইত্যাদি যাহা ভাসিয়া উঠে তাহা হাতে বাছিয়া দূর করিয়া অপরাহ্নে মৈ দিয়া জমি সমান করিয়া রাখিতে হইবে। জমির যো ঠিক না বুঝিয়া, অর্থাৎ মাটি অধিক ভিজা বা অত্যধিক শুষ্ক অবস্থায় কোদালি করিলে অধিক সময় ও শ্রম করিয়াও প্রয়োজনানুরূপ কোমল বা চূর্ণ করিতে পারা যায় না। মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে যেখানে অধিক বল প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় সেখানে কোদালি ঠিক সময়ে হইতেছে না বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অধিক সার দেওয়া জমিতে এই সকল বিষয়ে সাবধান না হইয়া কাজ করিলে সারের গুণের হ্রাস হয়। কাজেই আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনাও কমিয়া থাকে। আমরা ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবৎ এ সব কাজে প্রবৃত্ত থাকিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বারেই ঠিক সময়ে কোদালি হইতে থাকিলে মাটি যতই শক্ত ধরণের হউক, পর্য্যায়ক্রমে রৌদ্র, বৃষ্টি, বাতাস ও কুয়াশা পাইতে থাকায় সারের ক্রিয়াহেতু তাহা আপনা হইতেই ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া যায় এবং এই প্রকার জমিতেই সারের গুণ অধিক প্রকাশ পাইয়া থাকে। জমির অবস্থা ঠিক এই রূপ হইলেই চারা রোপণ করিতে হইবে।

এখানে এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার—চারা রোপণের অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ পূর্ব্বে শেষ বারের খৈল ছড়াইবার কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। চারা রোপণের অব্যবহিত পূর্ব্বে

জমিতে সার দিলে তাহাতে যে-যে অনিষ্ট সাধিত হয় তাহা সার অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।* যদি নৈসর্গিক কারণবশতঃ শেষ বারের খৈল ছড়াইতে দেরি হইয়া পড়ে, তবে তাহা স্থগিত রাখিয়াই জমি প্রস্তুতের কার্য্য শেষ করিয়া চারা রোপণের সময় ঠিক রাখা উচিত। তাহা না করিলে হয়ত হাপোরের চারা বেজায় বড় হইয়া পড়িবে, আর এ অবস্থায় রোপণ করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়ার পক্ষে খুবই বিঘ্ন ঘটে। সারের অভাব রাখিয়া চারা রোপণ করিলে যে ক্ষতি হয় তাহা চারা রোপণ করিয়াও পূরণ করা যায়। ইহার প্রণালী পশ্চাৎ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে। কপির জমি বারমেসে হইলে সার উল্লিখিত পরিমাণের তিন-চতুর্থাংশ হইলেই কাজ চলে এবং শ্রমের মাত্রাও অনেকটা কমিয়া যায়।

উপরে কপির জমি প্রস্তুত করিবার প্রণালী যাহা লেখা হইল তাহা যথারীতি পালন করিলে অনবরত কপি পাইতে কোন সংশয়ই থাকিবে না। এই প্রণালীতে প্রস্তুত জমিতে সবরকম সুখী জাতীয় দেশী-বিদেশী শাক-সব্জী ও মরসুমী ফুল রোপণ করিলে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহাতে ইহাদের জাতি ও প্রকৃতি অনুসারে সারের জাতি পরিবর্ত্তন ও পরিমাণের কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে হইবে মাত্র।

বাঁধাকপি

বাঁধাকপি সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর। ইহাদের মধ্যেও তারতম্য আছে। এক শ্রেণী শীঘ্র ফলিয়া থাকে (early variety) ও আর এক শ্রেণী দেরিতে ফলে (late variety)। ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের বহু কপি রহিয়াছে। জল্‌দি কপির চারা ভাদ্রের শেষভাগেই রোপণ করিতে হয়। সুতরাং ইহা রোপণ করা অভিপ্রায়

* সারের অপব্যবহার, পৃ ৪৭ দ্রষ্টব্য।

হইলে তদনুসারে ইহার জমি প্রস্তুতের কার্য্যেও কতক আগে প্রবৃত্ত হইতে হয়। দেরিতে ফলনশীল কপির চারা আশ্বিনের শেষভাগে রোপণ করা প্রশস্ত। আমাদের শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ অঞ্চলও অধিক বৃষ্টি-প্রবণ বলিয়া আমরা কার্ত্তিকের প্রথম পক্ষেই বাঁধাকপির চারা রোপণের ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তবে আকাশের ভাবগতিক অনুসারে ইহার কতকটা অগ্রপশ্চাৎ করিতেও সময় সময় বাধ্য হইতে হয়।

বাঁধাকপির চারা প্রস্তুতঃ—চারার উৎকৃষ্টতার উপর সব-রকম ফলশস্যাদির গাছের ভবিষ্যৎ উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে এবং চারা ভাল হওয়া একাধারে ইহার জমি বা মাটি ও বীজের উৎকর্ষের উপরই অবধারিত হইয়া থাকে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেখানে বারমেসে বীজতলা থাকে সেখানে চারা করা খুবই সহজ। কেবল বীজ বপনের মাসাধিক পূর্ব্ব হইতে হাপোরের স্থানটা ঘন ঘন কোদালি করিয়া তাহাতে রৌদ্র বাতাস লাগাইয়া ও অত্যন্ত আবশ্যক মনে হইলে কোদালি করিবার সূচনায়ই অতি সামান্য পরিমাণ মিহি খৈলের গুঁড়া ছড়াইয়া লইলেই চলে।

কপির ভাল চারা তিন সপ্তাহের হইলেই জমিতে রোপণ করা যায়। এই হিসাবে জমিতে যখন চারা রোপণ করিতে পারা যাইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে, তাহার তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই হাপোরে বীজ বপন করিতে হইবে। প্রত্যেক বীজের দূরত্ব সওয়া ইঞ্চির অধিক না হওয়াই ভাল। অত্যধিক ঘন করিয়া বীজ বপন করা হইলে চারা উঠিয়াই কেবল লম্বা হইতে থাকিয়া লতার ন্যায় মাটিতে শুইয়া পড়িয়া জমিতে রোপণের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়; চারার গোড়ায় পচা ধরিয়া একেবারে অকেজো হইয়া যায় এবং ইহা নিরাশারও কারণ হয়। অধিক সার দেওয়া হাপোরে বীজ বপন করিলেও যে এই সকল দোষ ঘটিয়া থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক, বীজ বপন করিয়া তদুপরি

আধ ইঞ্চি পুরু করিয়া মাটি দিয়া সরু ঝাঁজরি দ্বারা আন্দাজ-মত জল দিতে ও আবশ্যক তদ্বির করিতে থাকিলেই সুন্দর চারা হইয়া থাকে। বীজের উপর মাটি দেওয়ার সময় খুব সতর্ক হইতে হইবে। খুব সরু চালুনিতে মাটি উঠাইয়া বপন করা বীজের উপর আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া দেওয়াই ভাল। বীজ বপনের পর চারা রোপণ না করা পর্য্যন্ত বৃষ্টি-বাদলার সময় ব্যতীত হাপোরের উপর কোন আচ্ছাদন দেওয়া ভাল নয়। কারণ আঁট রোদের চারাই অধিক কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে বলিয়া চারা রোপণের পর সহজেই বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

কপির ভাল চারা পাইবার প্রধান উপায় এই যে, যেখানে যত সংখ্যক চারা রোপণ করা অভিপ্রায়, তার দ্বিগুণ কিম্বা ততোধিক সংখ্যক চারা হইতে পারে—এই পরিমাণ বীজ বপন করিয়া চারা উঠিয়া গেলে কেবল সবল চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল ও জীর্ণ-শীর্ণ চারা সঙ্গে সঙ্গেই উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কেবল বাছাই করা ভাল চারাগুলি থাকায় ও সেইগুলিও পাতলা হইয়া পড়ায় সোজা হইয়া উঠে এবং সে-সব চারা স্বভাব-নিয়মেই পুষ্ট ও দ্রুত বৃদ্ধিশীল এবং অধিক কষ্টসহিষ্ণু হইতে পারে। কাজেই জমিতে রোপণ করিবার পরও সবগুলি কপিই বৃদ্ধিশীল ও একরূপ তালবিশিষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, যে সকল বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয় তাহারাই অধিক সবল হইয়া উঠে। এতদ্দ্বারা তাহাদের বৈজিক শক্তির আধিক্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং সে-সব চারা জমিতে বসাইলেও যে শীত তাপ অধিক সহ্য করিয়া ভাল কপিতে পরিণত হইবে তাহাও কতকটা নিঃসংশয়েই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং লোকসান ভাবিয়া নীরস চারা তুলিয়া ফেলিয়া দিতে সঙ্কুচিত হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, এক স্থানে একই প্রকার যত্নের সহিত দুই-চারি শত রোপণ করিলে ইহার কতকগুলি

খুব উৎকৃষ্ট হইলেও কতকগুলি খুব নগণ্য আকারের হইয়া থাকে। এ সকল প্রভেদের কারণ—যে বীজ হইতে এই সব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের বৈজিক শক্তির মধ্যে ন্যূনাধিক্য রহিয়াছে; ইহা ব্যতীত অন্য কারণ কল্পনা করা যায় না। নীরস চারা বাছিয়া দূর করাই এ সকলের প্রতিকারের প্রধান উপায়। সকল জাতীয় গাছপালার চারা সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য।

যেখানে স্থায়ী বীজতলার অভাব, সেখানে নূতন বীজতলা তৈরি করিয়াই চারা করিতে হইবে। কেহ কেহ বৃষ্টি-বাদলার উপদ্রব এড়াইবার উপায়-স্বরূপ টব বা কাঠের বাক্স মধ্যে চারা করিবার বিশেষ পক্ষপাতী এবং কেহ কেহ টব বা গামলার মধ্যে বীজ বপন করিয়া চারার বীজপত্রের উপর পত্রোদ্গম হইতেছে দেখিলেই তাহা অধিক সারযুক্ত হাপোরে লইয়া গিয়া বড় করিয়া রোপণের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। আমরা সব রকমেই চারা প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি। বীজতলা বা টবের মাটি ঠিক ঠিক তৈরি হইলে এ সব নাড়াচাড়া করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। চারা দুই বার স্থানান্তরিত করিলে ফলনের কতক বিলম্ব হওয়া অনিবার্য্য। তবে যাহাই করা হউক, মাটির উপযোগিতার উপরেই চারার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে এ কথা মনে রাখিয়া টবের মাটিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দীর্ঘকাল হাতে রাখিয়া রোপণ করিতে হইবে এবং চারা বাছাই করিবার কথা ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মনোযোগের সহিত পালন করিতে হইবে। মরসুমী ফুল ও বারমাসের সব্জী রোপণ করিবার দিকে যাঁহাদের বিশেষ উৎসাহ রহিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে বারান্দায় বা যেস্থানে প্রতিদিনই কতক রোদ-বাতাস পাইবার সুবিধা হয়, অথচ প্রবল বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে, এরূপ স্থানে একবার একটু অধিক পরিমাণ মাটি ভালমত তৈরি করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া দিলে, তাহা যখন ইচ্ছা টবে তুলিয়া যে-কোন সব্জীর চারা করিতে পারেন। ইহাতে কাজ অত্যন্ত সহজ হয়।

চারা রোপণ ও তদ্বির ঃ—বড় জাতীয় কপির চারা আড়াই ফুট, মধ্যমাকারের কপি সওয়া তুই ফুট এবং ছোট জাতীয় কপি তুই ফুট অন্তর সমচতুষ্কোণ আকারে বসানো উচিত। অধিক সার দেওয়া জমিতে ইহা অপেক্ষা ঘন রোপিত হইলে কপির ফলন ভাল হয় না। ঐ নিয়মে দড়ি ধরিয়া বাঁশের ছোট ছোট কাঠি পুঁতিয়া চারার স্থান চিহ্নিত করতঃ কাঠি পোঁতা রাখিয়াই প্রত্যেক স্থানে চেপটা পেয়ালার আকারে তিন ইঞ্চি আন্দাজ গভীর গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের মাটি পাড়ে উঠাইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে ও গর্ত্তের তলার মাটি খুরপি দ্বারা খুঁড়িয়া হাতে রগড়াইয়া লইতে হইবে। এই ভাবে সমস্ত গর্ত্ত ঠিক হইলে প্রাতে বীজ-তলার চারার উপরে অধিক পরিমাণ জল সেচন করিয়া রাখিয়া অপরাহ্নে তাহা যন্ত্রের দ্বারা—খুরপি অথবা কাটা-খুরপির সাহায্যে চাড় দিয়া উঠাইয়া লইয়া গর্ত্তের কাঠি তুলিয়াই তথায় বসাইয়া গোড়ার মাটি আন্দাজ মত হাতে চাপিয়া কতক জল দিতে হইবে। প্রত্যেক দিনের চারার রোপণকার্য্য এইভাবে সমাধা করিয়া, বীজতলা হইতে উত্তোলিত চারার স্থানের মাটি হাতে ঠিক করিয়া দিয়া ঐ স্থানে কতক জল দিয়া রাখিতে হইবে। তাহা না করিলে বীজতলার চারা কোন কোনটা নড়িয়া যাওয়ার দরুন মরিয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। ইহার পরদিন হইতে জমিতে রোপিত চারায় ক্রমাগত তিন চারি-দিন প্রাতে এক একখানা কলার খোলের টুক্‌রা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া পুনরায় বিকালে তাহা সরাইয়া কতক জল দিয়া রাত্রে অনাবৃত রাখিতে হইবে। ইহার পর আর না ঢাকিয়া ক্রমাগত তিন দিন বিকালে অল্প জল দিতে হইবে।

এইরূপে চারা-রোপণের দিন হইতে এক সপ্তাহ গত হইলে চারার অবস্থা বিবেচনায় এক অথবা তুই দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখিয়া পর দিন অপরাহ্নে চারার গোড়ার যতটুকু স্থান জলে

ভিজিয়া চট্ বাঁধিয়া গিয়াছিল তাহা খুরপি দ্বারা আস্তে আস্তে খুঁড়িয়া মাটি হাতে রগড়াইয়া দিয়া এক দিন আর কিছুই করিতে হইবে না। ইহার পর দিন হইতে ক্রমাগত তিন দিন কেবল বিকালে অল্প অল্প জল দিতে হইবে। ইহার পর পুনরায় এক অথবা দুই দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখিয়া পর দিন গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া পূর্ব্ববৎ একদিন আর কিছুই করিতে হইবে না। ইহার পর দিন হইতে ক্রমাগত তিন দিন জল দিতে হইবে। এইভাবে পর্য্যায়ক্রমে জল ও নিড়ানি দেওয়াই বিশেষ কর্ত্তব্য। চারার গোড়ায় রসের অভাব বা আধিক্যের অবস্থা দেখিয়া জল সেচন ও নিড়ানি দেওয়ার কাজ দুই-এক দিন অগ্রপশ্চাৎ করিতে পারা যায়। চারা বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিড়ানির স্থানের বিস্তৃতি ও গভীরতা ক্রমে বাড়াইয়া পার্শ্বের মাটি হাতে টানিয়া চারার গোড়ার গর্ত্ত ক্রমে ভরিয়া তুলিতে এবং প্রত্যেক বারের নিড়ানি দেওয়ার সময় চারার গোড়ায় পাকা পাতা সব ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। গাছ বাড়িয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার ছায়ার বিস্তৃতি বাড়িয়া থাকে বলিয়া গোড়ার মাটির রসও ক্রমে অধিক সময় স্থায়ী হইয়া থাকে। সেজন্য ঐ অনুপাতে জল সেচন ও নিড়ানি দেওয়া ও জল দেওয়ার বিরামকালের দূরত্বও ক্রমে বাড়াইতে হয়। এই কাজ মাটির যো বুঝিয়াই করিতে হয়, একথা ইতিপূর্ব্বেই একবার বলা হইয়াছে।

জমিতে সার কম দেওয়া হইয়া থাকিলে বীজ বপনের সময়ে স্থানের প্রয়োজনানুরূপ খুব সূক্ষ্ম গুঁড়া খৈল একটা পাত্রে করিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। দুই চারি দিন পর পর তাহা একটা বাঁশের কাঠি দ্বারা আলোড়ন করিয়া দিলে ক্রমে তাহা পচিতে থাকে। জমিতে চারা রোপণের পর চারা সব বাঁচিয়া উঠিয়া একটু বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিলেই একবার নিড়ানি দেওয়ার সময় প্রত্যেক চারার গোড়ার চতুর্দ্দিকে ছোট আইল বাঁধিয়া থালার

মত করিয়া লইয়া যখন জল দেওয়া প্রয়োজন হয় তখন ঐ পচা খৈল অধিক পরিমাণ জলের সহিত গুলিয়া তরল করতঃ থালার মধ্যে পরিমাণ মত ঢালিয়া দিতে হইবে। ইহার পরের কয় দিন পূর্ব্ববৎ কেবল জল দিয়া যো হইলে নিড়ানি দিবার সময় মাটি হাতে রগড়াইয়া দিলে খৈল ক্রমে মাটির সহিত মিলিতে পারে। গাছের অবস্থা বুঝিয়া এইভাবে কয়েক দিন পর পর তিন চারি বার তরল খৈল দিলে সারের অভাব দূর হয় এবং গাছও সতেজে বাড়িয়া উঠে।

খৈল পচাইবার সময় ইহাতে অত্যন্ত দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। একারণ ইহা গৃহমধ্যে রাখিতে পারা যায় না অথচ পাত্র বাহিরে রাখিলে শেয়াল কুকুরই ইহা খাইয়া ফেলে। সেজন্য পাত্রটা কোন বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা ব্যবসা করিবার জন্য বিস্তৃতভাবে কপির চাষ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে কাজের সূচনায়ই একটা পাকা চৌবাচ্চা করিয়া তন্মধ্যে সম-পরিমাণে কাঁচা গোময়, খৈল ও হাড়ের গুঁড়া পচাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন এবং ইহাই সময়মত তরল করিয়া গাছের গোড়ায় ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা সারের অভাব দূর করিবার প্রশস্ত উপায়।

যাঁহারা কপির চাষে রীতিমত কৃতকার্য্য হইতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে অন্যান্য বিদেশী সব্জী ফলাইতে পারা খুবই সহজ হইয়া থাকে। এবং এই কারণে সে-সব সব্জী-চাষের প্রণালী বিস্তৃত ভাবে না লেখাই সঙ্গত মনে করিলাম।

বীজের নির্দ্দোষতার উপর সকল জিনিসেরই চাষের সাফল্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যথাতথা হইতে কপির বীজ আনিয়া তাহা স্থানে স্থানে রোপণ করিয়া অনেককেই নিরাশ হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কারণে কপির বীজ বিশ্বস্ত বীজ-বিক্রেতাদের নিকট হইতে ভালমত জানিয়া-শুনিয়া ক্রয় করা

সঙ্গত। যাহাদের তাহা করিবার সুযোগের অভাব, তাহাদের পক্ষে সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতেই বীজ সংগ্রহ করা সঙ্গত।

ফুলকপিও দুই শ্রেণীর, যথা—জল্‌দি এবং বিলম্বে ফলনশীল। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই ছোট বড় মাঝারি এবং বহু নামের ফুলকপি আছে। ফুলকপি অধিক বালির ভাগযুক্ত মাটিতেই ভাল হয়। ইহার চাষের প্রণালী, তদ্বির ইত্যাদি সকলই বাঁধাকপির মত। তবে সারের পরিমাণ বাঁধাকপির জমির তিন-চতুর্থাংশ হইলেই কাজ চলে। ফুলকপির গাছ অত্যন্ত বাড়িয়া পড়িলে ফুল আকারে ছোট হয়। ইহাদের চারার দূরত্ব অবস্থানুসারে যথাক্রমে দুই ফুট সওয়া দুই ফুট হইলেই চলে।

ওলকপি ও শালগম

ওলকপি ও শালগম বেলে মাটিতেই ভাল হইয়া থাকে। ইহাদের জমিতে খৈল ও গোময় বিমিশ্র ভাবে ব্যবহার করা ভাল এবং সারের পরিমাণ বাঁধাকপির তিন-পঞ্চমাংশ হইলেই চলে। মাটিতে এঁটেলের ভাগ বেশী থাকিলে ইহার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ ছাই ব্যবহার করা উচিত। ওলকপি এক হাত অন্তর ও শালগম এক ফুট অন্তর দূরে দূরে রোপণ করা উচিত। অন্যান্য তদ্বির প্রায় বাঁধাকপিরই মত। তবে গোড়ার মাটি তত অধিক উচ্চ করিয়া ধরাইতে পারা যায় না। শালগম ঘন রোপিত হয় বলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই জমি ছায়াবৃত হইয়া পড়ে ও এই কারণে জলসেচনের প্রয়োজনও ক্রমে কমিয়া থাকে। ইহা অনেকটা প্রয়োজন বুঝিয়াই স্থির করিতে হয়।

ফরাস বিন

ফরাস বিনের আদি জন্মস্থান বোধ হয় ফরাসী দেশ, এজন্য ইহা ফরাস বিন নামে আখ্যাত হইয়া থাকিবে। ইহার গাছ

সীম জাতীয়। ইহা কয়েক প্রকার। গাছ আধ হাত লম্বা হইলেই ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। ইহা কাঁচা অবস্থায় কাটিয়া সীমের ন্যায় তরকারিতে ব্যবহার করিতে পারা যায় এবং পরিপক্ক ফলের বিচি দ্বারা উৎকৃষ্ট দাল হয়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই ইহার বীজ বপনের সময়। জমি কয়েক বার চাষ ও মৈ দিয়া প্রস্তুত করতঃ এক হাত অন্তর অন্তর দড়ি ধরিয়া ঐ দড়ির কিনারায়ই আধ হাত অন্তর এক একটি বিচি গুঁজিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, জমি ভালরূপ প্রস্তুত না হইলে বিচি নিয়মমত দাবাইতে পারা যায় না, অর্থাৎ বিচি যত দূর নীচে যাওয়া উচিত তত দূর যাইবে না। গাছ উঠিয়া গেলে সাত আট দিন পর পর খুরপি দ্বারা জমি সমান করতঃ প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কতক মাটি দিলেই হইল।

প্রথমেই বলা হইয়াছে, ইহার গাছ কয়েক প্রকারের। ইহার সকল প্রকারের গাছ আধ হাত লম্বা হইলেই প্রত্যেক গাছের গোড়ায় একটি করিয়া সরু বাঁশের কাঠি পুঁতিয়া দিতে হইবে।

টমাটো (বিলাতী বেগুন)

ইহা খুব সাধারণ যত্নেই প্রচুর ফলাইতে পারা যায়। ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত এদেশে নগণ্য জিনিষের আকারেই হইতেছিল। ইহাতে ভিটামিন যথেষ্ট রহিয়াছে জানিতে পারায় সম্প্রতি শিক্ষিত লোকের মধ্যে ইহার খুব আদর বাড়িয়াছে এবং ঐ দৃষ্টান্তে সাধারণেও ইহা খাইতে আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু সেই হিসাবে ইহার চাষ খুব কম হইতেছে মনে হয়। ইহা সাধারণ যত্নে হইলেও আমার মনে হয় এক বিঘা জমিতে যথাকালে যত্নের সহিত রোপিত হইলে ফল পাওয়ার সময় প্রত্যহ একটি লোকের প্রায় সমস্ত দিনই লাগিবে। ইহার মূল্য-স্বরূপ প্রতিদিন আট আনা পাওয়া যাইতে পারে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসই ইহা রোপণের প্রকৃত সময়। রোপণের পনর দিন আন্দাজ পূর্ব্বে পৃথক্ স্থানে বীজতলা করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। জলসেচন ইত্যাদি আবশ্যক যত্ন লওয়াও দরকার। ইতিমধ্যে চারা রোপণের সময় হইলে স্থান বাছিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। চারাগুলি চার-পাঁচ অঙ্গুলী লম্বা হইয়া গেলেই তাহা জমিতে বসানো যায়। দেড় হাত অন্তর দড়ি ধরিয়া ঐ ব্যবধানে এক একটি চারা বসাইয়া জল দেওয়া দরকার। ইহার পর ক্রমাগত তিন দিন দুবেলা অল্প অল্প জল দিতে হইবে। ইহার আর কিছুই না করিয়া তিন-চার দিন পর এক বার খুরপি দিয়া নিড়ানি দিয়া সঙ্গে সঙ্গে কতক মাটি ধরাইয়া দিলেই হইল। ইহার মধ্যে ছোট বড় মাঝারি নানা রকম বেগুন আছে। বীজ সংগ্রহের বেলায় তাহা জানিয়া লওয়া উচিত।

মূলা

সব্‌জী বিক্রেতার পক্ষে মূলা বেশ লাভের কৃষি। সব জায়গার মূলা খাইতে ভাল নয়। পক্ষান্তরে, ভাল স্বাদের জন্য কোন কোন স্থানের মূলা বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সে-সব স্থানের চাষীরা মূলার চাষ দ্বারা বিস্তর টাকাও পাইয়া থাকে। বেলে মাটিতেই মূলা ভাল ফলে। খৈল-সারের মূলা খাইতে সুস্বাদু হয়। কিন্তু অল্প লোকেই খৈল সার প্রয়োগ করে। অধিক গোময় সার দেওয়া জমির মূলার স্বাদ ভাল হয় না এবং তাহা কতকটা দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। মূলার জমি খুব গভীর কর্ষিত ও চূর্ণিত হওয়া দরকার ও অধিক সময় হাতে রাখিয়া কর্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। খনার বচনে আছে—"ষোল চাষে মূলা" ইত্যাদি; মূলার জমি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক প্রবাদ রহিয়াছে।

লাল, সাদা, লম্বা, বেঁটে, গোল ইত্যাদি নানা বর্ণ ও আকারের মূলা হয়। বীজের উৎকর্ষের উপর ইহার আকারে বড়

হওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বীজ ভাল না হইলে কেবল জমি ভাল-রূপ প্রস্তুত করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া দুরাশার বিষয়, তাহা স্মরণ রাখিয়া বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে মূলার বীজ কেনা সঙ্গত। ভিন্ন দেশ হইতে বীজ আনাইয়া এদেশে মূলা ফলানো হয়। ইহাতে উৎপন্ন বীজ দ্বারা সেরূপ বড় মূলা হয় না।

কার্ত্তিক মাসই মূলার বীজ বপনের প্রকৃত সময়। ব্যবসায়ীরা শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও ইহা ফলাইয়া থাকে, কিন্তু কার্ত্তিকে ফলানো মূলার মত খাইতে ভাল হয় না। জমি প্রস্তুত হইলে বিঘাপ্রতি আধ সের বীজ ছিটাইয়া দিয়া একবার চাষ দিয়া অথবা অনতিগভীর ভাবে কোদালি করিয়া মৈ দেওয়াই উচিত। তারপর মূলার চারা উঠিয়া তিন-চারটি পাতা গজাইলে এক বার এবং আট-দশ দিন পর পর আর এক বার করিয়া নিড়ানি দেওয়াও বিশেষ প্রয়োজন। মূলার মাটি ঢিলা না রাখিতে পারিলে মূলা মোটা হইতে পারে না এবং ইহারই জন্য ঘন ঘন নিড়ানি দেওয়া দরকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারে নিড়ানি দেওয়ার সময় গাছের গোড়ার লাল ও পাকা পাতা ভাঙ্গিয়া দেওয়া ও অধিক ঘন চারা থাকিলে নিস্তেজ চারা উপ্ড়াইয়া ফেলা দরকার হয়।

এতদঞ্চলে মূলার জমিতে কেহই জল সেচন প্রায় করে না। কিন্তু জমির যো বুঝিয়া সময় সময় ঝাঁজরি দ্বারা জল সেচন করিলে বিশেষ উপকারই হয়। কোন কোন স্থানে মূলার চারা তুলিয়া রোপণ করিবার রীতি আছে শুনিয়া আমরা তাহা করিয়া দেখিয়াছি। ইহার ফল খুবই সন্তোষজনক হয়।

বেগুন

সব্জী চাষের মধ্যে বেগুন প্রকৃতই লাভের কৃষি। বেগুন দুই শ্রেণীর—বারমেসে ও ফসলে। ইহাদের মধ্যে ছোট, বড়, লম্বা, গোল, ইত্যাদি নানা প্রকার-ভেদ রহিয়াছে। বারমেসে বেগুনই

অধিক লাভজনক। কারণ তাহা একবার উত্তমরূপে রোপণ করিয়া সযত্নে রক্ষা করিতে পারিলে ক্রমাগত তিন বৎসর পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়। বেগুন প্রায় সব রকম মাটিতেই ফলে এবং বার-মেসে বেগুন ফাল্গুন চৈত্রের প্রখর রৌদ্রের সময় ব্যতীত প্রায় সব সময়েই রোপণ করা যায়। কীট ও পিপীলিকাই ইহার প্রধান শত্রু। যেখানে সে-সবের উপদ্রব আছে, তথায় বেগুন রোপণ করিয়া লাভ করা সুকঠিন। গাছে কীট ও পিপীলিকার আবির্ভাব হইলে গাছ ও ফল উভয়ই নষ্ট করে। মানুষের বিষ্ঠাই বেগুনের পক্ষে সর্ব্বোত্তম সার। একথা সার অধ্যায়ে নানা ঘটনার উল্লেখপূর্ব্বক বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। যেখানে বিষ্ঠা-সারের অভাব, সেখানে গোময় ও খৈল বিমিশ্রভাবে দিয়াই জমি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে বিঘাপ্রতি সাত-আট মণ খৈল ও বিশ মণ আন্দাজ যত্নে রক্ষিত গোময় দেওয়া বিশেষ দরকার। বেগুনের জমিতে একমাত্র গোময়-সার দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে। কারণ গোময় দেওয়া জমিতেই কীটের উপদ্রব অধিক হইয়া থাকে। গোময়-সারের বেগুনের আস্বাদও অত্যন্ত হীন হইয়া থাকে।

চারা রোপণের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই বেগুনের জমি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত এবং খৈল গোময় যাহা দিতে হইবে তাহাও কপির জমির ন্যায় একই সঙ্গে দিতে হইবে। যেখানে বিষ্ঠা-সার দিবার সুবিধা আছে, সেখানে চারা রোপণের তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই দেওয়া সঙ্গত। বিষ্ঠা-সার কি ভাবে তৈরি করিতে হয় তাহা সার অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। (২৯-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বেগুনের বীজ:—বেগুনের জাতি ও ইহার বীজের উৎকর্ষের উপরই সফলতা অধিক মাত্রায় নির্ভর করে। ভাল জাতীয় বেগুনের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের বীজোৎপন্ন গাছে ঠিক ইহার অনুরূপ

আকৃতির বেগুন হয় না। ইহা বীজ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মধ্যবয়সের সতেজ গাছের পুষ্ট, নীরোগ ও সুপক্ক বেগুন পাড়িয়া আনিয়া গৃহের যে স্থানে আলোক ও বাতাস পাইবার সুবিধা সেখানে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে; পরে শুকাইয়া গেলে প্রস্থে তিন টুকরা করিয়া কাটিয়া মধ্যভাগের বীজ দ্বারা চারা করাই উচিত। কেনা বীজে ঐ সকল বিচার থাকে না বলিয়া বীজ নিজে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারাই বেগুনের চাষে সফলকাম হইবার প্রকৃষ্ট উপায়।

চারা প্রস্তুতঃ—বীজতলায় বীজ বপন করিবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জলে দশ মিনিট আন্দাজ রাখিয়া আস্তে আস্তে হাতে রগড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। জল শুকাইয়া গেলেই বপন করিয়া সরু চালনী দ্বারা আধ ইঞ্চি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এবং তৃতীয় দিন হইতে বীজ অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিনই এক বেলা আন্দাজমত জল দিতে হইবে। বেগুন-বীজ মাটিতে পড়িলে তাহা পিপীলিকায় নষ্ট করে। অন্যান্য সব্‌জী-বীজ হইতে ইহা অপেক্ষাকৃত কতক দেরিতে অঙ্কুরিত হয় বলিয়া পিপীলিকায় নষ্ট করিবার সুযোগ অধিক পায়। বীজ গরম জলে ভালমত ধুইয়া বপন করিলে পিপীলিকার উপদ্রব কতকটা কমিয়া থাকে, একারণ এইরূপ করাই সঙ্গত। বীজ ভিজাইয়া বপন করিলে তাহা কতক শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় এবং পরিষ্কার করিয়া বপন করার দরুন পিপীলিকার আকর্ষক পদার্থ কমিয়া যায়। এ হেতু ইহার উপদ্রবও অনেকটাই কমিয়া থাকে।

নিজ নিজ ব্যবহারোপযোগী পরিমাণ চারা করিতে হইলে টব বা বাক্স মধ্যেই সুন্দর সুন্দর চারা করিতে পারা যায় ও তাহা করিলে পিপীলিকার আবির্ভাবের আশঙ্কা একেবারেই থাকে না। অধিক পরিমাণ চারা করিতে হইলে বীজতলায় বপন না করিলে চলে না। সুতরাং পিপীলিকা দমনের উপায়ও সাধ্যমত করিতে হইবে।

ইহার জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। বীজ বপনের দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বীজতলার মাটি ঘন ঘন কয়েক বার খুঁড়িয়া রৌদ্রতপ্ত করিয়া লইলে এবং ঠিক একই সময়ে ইহার বাহিরের জমিতে কতক গুড় বা চিনি ছড়াইয়া লইলে বীজতলার মাটি সহজেই পিপীলিকাশূন্য হয় এবং তাহা হইয়াছে বুঝিলেই খুব তাড়াতাড়ি চতুর্দ্দিকের জমি কতক চাঁচিয়া সমান করতঃ বেশ পুরু করিয়া আট-দশ ইঞ্চি চওড়া আলকাতরার প্রলেপ দিয়া লইয়াই বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পর আবশ্যক তদ্বির করিলে এক মাসের মধ্যে চারা জমিতে রোপণের উপযোগী হইয়া থাকে।

বারমেসে বেগুনের চারা বৈশাখের প্রথমভাগে রোপণ করাই ভাল। ঐ সময়ে রোপিত গাছে শ্রাবণের প্রথম হইতে বেগুন ধরিতে আরম্ভ হয়; ফলে ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাজারে তরকারী যখন দুর্ম্মূল্য হয় তখনও বেগুন পাওয়ার সুবিধা হইয়া থাকে। এই ভাবে বেগুন পাইতে হইলে ফাল্গুনের প্রথম হইতেই বেগুনের জমি চাষে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বীজ বপনের কাজও চৈত্রের প্রথমভাগে শেষ করিতে হইবে। এক দিকে জমি, অন্য দিকে চারা তৈরি হইলেই তাহা জমিতে রোপণ করিতে হইবে।

বারমেসে বেগুনের চারা আড়াই হাত অন্তর সারিবন্দী করিয়া দুই হাত অন্তর চারা রোপণ করাই ভাল। অধিকতর ঘন গাছের তদ্বির করিতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। ঘনত্ব বশতঃ নিয়মিত রোদ বাতাস পাইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া গাছের স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না। গাছ অল্প ফলপ্রসূ ও অল্পায়ু হইবার ইহা প্রধান কারণ। চারা অপরাহ্ণ কালেই রোপণ করিতে হইবে। কোন যন্ত্রের, যথা খুরপির সাহায্যে চাড় দিয়া চারা উঠাইলে ইহাদের শিকড়ের সবটা অক্ষত অবস্থায় উঠিয়া যায়। ইহার পর একটা ধারাল কাঁচি দ্বারা মূল শিকড়ের অগ্রভাগের এক-তৃতীয়াংশ

কাটিয়া দুই দুইটি করিয়া এক এক স্থানে রোপণ করিতে হইবে মূল শিকড়ের মাথা কাটিয়া রোপণ করিলে কর্ত্তিত স্থান হইতে। বহুসংখ্যক শাখা শিকড়ের বিস্তৃতি হয় বলিয়া গাছের শাখাপ্রশাখাও অধিক হইতে পারে। এরূপ গাছে অধিকসংখ্যক বেগুন ধরিবার সুবিধা হয়। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ কাটিয়া চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা উচিত নয়।

ফসলে বেগুনের চারা শ্রাবণ হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে স্থানের অবস্থা বিবেচনায় যে-কোন সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে এবং তদনুসারে ইহার দুই মাস পূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া সার ছড়াইবার ও এক মাস পূর্ব্বে বীজ রোপণের কাজ শেষ করিতে হইবে।

বেগুনের চারা জমিতে বসাইবার সময় গোড়ার স্থান ঈষৎ গর্ত্তের আকারে রাখিয়া বোপণ করিয়া ক্রমাগত তিন দিন এক বেলা আন্দাজ জল দিতে হইবে : পরে চতুর্থ দিনে পার্শ্বের মাটি হাতে টানিয়া চারার গোড়ার জলসিক্ত স্থানটুকু এক ইঞ্চি আন্দাজ উচ্চ করিয়া ঢাকিয়া দিলেই চারা রোপণের কাজ শেষ হইল।

তারপর কয়েক দিন আর কিছুই না করিয়া যখন দেখা যাইবে যে স্থান-পরিবর্ত্তন ও শিকড়ের মাথা কাটাজনিত কষ্ট সহিয়া গিয়া চারা একটু বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে তখন গোড়ার কতকটা স্থান খুরপি দ্বারা পাতলা ভাবে খুঁড়িয়া মাটি হাতে রগড়াইয়া তদ্দারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া সমান করিয়া দেওয়া দরকার। ইহার পর চারা ছয়-সাত ইঞ্চি আন্দাজ উচ্চ হইলে সবটা জমি ভালরূপ নিড়ানি দিয়া প্রত্যেক সারিতে অনতিউচ্চ দাঁড়ার আকারে মাটি ধরাইয়া যাহাতে বৃষ্টির জল জমিতে বসিতে না পারে সেরূপ করিতে হইবে। ইহার পর হইতে প্রতি মাসে এক বার করিয়া পাতলা ভাবে নিড়ানি দিয়া খাল ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া দাঁড়া ক্রমে একটু একটু করিয়া উচ্চ করিয়া জল

নিকাশের সুবিধা করিতে হইবে। কারণ বেগুণের জমিতে অল্প-মাত্র জল বসিতে দিলেও ইহার গাছ সহজে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরাও বন্ধ হয়। ঘন ঘন নিড়ানি দিলে পিপীলিকা কতকটা নির্যাতিত হয় প্রত্যেক বার নিড়ানি দিবার পূর্ব্বে সমস্ত জমিতে কতক ছাই ছড়াইয়া দিলে কীটের উপদ্রবের আশঙ্কাও কিঞ্চিৎ কমিয়া থাকে। সুতরাং এ সব কাজে অবহেলা করা উচিত নয়।

বেগুন গাছে কীট লাগিলে অপরাহ্ণ কালে জমিতে গেলে দেখা যায় যে, কীটদষ্ট ডগাগুলি ঝলসিয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কীটদষ্ট স্থানের কতক নীচে তাহা কাটিয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলাই সঙ্গত। কারণ কীটযুক্ত ডগা জমিতে বা ইহার সন্নিকটে থাকিয়া গেলে তাহা হইতে কীট গিয়া পুনরায় নূতন ডগা কাটিতে পারে ও কাটিয়াই থাকে। এসব উপদ্রব নিবারণ কল্পে প্রতিদিনই অপরাহ্ণে বেগুনের জমি এক বার ভালরূপ পরিদর্শন করা বিশেষ দরকার। গন্ধকের ধোঁয়া কীটাক্রান্ত বেগুন গাছে লাগাইলে কীট ছাড়িয়া যায়, ইহা আমরা ভালমত পরীক্ষা করিয়াই বলিতে পারিতেছি। কিন্তু আস্ত জমিতে এ ভাবে গন্ধকের ধোঁয়া লাগাইতে পারা সম্ভব নয় বলিয়া এই উপদেশ কাহাকেও দিতে পারা যায় না।

বারমেসে বেগুনের গাছ প্রতি চৈত্র মাসে এক বার মাটির উপরে এক ফুট আন্দাজ রাখিয়া কাটিয়া ফেলিয়া সমস্ত জমি উপর্য্যুপরি দুই বার ছোট কাটা-কোদাল দ্বারা ঘন ভাবে কোদালি করিয়া দাঁড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। ইহার পর প্রত্যেক গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিকে আধপোয়া আন্দাজ খৈলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। খৈলের পরিবর্ত্তে বিষ্ঠা পচা মাটি প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক চুবরি করিয়া দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা নবযৌবনশ্রী ধারণ

করিয়া থাকে। সুতরাং বেগুন-চাষীর পক্ষে কিছু আয়াসস্বীকার করিতে হইলেও ঐরূপ করাই সঙ্গত। যাহা হউক, গাছ ছাঁটিয়া পুনরায় সার দেওয়া ও দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়ার পরও মাসে মাসে পূর্ব্ববৎ যত্ন লইলেই ইহা হইতে বিশেষ লাভ হইবারই সম্ভাবনা।

ডাঁটা, ডেঙ্গা

সব্‌জী-চাষীর পক্ষে ইহাও একটি ভাল লাভের কৃষি। ফলন ভাল হইলে এক কাঠা জমিতে উৎপন্ন ডাঁটা পনর-কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয় এবং এই উপায়ে বড় বড় শহরের নিকটবর্ত্তী স্থানের চাষীরা বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যাহা হউক, ডাঁটা জিনিসটা সকলেরই বর্ষার কয়েক মাস তরকারীর অভাব মিটাইবার প্রধান সম্বল বলিতে হইবে। তাহা হইলেও উপযোগী মাটি নির্ব্বাচনের উপরই ডাঁটা ফলাইবার সাফল্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। অনেক জমির ডাঁটা বৃহদাকার হইলেও তাহা খাইতে বিস্বাদ হয় আবার কোন কোন জমির ডাঁটা সিদ্ধ হয় না, ইহা সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়। বাজারের কেনা ডাঁটাতেই উপরের লিখিত দোষসমূহ অধিক পরিদৃষ্ট হয়। ইহার কারণ ডাঁটা-বিক্রেতারা পয়সার লোভে অযোগ্য জায়গায়, ছায়াতে ও অযোগ্য সার দিয়া ইহা ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

ভাল ডাঁটা পাইতে হইলে অধিক বালির ভাগযুক্ত অথচ খুব টানের জমিতেই ইহার চাষ করিতে হইবে। সেরূপ জমিতে যত অধিক সময় হাতে রাখিয়া কর্ষণ বা কোদালি করিবার কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায় ও মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ ও বার বার কোদালি করিয়া খুব উত্তপ্ত করিয়া লওয়া যায় ততই ডাঁটা সহজে উৎপন্ন ও ভাল হইয়া থাকে। আমরা বারমেসে জমিই ডাঁটার জন্য বেশী মনোনীত করিয়া থাকি। খুব পচা গোময় ও ইহার সহিত কাঠা

প্রতি দশ সের খৈল দেওয়াই ডাঁটার পক্ষে ভাল সার। কর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা জমিতে দিতে হইবে।

ডাঁটা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর, যথা—আউস, আমন ও হৈমন্তিক। আউস ও আমন ডাঁটার বীজ চৈত্র কিংবা বৈশাখে প্রথম বারিপাতের পরই বপন করিতে হয়। হৈমন্তিক ডাঁটার বীজ বপন কাল আশ্বিনের শেষ কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহ। ইহা সর্ব্বত্র করিতে দেখা যায় না এবং উপরের লিখিত সময় উত্তীর্ণ করিয়া বপন করিলেও ফল ভাল হয় না। যথাসময়ে যত্নের সহিত ফলাইতে পারিলে ইহা যেন অকালের জিনিষের মত মনে হইয়া থাকে এবং খাইতে ভালই লাগে।

আউসে ডাঁটা চৈত্র বৈশাখে বপন করিলে তাহাতে আষাঢ় মাসেই ফুল ধরে, তাহা খাইতেও ভাল লাগে না, একারণ অধিকাংশ লোকই আমন ডাঁটার বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। উহা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত খাওয়া চলে এবং খাইতেও ভাল।

চৈত্র বৈশাখ মাসে ভালরূপ কর্ষিত জমির মাটি স্বভাবতঃই অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। এই অবস্থায় ডাঁটার বীজ বপন করিলে তাহা বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত অঙ্কুরিত হইতে পারে না। আবার অধিক বিলম্বে বৃষ্টিপাত হইলে ডাঁটার সবটা গজায় না এবং যাহা গজায় তাহাও ঘাস জঙ্গলের সঙ্গে অঙ্কুরিত হয় বলিয়া চারা নিড়ানি দিবার উপযুক্ত হইতে না হইতে ঘাসে আবৃত ও আক্রান্ত করিয়া ফেলে; কাজেই ডাঁটা ভাল হইতে পারে না। এই সব কারণে অনেক স্থলেই ডাঁটার বীজ বপনে দেরি হইয়া থাকে। আবার অধিক বৃষ্টিপাতের পর বীজ বপন করিলেও যদি ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হয় তাহা হইলেও ডাঁটা ভাল হইতে পারে না। এই সকল অবস্থা ভাল ডাঁটা ফলাইবার পক্ষে প্রকৃতই এক জটিল সমস্যা। অথচ ঋতু অনুকূল হইলে ডাঁটা ফলাইবার মত সহজ কাজ অতি কমই দেখা যায়। এই সকল সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নিম্নলিখিত উপায়

অবলম্বন করিয়া থাকি এবং ইহার ফলও সন্তোষজনক হইয়া থাকে।

ডাঁটা শীঘ্র পাইতে হইলে বৃষ্টিপাতের জন্য বসিয়া না থাকিয়া গরম জমির উপরই বীজ ছিটাইয়া তখন তখন একবার অনতি-গভীর কোদালি করিয়া মৈ দিয়া রাখিতে হয়। ইহার পর দুই এক দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাত না হইলে ঝাঁজরি দ্বারা জল সেচন করিয়া এমন ভাবে ভিজাইয়া দিতে হইবে যে, যেন তিন-চার ইঞ্চি নীচের মাটিতেও কিছু রস জন্মিতে পারে। ইহার পরদিন পুনরায় কোদালি করিয়া মৈ দিয়া রাখিলে তিন-চার দিন যাইতে না যাইতে রীতিমত ভাল চারাই উঠিয়া থাকে। ইহার পর দু-চার দিন গত হইলে যদি জমি অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় তবে ঐ জমির উপর দুই-তিন সূতা পুরু করিয়া তুঁষ ছড়াইয়া দিয়া ক্রমাগত তিন-চার দিন ঝাঁজরি দ্বারা প্রচুর পরিমাণে জল সেচন করিলে চারা রীতিমত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তারপর চারা তিন ইঞ্চির মত লম্বা হইলে ভাল মত একবার নিড়ানি দিয়া ঘনত্ব ভাঙ্গিয়া দিলেই কাজ প্রায় শেষ হইয়া যায়। ক্রমাগত তিন-চার দিন জল সেচন করিতে গেলে যাহাতে মাটি শক্ত চাপ বাঁধিয়া না যায় সেই উদ্দেশ্যেই তুঁষ ছড়ানো হয়।

এ কাজ অনেকটাই প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের মত। বাজারে ডাঁটা বাহির হইবার পূর্ব্বেই যেন খাইতে পারা যায় প্রধান ভাবে এই উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়। ঘাস-জঙ্গলের প্রভাব এড়াইয়া ভাল ডাঁটা পাওয়াও ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

লাল শাক

ইহা ডাঁটাজাতীয় শাক,—দেখিতে সুন্দর ও তরকারী-বাগানের শোভাবর্দ্ধক। ইহার বীজও দেখিতে ঠিক ডাঁটার বীজের ন্যায়। আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস ইহার বীজ বপনকাল। ইহা ঈষৎ

অম্লস্বাদবিশিষ্ট অতি মুখরোচক শাক। সাধারণতঃ অন্য জাতীয় অম্ল-সংযোগে অম্বল তৈরি করিয়া খাওয়া হয়।

গিমাই শাক

ইহা বড় দুষ্প্রাপ্য শাক ;—সচরাচর পাওয়া যায় না। ইহা পিত্তনাশক গুণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট শাক। সেজন্য আমরা ইহা ফলাইয়া থাকি। ইহার স্বাদ সামান্য তিক্ত হইলেও খাইতে ভাল লাগে।

কচু

কচু খুব লাভের কৃষি এবং ইহার চাষের বিস্তৃতিও বড় কম নহে। স্থানবিশেষের চাষীদিগের কচুই প্রধান চাষের দ্রব্য। কোন কোন স্থানের কচু খাইতে ভাল বলিয়া বেশ প্রসিদ্ধিও আছে। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার এলাকাধীন তরপ ও বানিয়াচুঙ্গ পরগণা ভাল কচুর জন্য বিখ্যাত এবং সে-সব স্থানের কচু শ্রীহট্ট জেলার বাহিরেও প্রচুর রপ্তানি হয়। চট্টগ্রামের কচু কলিকাতার বাজারে পর্য্যন্ত বেচা-কেনা হয়। ইহা প্রকৃতই এক আমোদজনক দৃশ্য। এতদ্দ্বারা কচু-চাষের সাফল্য যে মাটির উপযোগিতার উপরই অধিকভাবে নির্ভর করে এবং তরকারীর মধ্যে কচু যে সর্ব্বত্রই আদরের বস্তু, তাহা সহজেই বলিতে পারা যায়। এই কারণে প্রায় সর্ব্বত্রই লোকে কচুর চাষ অল্প-বিস্তর করিয়াও থাকে।

কচু সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর—জাতি বা মনুষ্যসেবিত কচু (চাষের দ্বারা যাহা করা হয়) ও বন্য বা স্বভাবজাত কচু। জাতি কচুর মধ্যে আবার শ্রেণী ও প্রকৃতিভেদ রহিয়াছে এবং তদনুসারে ইহাদের স্বাদ-গুণের মধ্যেও কতক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। বর্ষার প্লাবনে যে-সব স্থানে হাঁটু পর্য্যন্ত জল দাঁড়ায় সেখানে ইহাদের কতকগুলি ভাল হইয়া থাকে এবং কতকগুলি নীরেট

শুক্‌না জায়গায় করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টা ভাল ও কোন্‌টা মন্দ তাহা ঠিক করিয়া বলা যাইতে পারে না। কারণ দেখা যায় যে, ভাল বলিয়া খ্যাত কচুর মধ্যেও কোন কোনটা খাইতে ভাল হয় না ও মুখে ধরে এবং নগণ্য শ্রেণীর কোন কোন কচু খাইতে বেশ উপাদেয় হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ভাল কচু ফলানো যে অনেকটা যত্নসাপেক্ষ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে, স্বভাব-জাত কচুই যে বহু পুরুষ পরম্পরায় যত্ন-সেবিত হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা স্বতঃই মনে হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাস কচুর চারা রোপণের প্রকৃষ্ট সময়। তদনুসারে মাসাধিক পূর্ব্ব হইতেই জমি প্রস্তুতের কাজে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শুক্‌না জায়গায় যে কচু ফলানো হয় তাহা রীতিমত হাল চাষ করিয়া এবং মাটি অনুর্ব্বর মনে হইলে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ গোময় ও ছাই সার দিয়া চারা রোপণের পূর্ব্বেই ভালমত প্রস্তুত করিয়া লইয়া দেড় হাত অন্তর দড়ি ধরিয়া এক হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। কচুর বীজে গাছ হয় না বা কেহই বীজ দ্বারা গাছ করিতে চেষ্টা করে না। পরন্তু সকলেই পুরনো কচুর মুখের তিন ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া ও কচুর লতা হইতে যে নূতন চারার উদ্গম হয় তাহাই রোপণ করিয়া থাকে। জমি প্রস্তুতের কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই চারা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় ও জমি প্রস্তুত হইলেই তাহা রোপণ করিয়া ক্রমাগত তিন দিন এক বেলা জল দিতে হয়। ইহার পর দুই সপ্তাহ আন্দাজ গত হইলে নিড়ানি দিয়া দাঁড়ার আকারে বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার পর অধিক বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কাজ করিতে হয় না। বৃষ্টিপাত হইয়া মাটিতে যো হইলে একবার ভাল করিয়া নিড়ানি দিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া দাঁড়া তুলিয়া দিতে হয়। তখন কচুর পুরনো পাতা ইত্যাদি ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়াই মাটি ধরাইতে হয়। শুষ্ক ভূমির কচুতে খৈল দিলে তাহা খুব ভাল হইয়া

থাকে। সেজন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই গাছের অবস্থা বুঝিয়া দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় বারের নিড়ানি দিবার সময় প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এক ছাটক পরিমাণ খৈলের গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াই দাঁড়া বাঁধার কাজ সমাধা করা হইয়া থাকে। যত্নাতিশয় সকল উদ্ভিদেরই উন্নতি করিবার প্রধান উপায়। কচুর পুরনো পাতা ঘন ঘন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া ও গাছ হেলিয়া পড়িবার নমুনা দেখা গেলে গোড়ার মাটি ঠিক করিয়া দিয়া গাছকে সোজা রাখিতে পারাই ভাল কচু পাইবার প্রধান উপায়। ইহার জন্য আবশ্যকমত কচুর সারির মধ্যে ছোট আকারের বাঁশের খুঁটি পুতিয়া ও তাহাতে লম্বাভাবে বাঁশ বাঁধিয়া কচু সোজা রাখিবার রীতিও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহা প্রধান ভাবে খুব ভাল ফলনশীল কচুর জন্যই করা হইয়া থাকে। ঐরূপ কচুর মূল্য সুলভতার সময়েও একটা দুই আনার কম নহে।

কচুর জমিতে গবাদি পশুর প্রলোভনের কিছু থাকে না। কিন্তু তথায় ঘাস জন্মিতে দিলে গরু ছাগল ইত্যাদি না খাইয়া ছাড়ে না এবং তাহাদের পাদচারণে কচুর অত্যন্ত অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। ভাল কচু পাইতে হইলে চারা রোপণের পূর্ব্বেই এ সব অত্যাচার নিবারণের উপায় করিয়া লওয়া দরকার।

বর্ষাকালে অল্পজলের স্থানে যে কচু রোপণ করা হয়, তাহার চাষের প্রণালী শুক্‌না জায়গার কচুর মতই। তবে ইহার সব জমি হালের দ্বারা অনুরূপ প্রস্তুত করিতে পারা যায় না এবং অনেক সময় ঋতু রক্ষার অনুরোধে বাধ্য হইয়া জমিতে কাদা থাকিতেই হালের দ্বারা জল কাদা করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। পরে জমি শুকাইয়া যো হইলে ঘন ঘন কোদালি করিয়া মাটি কতকটা ঝরঝরে করিয়া দাঁড়া বাঁধিতে ও জমির বলাবল বুঝিয়া খৈল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয়।

যাঁহারা কচুর চাষে প্রথম প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদের মনে রাখিতে

হইবে যে, শুক্‌না জায়গার কচুর চারা জলমগ্ন স্থানে ও জলমগ্ন স্থানের কচুর চারা শুক্‌না স্থানে রোপণ করিতে গেলে ইহার চাষে অকৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ হয়। সুতরাং চারা সংগ্রহ কালে বিশেষ ভাবে জানিয়া শুনিয়া স্থানের উপযোগী চারাই রোপণ করিতে হইবে।

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, কচুর চাষ লাভের কৃষি। আবার বলি, খামার-সম্পন্ন লোকের মধ্যে যাহাদের কচুর উপযোগী জমি আছে, তাহাদের পক্ষে কচুর চাষে বিরত থাকা কিছুতেই উচিত নহে। কারণ এক বিঘা জমিতে ন্যূনপক্ষে চারি হাজার কচুর চারা রোপণ করিতে পারা যায় এবং সে-সব কচু প্রতিটির মূল্য আকার ও আয়তন অনুসারে দুই পয়সা হইতে পাঁচ-ছয় আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

মুখী কচু

মুখী কচুও স্থানবিশেষে লোকের প্রধান কৃষি এবং লাভের জিনিস। ইহা তরকারী ও পণ্য হিসাবেও একটা বড় জিনিস। আমরা অনেক বার ইহার চাষ করিয়া দেখিয়াছি যে, জমি ভাল হইলে এবং আবশ্যক যত্নের ত্রুটী না হইলে এক বিঘা জমিতে পঞ্চাশ মণ মুখী জন্মাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। মুখার মূল্য কোন কালেই প্রতি মণ এক টাকার কম নহে এবং সময় সময় তিন টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

অধিক বালির ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটি অথচ টানের জমিতে মুখী কচু ভাল জন্মায়। মুখীর জমিতে জল বসিতে দিলে ইহা ভাল হয় না এবং যাহা হয় তাহাও অধিক বৃষ্টিপাতের সময় পচিয়া যায়। এই সব জমির মুখীই খাইতে বিস্বাদ হয় ও মুখে ধরে এবং কোন কোনটা সিদ্ধ হয় না। একারণে মুখীর জমি নির্ব্বাচনকালে খুবই সাবধান হওয়া দরকার। মুখীর বপন কাল চৈত্র বৈশাখ মাস। ফাল্গুনের প্রথম হইতেই জমিতে হাল দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট পরিমাণ

গোময় ও ছাই দিয়া মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ করতঃ বীজ রোপণ করিতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে দুই ফুট অন্তর লাঙ্গল টানিয়া খাদের মধ্যে এক ফুট দূরে দূরে এক একটি করিয়া মূখী রোপণ করিতে (আলুর বীজ বপনের ন্যায়) হয়। গাছ উঠিলে নিড়ানি দেওয়া ও ঐ সঙ্গে দাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাদ্র আশ্বিন মাস মূখী তুলিয়া লইবার সময়। ইতিমধ্যে জমির অবস্থা বুঝিয়া দুই তিন বার নিড়ানি দেওয়ার সময় পুরাতন পাতা-ডগা ও লতা ছিঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা দরকার। মূখীর লতা থাকিতে দিলে সার ও মাটির শক্তি লতার পুষ্টি সাধনে ব্যয়িত হইতে থাকে বলিয়া মূখী নগণ্য আকারের হইয়া থাকে।

শুক্‌না জায়গার কচুর জমির ন্যায় মূখীর জমিতেও দ্বিতীয় বারের নিড়ানি দিবার সময়ে একবার খৈল দিয়া লইলে ইহা বেশ বড় আকারের হইয়া থাকে। এ সকল মূখী খাইতে ভাল।

মান কচু

আয়ুর্ব্বেদ মতে মানকচু একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। বস্তুতঃ ভাল মান-কচু একটি উপাদেয় জিনিষ; কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য ইহার চাষ করিতে প্রায়ই কাহাকেও দেখা যায় না। বাড়ীর কিনারায় যাহা আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে, গৃহস্থেরা তাহাই বাজারে লইয়া গিয়া সময় সময় বিক্রয় করিয়া থাকে। এ সকল অযত্নসেবিত ও কতকটা স্বভাবজাত জিনিষের ন্যায়ই জন্মিয়া থাকে এবং আমার বোধ হয়, ইহার অধিকাংশই গাছপালার ছায়াতে উৎপন্ন বলিয়া ঠিক ঠিক বড় হইতে দীর্ঘ সময় লাগিয়া যায়। সেজন্য বাজারের কেনা মানকচু খাইতে প্রায়ই ভাল হয় না এবং মুখে ধরে বলিয়া তাহা খাইতেই ভয় করে। সুতরাং ভাল মানকচু খাইতে হইলে প্রত্যেকের নিজেরই ফলাইয়া লওয়া দরকার। ইহা জন্মানো বিশেষ কঠিন কাজও নহে।

খুব টানের অথচ যে স্থানে উদয়াস্ত রোদ লাগিতে পারে এরূপ দোঁয়াশ জমিই মানকচুর পক্ষে ভাল। ছাই ইহার প্রধান সার।

যথেষ্ট পরিমাণ ছাই ও কতক গোময় দিয়া মাটি চূর্ণ করিয়া লইয়া চৈত্র বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিপাতের পরই চারা রোপণ করিতে হইবে। চারা তিন হাত অন্তর সমচতুষ্কোন ভাবে রোপণ করিয়া প্রতি তিন মাস অন্তর একবার নিড়ানি দিয়া ঘাস-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। আমরা ক্রমাগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর এইরূপ করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রত্যেক বার নিড়ানি দেওয়ার কালে প্রত্যেক চারার গোড়ায় এক ছটাক আন্দাজ খৈলের গুড়া ও কতক ছাই দিয়া ইহার পুরাতন পাতা ডগা ছিড়িয়া দিলে ইহার কন্দ ভাগ দেড় বৎসরের মধ্যেই দুই ফুটের অধিক লম্বা ও যথেষ্ট মোটা হইয়া পড়ে। ইচ্ছা হইলে তখনই ইহা তুলিয়া খাওয়া যায় এবং ঐ বয়সের মানকচুই খাইতে অধিক উপাদেয় হইয়া থাকে। পরন্তু মুখে ধরিবার আশঙ্কা মোটেই থাকে না।

মানকচুর গাছের শিকড় হইতে অসংখ্য চারা ফুটিয়া বাহির হয়। সুতরাং চারার জন্য কোনই ভাবনায় পড়িতে হয় না। পক্ষান্তরে, দুই-তিন মাস পর পর নিড়ানি দেওয়ার কথা যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে অবহেলা করিলে এই সকল চারাই রোপণ-করা গাছের বৃদ্ধিশীলতার প্রধান অন্তরায় হইয়া থাকে। কাজেই এই সকল উপরি চারাকে নির্যাতন করিয়া রাখা ও নিয়মিত সময়ে নিড়ানি দেওয়া অন্যতম প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হইয়া থাকে।

লতানিয়া গাছ

লাউ, কুমড়া, সীম, ঝিঙ্গা, শশা ইত্যাদি লতানিয়া গাছের আবাদ প্রণালী সকলেরই প্রায় একরূপ। তবে তাহা বিভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে এবং তদ্বিরের সামান্য প্রভেদ করিতে হয় মাত্র।

দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া স্তরে স্তরে গভীর কর্ষণ বা কোদালি করিয়া মাটি প্রস্তুত করা প্রায় সবরকম গাছপালাই অনায়াসে জন্মাইবার প্রধান উপায় একথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। সুতরাং

এক্ষেত্রেও ইহার অন্যথা করিতে পারা যাইবে না একথা বলাই বাহুল্য। লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত স্থানে লাউ কুমড়া ইত্যাদির গাছ রোপিত হইলে ইহাদের শিকড় যতদূর মাটির নীচে যাওয়া উচিত তাহা যাইতে পারে না বলিয়া গাছগুলি অল্প বয়সেই বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। সেজন্য ঐ সকল জাতীয় গাছ রোপণের স্থান বড় আকারের কাটা কোদাল দ্বারা প্রস্তুত করা খুব দরকার।

উল্লিখিত লতানে গাছ রোপণ করিয়া ভাল ফল পাইতে হইলে বীজ বপনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে স্থান নির্দ্দেশ করতঃ চারি ফুট ব্যাস পরিমিত স্থান গভীর কোদালি করিয়া বড় বড় চাকা উঠাইয়া রাখা আবশ্যক: পরে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। ইহার পর এক বার বৃষ্টি হইয়া মাটিতে যো হইলেই আর এক বার ঘন ও গভীর কোদালি করিয়া ঘাস মুথা যাহা পাওয়া যায় বাছিয়া দূর করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে এক চুবড়ি ভাল গোময় সার তথায় ছড়াইয়া দিয়া আবার ঘনভাবে কোদালি করিতে হইবে। ইহার পর অন্ততঃ দুই সপ্তাহ আর কিছু না করাই ভাল। পরে মাটির যো বুঝিয়া ক্রমাগত তিন চারি দিন এক একবার ঘনভাবে কোদালি করিয়া মাটিতে রৌদ বাতাস লাগাইয়া মাটি বেশ হালকা হইয়াছে দেখিলেই মাদার আকারে সমান করিয়া লইয়া শুভদিনে অপরাহ্ণে বীজ পুঁতিতে হইবে। দেশের চাষীদের মধ্যে এইরূপ সংস্কার প্রচলিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্ণে বপন করা বীজের গাছের লতাপাতা অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল হয় ও এই হেতু ফলের সংখ্যা কম ও ফল আকারে ছোট হইয়া থাকে। এজন্য প্রায় সকলেই লতানে গাছের বীজ অপরাহ্ণে বপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। যাহা হউক, সারের তেজ বেশী থাকিতে বীজ বপন করিলে অনেক বীজ নষ্ট হইয়া যায় এবং বীজ পুঁতিবার স্থান নীচু থাকিলেও বীজ পচিয়া যায়। সুতরাং বীজ বপন কালে এই দুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

লাউ

সব্‌জী বিক্রেতার পক্ষে লাউয়ের চাষ অতিশয় লাভের জিনিস। লাউ দুই জাতীয়। এক প্রকার লাউয়ের গাছ জমির উপর লতাইয়া ফল ধরে। ইহাকে ক্ষেত-লাউ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহার গাছ দুই হাত আড়াই হাত লম্বা হইলেই ফল ধরিতে আরম্ভ হয় এবং শীঘ্র ফল ধরে বলিয়া স্থানে স্থানে সব্‌জী বিক্রেতারা ইহাকে চাষের দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইয়াছে। ইহা কেবল তরকারীতেই ব্যবহৃত হয়। জমি হালের দ্বারা ভালমত প্রস্তুত করিয়া চার পাঁচ হাত দূরে দূরে সারিবন্দী করিয়া এক স্থানে দুইটি বীজ বপন করিতে হয় এবং গাছ উঠিয়া পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা হইলে দুই পার্শ্বের মাটি টানিয়া চেপ্‌টা মাদার আকারে গাছের গোড়ায় ধরাইয়া দিলেই কাজ শেষ হয়।

অন্য প্রকার লাউয়ের গাছ অধিক স্থান ব্যাপিয়া লতাইয়া ফল ধরে ও গাছ মাচা বা অন্য কোন কিছু আশ্রয় করিয়া দিবার দরকার হয়। এই জাতীয় গাছে ছোট বড় মাঝারি, লম্বা, গোল ইত্যাদি নানা আকারের লাউ হইতে দেখা যায়। সুতরাং বীজ নির্ব্বাচনের উপরই ইহার সাফল্য অধিকভাবে নির্ভর করে। গোলাকৃতি বৃহদাকারের লাউয়ের খোল দ্বারা সেতার, তানপুরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত হয়। সেজন্য ঐ প্রকার সুগঠিত এক-একটি ভাল লাউয়ের খোলের মূল্য এক টাকারও অধিক হইয়া থাকে। সেজন্য স্থান বিশেষের চাষীরা বিস্তৃত আকারে ঐরূপ লাউ উৎপাদনে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে। আমরা এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, যত্ন-রোপিত এক একটি লাউ গাছে তিন শত হইতে চারি শত পর্য্যন্ত লাউ ধরিয়া থাকে।

লাউ সর্ব্বত্রই শীত ঋতুর একটা বড় তরকারী, সন্দেহ নাই। কিন্তু সব জায়গার লাউ খাইতে ভাল নহে। ভাল মাটিতে ভাল সার দিয়া বিশেষ যত্নের সহিত যে গাছ করা যায় তাহার লাউই

খাইতে ভাল। অধিক এঁটেলের ভাগযুক্ত দোঁয়াস মাটি অথচ টানের জমিই লাউ গাছ ও সুখাদ্য লাউ জন্মাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। একমাত্র গোময় সার দিয়া লাউয়ের গাছ করিলে গাছ ও ফল বৃহদাকারের হয় বটে কিন্তু সে-সব লাউ অত্যন্ত স্বাদ-বিহীন হইয়া থাকে। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা স্বরূপ এ সব কাজ করিতে থাকিয়া ইহাই স্থির বুঝিয়াছি যে, লাউ গাছের পক্ষে ছাগবিষ্ঠাই সর্ব্বোত্তম সার। জমি অত্যন্ত অনুর্ব্বর বা কঠিন হইলে ইহার সহিত খৈল ব্যবহার করা উচিত। লাউ গাছের গোড়ার মাটি সর্ব্বদা সরস না রাখিতে পারিলে গাছ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। সেজন্য ইহার জমি অন্যান্য লতানে গাছের জমি হইতে অধিক সময় হাতে রাখিয়া ও সারের পরিমাণও দ্বিগুণ মাত্রায় ও স্তরে স্তরে দিয়া প্রস্তুত করা বিশেষ দরকার। কারণ জমি ভালরূপ প্রস্তুত না হইলে গাছের গোড়ায় সর্ব্বদা জল সেচন করিয়াও সরসতা রক্ষা করা কঠিন হয়।

শ্রাবণ মাস হইতে পূরা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত লাউ বীজ বপনের সময়। ইহার অনেকটাই স্থান ও ঋতুর অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়। জমি প্রস্তুত হইলে স্থানটিকে অধিক উচ্চ মাদার আকারে গড়িয়া লইয়া এক-একটা মাদার পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে আট-দশটি করিয়া বীজ বপন করা দরকার। চারা উঠিয়া চার-পাঁচ পাতা গজাইলে পর সতেজ ও মোটা দুই অথবা তিনটি মাত্র চারা রাখিয়া অপরগুলি নির্ম্মমভাবে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে এবং গোড়ার মাটি পাতলা ভাবে খুঁড়িয়া কোন কিছুর আশ্রয়ে ধরাইয়া দিয়া মাচায় তুলিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

লাউয়ের গাছ মাচায় না তুলিয়া অন্য কোন প্রকার আশ্রয়ের উপর তুলিয়া দিলেও গাছ হইতে ফল ধরিতে কোন বাধা হয় না। কিন্তু ইহাতে কাকের অত্যাচার হইতে ফল রক্ষা করা একপ্রকার

অসম্ভব হইয়া পড়ে। গাছ ভাল মাচায় তুলিয়া দিলে ফল মাচার নীচে ঝুলিয়া পড়ে বলিয়া কাকের ভোগ্য হইতে পারে না এবং লাউ পাড়িবারও খুব সুবিধা হয়। প্রখর রৌদ্রের দিনে লাউ গাছের গোড়ার মাটির সরসতা রক্ষার জন্য সময় সময় জলসেচনের দরকার হইয়া থাকে। সর্ব্বদা নিয়মিত ভাবে জলসেচন করা ও ইহার পর যথাসময়ে নিড়ানি দেওয়া কতকটা কঠিন কাজ। এই সকল অসুবিধা এড়াইবার উপায়স্বরূপ একবার গোড়ার মাটির অবস্থা বুঝিয়া ক্রমাগত তিন-চার দিন প্রচুর মাত্রায় জল দিয়া মাটিতে যো হওয়া মাত্র ভালমত নিড়ানি দিয়া পানা কিংবা কচুরিপানা, কাটা শেওরা ইত্যাদির কোন একটা দ্বারা পাঁচ-ছয় ফুট ব্যাস পরিমিত স্থান পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া আবৃত করিয়া দিলে মাটির সরসতা অনেক দিন পর্য্যন্ত বজায় থাকে। এই সকল আবরণ ক্রমে পচিয়া গিয়া গাছের বলরক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে।

পুষ্ট, নীরোগ ও সুপক্ক বীজ বপন করা সবরকম গাছপালাকেই দীর্ঘজীবী ও অধিক ফলবান্ করিবার প্রধান উপায়। উপরন্তু লাউ কুমড়া ইত্যাদি যে সকল ফলের একটার মধ্যে অনেকগুলি বীজ থাকে, সে-সবের মধ্য স্থানের বীজ বপন করাই ফলের আকার বড় করিবার অন্যতম প্রধান উপায়, এ কথা বীজ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। দেশে সাধারণতঃ পক্ক লাউয়ের মুখ কাটিয়া গোময়ের গাদার মধ্যে রাখিয়া পচাইয়া খোল হইতে বীজ বাহির করাই রীতি। এই প্রকারে সংগৃহীত বীজ ভাল হইতে পারে না। ভাল বীজ পাইতে হইলে পক্ক লাউয়ের ঊর্দ্ধ ভাগের এক-তৃতীয়াংশ কাটিয়া মধ্যাংশের বীজ হাতে তুলিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে। বীজ তুলিয়া খৈলে পচাইলে উভয় কাজই সাধিত হয়।

বাদ্যযন্ত্রের জন্য লাউ গাছ করিতে হইলে নিজের রক্ষিত বৃহদাকার গোলাকৃতি সুপক্ক লাউয়ের বীজ বপন করাই যথেচ্ছ লাউ পাইবার প্রধান উপায়। গৃহাদির চালের উপর তুলিয়া দিলে যে

লাউ হয়, তাহা লাউয়ের চাপেই টেরা-বাঁকা হইয়া কাজের অযোগ্য হইয়া যায়। সেজন্য লাউ যাহাতে কচি বয়সেই ঝুলিয়া পড়িতে পারে তাহার উপায়স্বরূপ গাছ বৃহৎ ও উচ্চ মাচার উপর তুলিয়া দেওয়াই সঙ্গত। আমরা দেখিয়াছি পুষ্করিণী বা কোন প্রকার জলাশয়ের পাড়ে গাছ রোপণ করিয়া জলের উপর মাচা করিয়া দিলে যে লাউগুলি ঝুলিয়া পড়ে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ আকৃতি হইয়া থাকে। বাদ্য-যন্ত্রাদির খোলের লাউ যে গাছে রাখিতে হইবে তাহার এক গাছে অধিকসংখ্যক লাউ রাখা উচিত নহে। কেননা অধিকসংখ্যক লাউ এক গাছে পাকিতে দিলে কোনটাই উপযুক্ত রূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে না এবং গাছ শীঘ্রই ফল ধরিবারও অযোগ্য হইয়া পড়ে। ভাল লাউ পাইতে হইলে কচি বয়সেই নীরোগ ও নির্দ্দোষাকৃতি পরিমিতসংখ্যক লাউ রাখিয়া অপরগুলি পাড়িয়া ফেলা উচিত।

মিঠা কুমড়া

মিঠা কুমড়া দুই প্রকার:—বর্ষাতি ও হৈমন্তিক। বর্ষাতি কুমড়ার গাছ অনেক স্থান ব্যাপিয়া লতাইয়া ফল ধরে। এই সব গাছ বৃহৎ মাচা অথবা অন্য কোন আশ্রয়ে তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। ইহার বীজ ফাল্গুন চৈত্র মাসে প্রথম বারিপাতের সময়ই বপন করিতে হয়।

হৈমন্তিক কুমড়া দুই প্রকার। এক প্রকারের গাছ জমির উপরই লতাইয়া ফল ধরে। ইহার গাছ ও ফল উভয়ই ক্ষুদ্র আকারের হইয়া থাকে এবং সে-সব কুমড়া খাইতেও তত ভাল নহে। কিন্তু ফল শীঘ্র ধরে ও সংখ্যায় অধিক হয় বলিয়া তাহা প্রায় সব্জী-বিক্রেতারাই অধিক ভাবে ফলাইয়া থাকে। অন্য প্রকার হৈমন্তিক কুমড়ার মধ্যে ছোট বড় মাঝারি, লম্বা গোল ইত্যাদি নানা আকারের কুমড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার গাছ বর্ষাতি কুমড়ার

গাছের মত দীর্ঘ লতানে হয় ও মাচা কিম্বা অন্য কোন প্রকার আশ্রয়ে তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। ইতরবিশেষ সাধারণতঃ স্থান-ভেদে মাটির উপাদানের প্রভেদ বশতঃই এসব কুমড়ার মিষ্ট স্বাদের হইতে দেখা যায়। অর্থাৎ কোন স্থানের কুমড়া স্বভাবতঃই মিষ্ট এবং কোন স্থানের কুমড়া স্বাদবিহীন ও নানাপ্রকার বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অধিক গোময় সার দেওয়া ও অধিক রসাল স্থানের কুমড়াতেই এ সকল দোষ অধিক লক্ষিত হয়। ইহাতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, খুব টানের জমিতে গোময় না দিয়া, খৈল ও অন্যান্য ফসফরাসযুক্ত সার দিয়া ইহার স্বাদের উন্নতি করিতে পারা যাইবে। ইহার জমি প্রস্তুত প্রণালী ও গাছের তদ্বির লাউয়ের মতই করিতে হয়। তবে গাছের গোড়ায় তত ঘন ঘন জল দিবার প্রয়োজন হয় না। মিঠা কুমড়ারও মধ্যাংশের বীজ বপন করা শ্রেয়।

কুষ্মাণ্ড, চালকুমড়া

তরকারীর মধ্যে চালকুমড়া অনেকটা নির্দ্দোষ বলিয়া ইহার আদর সর্ব্বত্রই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে কফ ও পিত্ত নাশক বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং কবিরাজী ঔষধে ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। এই কারণে সময় সময় এক একটি পুরাতন চালকুমড়ার মূল্য এক টাকারও অধিক হইতে দেখা যায়। একমাত্র গোময়ই চালকুমড়া গাছের পক্ষে ভাল সার। চালকুমড়ার চারা পৃথক্ স্থানে করিয়া তুলিয়া রোপণ করিলেই গাছ ও ফলন ভাল হইয়া থাকে। এক স্থানে দুইটির অধিক চারা রোপণ করা উচিত নহে। রোপণের পর চারা একটু বড় হইলে গোড়ার মাটি খুড়িয়া ধরাইয়া দেওয়া ও মাচায় তুলিয়া দেওয়া ভিন্ন অপর কোন তদ্বির করিবার প্রয়োজন হয় না। ইহার গাছ গৃহের চালে তুলিয়া দিলেই ফলন অধিক হয় এবং এই কারণেই বোধ হয় ইহার নাম চালকুমড়া হইয়াছে। বেশী সংখ্যক

কুমড়া গাছে রাখিয়া পাকিতে দিলে গাছ শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হয় ও সঙ্গে সঙ্গে ফল ধরাও বন্ধ হইয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ মাসই চাল কুমড়ার বীজ বপনের ঠিক সময়। অধিক যত্ন করিতে পারিলে তাহা বৎসরের যে-কোন সময়েই ফলাইতে পারা যায়। তবে তাহাতে কালের কুমড়ার ন্যায় তত অধিক ফলাও হয় না।

চাল কুমড়ার বীজ কুমড়া হইতে বাহির করিয়া তখন তখন বপন করিলেই গাছ ভাল হয়। বীজের মধ্যে সুপক্ক কুমড়া ঘরে রাখিয়া বীজ বপনের সময় তাহা কাটিয়া বাহির করিয়াই বীজ বপন করিতে হইবে। অন্যান্য লতানে গাছের জমির ন্যায় ইহার জমিও অধিক সময় হাতে রাখিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে।

ঝিঙ্গা

তরকারীর মধ্যে ঝিঙ্গার ব্যবহার-বাহুল্য সর্ব্বত্র দেখা যায়। ইহার জমি ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে অন্যান্য লতানে গাছের জমির ন্যায় প্রস্তুত করিতে হয় এবং চৈত্র মাসে প্রথম বারিপাতের পরই বীজ বপন করিতে হয়। এক-এক স্থানে পাঁচ-সাতটি করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। চারা উঠিয়া একটু বড় হইলে সতেজ দুই বা তিনটি চারা রাখিয়া অপরগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে চারার গোড়া ঈষৎ খুঁড়িয়া মাটি কতক ধরাইয়া দিয়া উচ্চ মাচা বাঁধিয়া অথবা কঞ্চি সহ বাঁশের আগা পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঝিঙ্গার গাছ ঘন রোপিত হইলে ফলন কম হয় এবং গাছও শীঘ্র নষ্ট হয়। আবার গাছে অধিকসংখ্যক ঝিঙ্গা পাকিতে দিলেও গাছ শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া যায় এবং ফল ধরাও বন্ধ হয়। বীজের জন্য দু'চারটি নিখুঁত ও সুপক্ক ঝিঙ্গা রাখিয়া অপরগুলি সঙ্গে সঙ্গেই পাড়িয়া ফেলা উচিত। বীজের জন্য রক্ষিত ঝিঙ্গা যথাসময়ে পাড়িয়া আস্তই রাখিয়া বীজ বপনের সময় খোসার ভিতর হইতে বাহির করাই ভাল বীজ পাইবার প্রধান উপায়। ইহার মধ্য-স্থানের বীজ বপন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত।

চৈত্র মাসে এক প্রকার ঝিঙ্গা ফলে। ইহার বীজ অগ্রহায়ণ মাসে বপন করিতে হয় এবং সে-সব গাছের গোড়ায় সময় সময় জল সেচনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অন্যান্য তদ্বির বর্ষাকালের ঝিঙ্গার মত।

শশা

শশার জমি প্রস্তুত, বীজ বপনের সময় এবং তদ্বির সমস্তই ঝিঙ্গার মত। ইহার এক শ্রেণী চৈত্র মাসেই ফলিয়া থাকে। ঐ জাতীয় শশার বীজ অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে বপন করিতে হয়।

উচ্ছে ও করলা

উচ্ছে ও করলা গাছের দৃশ্য ও ফলের আকৃতি-প্রকৃতি এবং স্বাদ প্রায় একই মত। প্রভেদ কেবল উভয়ের আকারের মধ্যে। উচ্ছে ক্ষুদ্রাকার এবং করলা কোন কোন স্থানে প্রায় এক হাত লম্বা হইয়া থাকে। উচ্ছে গাছ কোন কোন স্থানে আপনা হইতেই হইয়া যথেষ্ট ফল ধরে এবং ইহাতে প্রায় কোন যত্নের দরকার হয় না। কিন্তু করলার গাছ কতকটা সুখী ধরণের। সেজন্য ইহার বীজ শশা ঝিঙ্গার মত এক সময়ে বিশেষ যত্নের সহিত বপন করিতে হয় ও অন্যান্য তদ্বিরও ঝিঙ্গা ইত্যাদির মতই করিতে হয়। ইহা বৎসরে দুই বার ফলিয়া থাকে।

কাক্‌রোল

তরকারীর মধ্যে কাক্‌রোলের আদর প্রায় সর্ব্বত্র। ইহার বীজের গাছে ফল ধরে না। মাটির নীচে ইহার পুরাতন মূল জীবিত থাকিয়া যায় এবং তাহা হইতে চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টিপাতের পর গাছ উঠিয়া থাকে। কেহ কেহ এই সকল স্বভাবজাত গাছকেই আশ্রয়ে তুলিয়া দিয়া ফল ধরাইবার চেষ্টায় থাকে। ভালরূপ কর্ষিত ও সারযুক্ত জমিতে অন্য স্থান হইতে কাক্‌রোলের মূল তুলিয়া আনিয়া রোপণ করিলে তাহা হইতে যে গাছ হয়, তাহা যত্নের

সহিত আশ্রয়ে তুলিয়া দিলে যেরূপ পুষ্ট ও মনোরম কাক্‌রোল জন্মে ও ইহার সংখ্যাধিক্যও হয়, স্বভাবোৎপন্ন গাছে সেরূপ ফলন বা পুষ্ট কাক্‌রোল হয় না।

কাক্‌রোলের মূল তুলিয়া রোপণ করিতে হইলে ইহার জমি প্রস্তুতের কাজ পৌষ মাঘ মাস মধ্যেই শেষ করিয়া ফাল্গুনের প্রথমেই মূল রোপণ করা দরকার। আমরা আলু ও কপির জমি প্রস্তুত করিয়া তথায় কপির চারা রোপণ ও আলুর বীজ বপনের পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে কয়েকটি কাক্‌রোলের মূল পুতিয়া রাখিয়া দেই এবং তাহা কপি বা আলু তুলিবার পর যখন অঙ্কুরিত হইয়া উঠে তখন গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিয়া আশ্রয়ে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। কাজেই কাক্‌রোলের গাছ জন্মাইবার জন্য স্বতন্ত্র-ভাবে চেষ্টা করিতে হয় না। অথচ ফলনও অধিক হয় এবং কাক্‌রোলও পুষ্ট হইয়া থাকে।

কাক্‌রোলের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর গাছ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে কোন কালেই ফল ধরে না। ইহাকে সাধারণতঃ অ-ফলা কাক্‌রোল নামেই অভিহিত করা হইয়া থাকে। সেজন্য কাক্‌-রোলের মূল রোপণ করিবার সময় যাহা তাহা হইতে মূল না আনিয়া যে-সব গাছে ফল ধরিতে দেখা গিয়াছে, তাহাই রোপণ করিতে হইবে।

সীম

তরকারীতে সীমের ব্যবহার কম নহে। ইহা বহু প্রকারের এবং জাতি অনুসারে স্বাদের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য হয়। আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ফলিতে আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাসে গিয়া শেষ হয়। ইহার কতকগুলি তরকারীতে ও কতকগুলির বীচি দাইল-রূপে ব্যবহৃত হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির পর কোন কোন জাতীয় সীমের গাছে ফল ধরিতে থাকিলেও প্রায় কেহ তাহা রাখে না। কারণ সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা সংস্কার প্রচলিত যে, সীম

গাছে নাকি বিদ্যুতের আকর্ষক পদার্থ আছে, যাহা হইতে ইহার উপর বজ্রপাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। ইহার কোন বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি-প্রমাণ আমরা পাই নাই।

বৈশাখ মাস হইতে সামান্য পরিমাণ গোময় ও খৈল বিমিশ্র ভাবে দিয়া সীমের জমি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কারণ ইহাদের কতকগুলি—আশ্বিন মাসেই যাহার ফুল ফল হয়, তাহাদের বীজ বপন কার্য্য আষাঢ়ের প্রথমেই সমাধা করিতে হয়। ইহাদের তদ্বির প্রায় অন্যান্য লতানে গাছেরই ন্যায়। তবে ইহাতে আশ্রয় অধিক ও পাতলা ভাবে দেওয়া বিশেষ দরকার। সীমের গাছ অন্যান্য লতানে গাছ অপেক্ষা অধিক সময় স্থায়ী হয় বলিয়া গাছের গোড়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিয়া মাটি ধরাইয়া রাখা উচিত।

পটোল

পটোল একটি ভাল তরকারী এবং ইহার আদর সর্ব্বত্রই একরূপ। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহার ত্রিদোষ (কফ পিত্ত বায়ু)-নাশক গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, ইহার চাষ অন্যান্য সব্জীর ন্যায় ধরা-বাঁধা নিয়মে করিতে দেখা যায় না। বারুজীবীগণ পানের বরজের মধ্যে স্থানে স্থানে যাহা কিছু উৎপাদন করে তাহাই বাজারে বিক্রিত হয়। সে-সব পটোল আকারে ছোট এবং আমার বোধ হয় নিরবচ্ছিন্ন ছায়াতে উৎপন্ন হয় বলিয়া খাইতে পশ্চিমাঞ্চলের পটোলের মত ভাল হয় না।

একটু অধিক এঁটেলের ভাগযুক্ত উর্ব্বরা দোআঁশ মাটি অথচ টানের জমিই পটোলের চাষের পক্ষে উপযোগী। কার্ত্তিকের প্রথম ভাগেই ইহার চারা রোপণ করিতে হয় এবং ফাল্গুন চৈত্র মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়া শরৎকাল পর্য্যন্ত ফলিয়া থাকে। ইহার বীজোৎপন্ন গাছ ক্বচিৎ ফলবতী হয়। ইহার মূল হইতে যে গাছ হয়, তাহাতেই অধিক ফল ধরে বলিয়া সর্ব্বত্র তাহাই রোপিত হইয়া থাকে। পটোলের গাছ একবার রোপণ

করিয়া যত্নের সহিত রাখিতে পারিলে ক্রমাগত দুই তিন বৎসর জীবিত থাকিয়া যথাসময়ে ফল ধরিয়া থাকে।

পটোলের জমি ভাদ্র মাস হইতেই প্রস্তুত করিতে হয়, এবং তাহাতে কাঠা প্রতি আধ মণ খৈল ও চারি মণ হিসাবে গোময় দেওয়া ও মাটি খুব চূর্ণিত হওয়া বিশেষ দরকার। পটোলের জমিতে বৃষ্টির জল বসিতে দিলে গাছের গোড়া পচিয়া মরিয়া যায়। সেই জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া পাঁচ হাত অন্তর অন্তর ছোট নালা কাটিয়া নালার মাটি জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। প্রতি দুই নালার মধ্য স্থানের জায়গাকে বৃহৎ মাদার আকারে টান করিয়া লইয়া মধ্য স্থানে সারিবন্দী করিয়া তিন হাত দূরে দূরে মূল রোপণ করিতে হইবে।

পটোলের লতা মাটিতে লতাইতে দিলে মাটি সংলগ্ন লতার প্রত্যেক গাইট হইতে শিকড় জন্মিয়া থাকে এবং তাহাই ক্রমে মোটা হইয়া মূলে পরিণত হয়। ঐ লতা শিকড়সমেত উঠাইয়া প্রত্যেক পত্র-গ্রন্থি বা মূলটাকে মাঝে রাখিয়া কাটিয়া টুকরা করতঃ জমির এক এক স্থানে এক একটি করিয়া রোপণ করিতে হইবে। পুঁতিবার কালে রোপণ-স্থানের চিহ্নস্বরূপ লতার উভয় মাথা চন্দ্রবিন্দুর আকারে মাটির উপরে ভাসা রাখিয়া কেবল মূলটা কাটির নীচে ডুবাইয়া রোপণ করিয়া হাতে চাপিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে সমস্ত মূল রোপণ করিয়া প্রত্যেকটার উপরে তিন ফুট ব্যাস পরিমিত স্থান খড় বা বিচালি দ্বারা পাতলা ভাবে ঢাকিয়া ইহার উপর ক্রমাগত কয়দিন আন্দাজমত জল দিয়া জমির আবশ্যক সরসতা রক্ষা করিতে পারিলে দুই সপ্তাহের মধ্যেই গাছ গজাইয়া উঠে।

পটোলের জমিতে ঘাস বা আগাছা হইতে দেওয়া অতিশয় অনিষ্টকর। সেজন্য প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নিড়ানি দেওয়া দরকার হয়। উপরন্তু গাছ উঠিয়া আট-দশ অঙ্গুলী আন্দাজ

লম্বা না হওয়া পর্য্যন্ত রোপণ স্থানের খুব নিকটের মাটি একটুও নাড়া-চাড়া করা উচিত নহে। চারা উঠিয়া বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে গোড়ার নিকটে নিড়ানি দিতে হইবে।

জমিতে খড় বা বিচালি বিছাইয়া দিলে পটোলের গাছ সে-সবের উপরে লতাইয়া ফল ধরে মাচায় তুলিয়া দিলেও ফল ধরিতে পারে। উক্ত উভয় প্রকারের মধ্যে মাচায় লতানো গাছের ফলই আকারে বড় ও খাইতে ভাল হয়। পটোল-বিক্রেতারা মাচা করিবার ব্যয় এড়াইবার উদ্দেশ্যেই যে গাছকে মাটিতে লতাইতে দিয়া থাকে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বরবটি

লোকে খাইবার জন্য সাধারণতঃ দুই-একটি করিয়া বরবটির গাছ করিয়া থাকে কিন্তু জলপ্লাবিত স্থানসমূহে বর্ষাকালে কয়মাস ইহা দ্বারা গো-পালনের অনেক সাহায্য হয় বলিয়া এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার কাচা গাছ গোজাতির অতিশয় প্রিয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। ফাল্গুন চৈত্র মাসে জমি হালের দ্বারা ভালরূপ প্রস্তুত করিয়া বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে যো হইয়াছে দেখিলেই বিঘাপ্রতি দেড় সের বীজ ছিটাইয়া দিয়া ভালমত একটা চাষ ও সঙ্গে সঙ্গে মই দেওয়া দরকার। ইহার পর দুই মাস গত হইলে ইহার গাছ গো-খাদ্যের উপযুক্ত হয়। যাহাদের গরু আছে তাহাদের পক্ষে এক বিঘা জমি উক্ত প্রণালীতে বপন করিলে তদ্দ্বারা প্রায় দুই মাস কাল দুইটি গরুর সবুজ খাদ্যের অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। অথচ গরুগুলিরও পুষ্টির সহায়তা হয়। গাছ দুই মাসের হইলে এক দিক হইতে কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়াইতে হয়। খাইবার উদ্দেশ্যে বপন করিতে হইলে অন্যান্য লতানে গাছের

ন্যায় বরবটিরও মাদা করিয়া বীজ বপন করিতে হয় ও গাছ লতাই-বার আশ্রয় করিয়া দিতে হয়। বরবটি খাইতে মন্দ জিনিস নয়। ইহাতে ভিটামিন অধিক আছে জানিয়া বর্ত্তমানে শিক্ষিত লোকের ইহা খাওয়ার আগ্রহ বাড়িয়াছে। বরবটি সাদা কাল লাল ইত্যাদি কয়েক প্রকারেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সাদা বরবটিই খাইতে ভাল। সবজী-বিক্রেতার পক্ষে ইহা করা লাভজনক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ফুল

ফুলের সার্থকতা ঃ—ফুল মানুষের সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিকাশের স্বাভাবিক সহায়। সেজন্য প্রত্যেক মানবেরই স্ব স্ব গৃহ-প্রাঙ্গণে দুই-চারিটি মনোহর ফুলের গাছ রোপণ করা উচিত বলিয়া বোধ হয়। জগতে ফুল না থাকিলে কি আমাদের জীবন ধারণের কোন ব্যাঘাত হইত? এই প্রশ্নে যখন চিত্ত আন্দোলিত হয় তখন মনে হয় যে করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে আনন্দ দিবার জন্যই এই অত্যদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যের অবতারণা করিয়াছেন। দুর্গন্ধযুক্ত কদর্য্য মৃত্তিকা হইতে মনোহর গন্ধ ও বিচিত্রবর্ণ ফলফুলের সৃষ্টির বিষয় ভাবিতে গেলে ইহাদের স্রষ্টার মহিমা অজ্ঞাতসারে স্মরণ করাইয়া দিয়া ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। ফুলবাগান জিনিসটি এদেশে সুরুচি-সম্পন্ন লোকের বাড়ী পরিচয়ের একটা চিহ্ন বা স্বাভাবিক উপায় ছিল। কালক্রমে মানুষের রুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন নানা কৃত্রিম জিনিষের প্রতি ধাবিত হইতেছে। সেজন্য ফুলের সার্থকতার কথা লিখিতে বসিয়াই ভক্তকবি শিশিরকুমারের নিম্নলিখিত কবিতা স্মরণ পথে উদিত হইল।

> "সেটি বনফুল সুন্দর অতুল
> রাখিলেন তৃণ মাঝে।
> কত লোক যায় নাহি দেখে তায়,
> বিব্রত সংসার কাজে।
> ধরিব সেজনে, যেবা আঁকে বনে
> দিবানিশি ভাবি তাই;
> জিজ্ঞাসি সবারে তার পরিচয়
> যাহারে সম্মুখে পাই॥"

আবার বলিতেছেন—

"প্রতি দলে দলে কত কারিগিরি
মন দিয়া যেবা দেখে,
এ-সব সৌন্দর্য্য আপনি হয়েছে
এ ভরম নাহি থাকে।
কত ফুল দল নিহারে সরস
কত ফুল ফুটিয়াছে,
মনে হয় যেন ফুলে রং দিয়া
এই মাত্র পলায়েছে।"

বিচিত্র পুষ্পজগতের অন্তরালে কবি অজ্ঞেয় শিল্পীর হস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন। আজ বস্তুতন্ত্রময় যুগে আমরা প্রকৃতি হইতে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছি বলিয়া সৌন্দর্য্যস্পৃহাকে কৃত্রিম উপায়ে মিটাইতে বাধ্য হইতেছি। এই বিচ্ছেদের অপরিহার্য্য পরিণতিস্বরূপ মানুষের পবিত্র ও সহজ আনন্দ লাভের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে। ভক্তকবি শিশিরকুমার পুষ্পজগতের অন্তরালে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তার সত্তা সম্বন্ধে যে অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন অনুরূপ ভাবপ্রবাহ বিখ্যাত উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানবিদ্ মনীষী লিন্নের মনেও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।* পত্রপুষ্পের লীলাবৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যান রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতায় মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

* Linne writes—"I saw the Infinite—all knowing—all powerful God, from behind moving forwards, and my brain got confused. I followed his footsteps on the fields of nature and everywhere I found the sign of his foot-prints,—of his infinite wisdom and power. I saw how all living beings are nurtured by the vegetation of earth,—how the earth is moving day and night round the sun which gives the light and life. If one calls Him—Fate, one does not err. For everything hangs on his finger. If one calls Him—Nature, one also does not err. For, everything comes from Him. One is justified if one calls him Providence. For, everything becomes and moves according to His will."

লিন্নে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, তিনি অনাদি, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন। প্রকৃতির লীলাভূমিতে তাঁহার পদচিহ্ন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। পৃথিবীতে যে ফল-শস্যাদি উৎপন্ন হয় তাহা খাইয়া যাবতীয় জীবজন্তু প্রাণধারণ করিতেছে। এই পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, আবার সূর্য্য হইতে জীবন ও আলো বিনিঃসৃত হইতেছে। পরমেশ্বরকে 'অদৃষ্ট' 'প্রকৃতি' যাহাই বলা হউক না কেন, কিছুই ভুল নহে। তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলাও প্রমাণসহ, কারণ প্রতিটি বস্তুই তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্ট ও প্রাণবন্ত হইতেছে।

এ দেশে হিন্দুর নিকট ফুল দেবপূজার জিনিস বলিয়া সমাদৃত। রাজা বাদ্‌শাদের পুষ্প ও উদ্যানপ্রীতি সর্ব্বজনবিদিত। যে-সব আদিম জাতি সোনারূপার অলঙ্কার ব্যবহারে অনভ্যস্ত, ফুলই তাহাদের প্রধান অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হয়। বর্ত্তমানে অনেকে ইহাকে সৌন্দর্য্য উপভোগের উপকরণ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। নানা উৎকৃষ্ট জাতীয় ফুল উৎপাদন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করা ধনবান লোকের পক্ষেই সম্ভব। কারণ ফুলের চাষে অর্থব্যয় আছে। দুঃখের বিষয়, পল্লীবাসী জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা ক্রমে ইহার প্রতিকূল হাওয়ায় সাধারণের বাড়ীতে ভাল জাতীয় ফুল নয়নগোচর হওয়া ক্রমেই দুর্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা দেশের সাধারণের আর্থিক ও কৃষ্টিগত দারিদ্র্যের লক্ষণ মনে হয়।

ফুলের চাষে লাভঃ কোন বস্তুর দ্বারা মনের প্রফুল্লতা সাধন করাব সঙ্গে সঙ্গে যদি ইহা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের বা উপরি আয়ের কোনও সুবিধা করা যায় তবেই তাহা গরীবের পক্ষে স্পৃহনীয় হইতে পারে। হল্যাণ্ডের ফুল-চাষীরা বিভিন্ন জাতীয় ফুলের চাষ করিয়া বিস্তর লাভ করিয়া থাকে বলিয়া জানা যায়। সুইডেনে ফুল বিক্রয়ের জন্য বিরাট্ প্রতিষ্ঠান আছে। এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে নাকি দেশের সর্ব্বত্রই সুলভে ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে যে-কোন জাতীয় ফুল বৎসরের যে-কোন সময়ে পাওয়া যায়। ফুলের ব্যবসার অনুরূপ ব্যবস্থা বহু সভ্য দেশেই বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানা যায়। শীত-প্রধান দেশে ফুল-ব্যবসায়ী ও চাষীগণ 'গ্লাস হাউস' তৈরি করিয়া কৃত্রিম উত্তাপের দ্বারা বিক্রয়ের জন্য ফুল উৎপাদন করিয়া থাকে। আমাদের দেশে জলবায়ুর গুণে স্বভাব-নিয়মেই বহুপ্রকার সুগন্ধি পুষ্প জন্মিয়া থাকে। প্রণালীবদ্ধভাবে ইহাদের ব্যবসামূলক চাষ বৃদ্ধির সম্বন্ধে অবহিত হইলে ফুল উৎপাদনকারী লাভবান হইতে পারেন।

বড় বড় শহরের বাজারে আজকাল ফুল বিক্রয় একটা ব্যবসায়ে

পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে এক শ্রেণীর লোক ফুল বেচিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। তা' ছাড়া ফুলের অন্যবিধ ব্যবহারও আছে। বাজারে বন্দরে যে লক্ষ লক্ষ টাকার আতর গোলাপ ও অসংখ্যপ্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য বেচাকেনা হইতেছে, ইহাদের অধিকাংশই পুষ্পজাত। ইহা কোথায় কি ভাবে জন্মাইতেছে ও ইহার লাভালাভের হিসাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইতে পারিলে কৃষিকার্য্যের একটা অঙ্গ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে মনে হয়। গাজিপুরের আতর ও গোলাপ জলের কারখানার কথা আজকাল অনেকের নিকট সুবিদিত। তথায় কৃষকেরা বিস্তৃত মাঠ জুড়িয়া গোলাপ ফুলের চাষ করিয়া উপরোক্ত কারখানা-সমূহে ফুল বিক্রয় করিয়া বিস্তর উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এদেশে তাহা হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে শিক্ষিত কৃষিপন্থীদেরই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টান্বিত হওয়া উচিত। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, যে-সকল স্থানে অতিমাত্রায় বৃষ্টিপাত হয়, তথাকার ফুল বৃষ্টির জল ও আর্দ্র বায়ুতে স্নাত হওয়ায় ইহাদের গন্ধের তীব্রতা ও মনোহারিত্ব কম হয়। সেজন্য ঐ সকল ফুল দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর কোন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না; পরন্তু শুষ্ক বায়ুযুক্ত স্থানের ফুলই ঐ কাজের উপযোগী, ইহাও বলিয়া থাকেন। তবে কথা এই যে, শুষ্ক প্রদেশ-সমূহের ফুলের মূল্য যতই অধিক হয় তাহা উৎপাদন করিতে জলসেচন ইত্যাদিতে ব্যয়ও তদনুরূপ অধিক হইয়া থাকে। সেই হিসাবে এ দেশের ব্যয় অনেক কম হইবে। কাজেই এদেশোৎপন্ন ফুল দ্বারা প্রথম শ্রেণীর সুগন্ধি দ্রব্য না হইলেও দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর যাহা হইতে পারে, তাহাতেই লাভ থাকিবে মনে হয় সুগন্ধি পুষ্পসমূহের মধ্যে গোলাপ ফুল বার মাস ফুটিয়া থাকে কিন্তু শীতকালের ফুলই ঐ কাজের অধিক উপযোগী এবং গোলাপ শীতকালেই অধিক হইয়া থাকে। বেল, যুঁই, চামেলী, রজনীগন্ধা ইত্যাদি বর্ষাকালের ফুল সম্বন্ধেই ঐ সকল কথা অধিক বিবেচ্য

হইতে পারে। ব্যবসার জন্যই হউক আর নিছক আনন্দলাভের জন্যই হউক ফুলের চাষে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বিভিন্ন ফুলের চাষ ও পরিচর্য্যা সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয় করাই এই কার্য্যে সফলতা লাভের উপায়।

ফুল-বাগানের জমি প্রস্তুতঃ—সকলপ্রকার গাছপালার জমিই উত্তমরূপে কর্ষণ করিয়া ও উপযুক্ত সার দিয়া প্রস্তুত করা দরকার। ফুলের বাগান করিতে হইলে সে-সব কাজ অধিকতর মনোযোগের সহিত করা উচিত। কারণ স্থায়ী ফুলের গাছ এক বার জমিতে বসাইয়া দিলে তাহাতে আর কর্ষণ করিতে পারা যায় না। ফলে ফুল-বাগান মধ্যে ঘাস ও আগাছার প্রভাব বাড়িয়া গাছগুলিকে নিস্তেজ ও রুগ্ন প্রকৃতির করিয়া রাখে,—যাহা তাহাদের ফুল ধরিবার ও ফুলের আকার রীতিমত বড় হইবার পথে এক প্রধান অন্তরায়। সেই সকল কারণে চারা রোপণের দুই মাস পূর্ব্ব হইতে বড় আকারের কাটা কোদাল দ্বারা জমি ঘন ঘন গভীর কোদালি করিয়া ঘাস জঙ্গলের প্রভাব নষ্ট করিয়া চারা রোপণ করা দরকার। অকর্ষিত ভূমিতে চারা রোপণ করিলে তাহা বাঁচানো অতিশয় কষ্টসাধ্য হয় একথা কর্ষণ অধ্যায়ে কর্ষণের অভাব প্রসঙ্গে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে স্মরণ করিতে হইবে। জমি অনুর্ব্বর মনে হইলে কোদালি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যথেষ্ট পরিমাণ গোময় সার দিয়া তাহা প্রস্তুত করা অত্যন্ত দরকার। ভবিষ্যতে উন্নতি ও শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবার জন্যই বাগানের এ সকল কাজ খুব মনোযোগের সহিত করিতে হইবে।

জমির মাটি যথারীতি প্রস্তুত করিয়া কোন চারা রোপণ করিলে তাহা প্রায় মরে না, পরন্তু শীঘ্র শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই দৃষ্টান্ত হইতে যেখানে সমস্ত স্থান জুড়িয়া এক সঙ্গে কোদালি করিবার সুবিধা হয় না, তেমন স্থানে অথবা পুরাতন বাগানের মধ্যে

দুই একটা করিয়া চারা রোপণ করা আবশ্যক হইলে আমরা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া অন্ততঃ তিন ফুট ব্যাস পরিমিত স্থানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অধিক সময় হাতে রাখিয়া কোদালি করিয়া মাটি উপযোগী করি ও চারা রোপণের ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

সকল ফুল গাছের আয়তন ও প্রকৃতি একরূপ নহে এবং এই কারণে তাহাদের তদ্বির প্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য ঘটাইতে বাধ্য হইতে হয়। এই কারণে ফুলের জাতি ও গাছের আয়তন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করিয়াই বাগানে রোপণ করা উচিত এবং তদনুসারে জমি প্রস্তুত করিবার সময়ে যে স্থানে যে জাতীয় গাছে যে সার অধিক উপযোগী ও যে পরিমাণ দেওয়া আবশ্যক তাহা দিয়া জমি প্রস্তুত করতঃ জল চলাচলের নালা নর্দ্দমা ঠিক করিয়া লইয়া চারা রোপণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গোলাপ ফুল

গোলাপ ফুল সুগন্ধ ও সুদৃশ্যের জন্য সর্ব্বত্রই বিশেষ আদরণীয়। কিন্তু সে-সব দৃশ্য ও গন্ধের মনোহারিত্ব ফুটাইয়া তোলা বিশেষ যত্ন ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ। এজন্য প্রথমেই গোলাপ ফুলের গাছের তদ্বির বা পরিচর্য্যা প্রণালী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

গোলাপ ফুলের জাতি অসংখ্য। ইহাদের গাছ ও ফুলের আকৃতি প্রকৃতি গঠন ও গন্ধের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ বর্ত্তমান। তদনুসারে তাহাদের যত্নেরও কতকটা তারতম্য করিতে হয়। কাজেই গোলাপ বাগান করিয়া চরিতার্থ হইতে হইলে অগ্রে সে-সবের মোটামুটি পরিচয় করিয়া লওয়া বিশেষ দরকার। তাহা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, গোলাপ ফুল জাতিতে অসংখ্য হইলেও ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত এবং তদনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর গাছের ডাল ছাঁটিবার, কাটিবার ও অন্যান্য তদ্বির প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ সেই সকলের প্রকৃতি অনুসারে যেরূপ

শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন ও আমরা ইহার পরিচয় যতটা করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে দেখা যাইতেছে।

হাইব্রিড পারপেচুয়াল (Hybrid Perpetual) ঃ—এই শ্রেণীর গোলাপের গাছ অধিকাংশই আকারে বৃহৎ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহাদের কোন কোন জাতীয়ের গাছ দশ-বার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে এবং ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশের গাছই ঘন কাঁটা-বিশিষ্ট এবং কতিপয় সংখ্যক একেবারে কাঁটা-শূন্যও আছে। হাইব্রিড গোলাপের মধ্যে লাল সাদা হলদে গোলাপী ইত্যাদি নানা বর্ণের, ছোট বড় মাঝারি আকারের মনোহর গন্ধবিশিষ্ট বহু প্রকারের রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি নামজাদা ফুল, যাহাদিগকে রূপে গুণে পুষ্প-রাজ্যের শিরোমণি বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।

টি সেণ্টেড (Tea scented) **গোলাপ** ঃ—এই শ্রেণীর গোলাপেরও অনেক রকমারি আছে এবং ইহাদের মধ্যে অনেক সুদৃশ্য ফুল রহিয়াছে। ইহাদের কদাচিৎ কোন কোনটাতে বেশ সুগন্ধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ফুলই চায়ের গন্ধবিশিষ্ট এবং এই কারণেই টি সেণ্টেড নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। বিদেশীদের বাগানেই এই শ্রেণীর গোলাপের অধিক ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই দৃষ্টান্তে বর্ত্তমানে উদ্যান-প্রীতি-সম্পন্ন কোন কোন শিক্ষিত মহলে ইহার আদর দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদের কোন কোন জাতীয়ের গাছ উর্দ্ধে পাঁচ-ছয় ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া থাকে এবং অধিকাংশই নিম্ন আয়তন ও ঘন শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ঘন ঝোপের মত হয়। এই কারণে তাহা বৃহৎ টব বা গামলার মধ্যে রোপণ করিয়াও ফুল ফুটাইতে পারা যায়। ইহাদের ব্যবহার-বাহুল্যের ইহা অন্যতম প্রধান কারণ। বস্তুতঃ এ সকল গোলাপের গাছে

গৃহাদির বারান্দা সাজাইবার এবং ইচ্ছামত তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার এবং আমোদ-বৃত্তি চরিতার্থ করিবার পক্ষে খুবই সুন্দর জিনিস।

লভানে গোলাপ শ্রেণী ঃ—ইহারা সংখ্যায় অধিক নহে। কিন্তু যে কয়টি আছে, তাহার মধ্যে সুদৃশ্য ও সুগন্ধযুক্ত ফুল রহিয়াছে। ইহাদের গাছ লতাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যায়। সেজন্য গাছ করিতে গেলে তাহা জাফরিতে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়। পুষ্পানুরাগী সৌখিন লোকদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও এই শ্রেণীর গোলাপের গাছ দ্বারা ফটক সাজাইতে দেখা যায়।

চিনা গোলাপ শ্রেণী ঃ—ইহার গাছ আকারে ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহার গাছে নানা বর্ণের অসংখ্য সুদৃশ্য ফুল ফুটে। এই কারণে সর্ব্বত্রই ইহার গাছ টব সাজাইবার জন্য আদৃত হইয়া থাকে।

উপরে যে চারি শ্রেণীর গোলাপের কথা বলা হইল তাহা ছাড়াও নানা রকমের আরও অনেক প্রকার গোলাপ রহিয়াছে। ইহাদের সকলগুলির বর্ণনা স্থানাভাব হেতু সম্ভব নহে। সেজন্য যে সকল শ্রেণীর গোলাপের চারা সচরাচর সর্ব্বত্রই রোপণ করা হয় তাহাই লিখিয়াছি। এখন ইহাদের চারা উৎপাদন করিবার উপায় বা প্রণালী বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কারণ সর্ব্বদা চারা ক্রয় করিয়া গোলাপ বাগানের সৌষ্ঠব সম্পাদন করা অতিশয় কঠিন ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

চারা বা কলম প্রস্তুত ঃ—গোলাপের কলম করিবার নানা প্রণালী। ইহার মধ্যে খোঁচা কলম (cutting), জোড় কলম (grafting) ও গুটী কলমের (layering) চারাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। এ সকল কলম করা সহজসাধ্য বলিয়া নিম্নোক্ত তিন প্রকার কলম প্রস্তুত প্রণালীই পর পর লেখা যাইতেছে।

খোঁচা কলম

গোলাপের খোঁচা কলমের গাছই শীঘ্র বাড়িয়া ওঠে ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কিন্তু সেরূপ চারা করা অতিশয় যত্নসাপেক্ষ ও যত্নের সহিত করিতে গেলেও সকলটাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। বিশেষ উচ্চ শ্রেণীর সুখী গোলাপ সম্পর্কে এ কথা অধিক প্রযোজ্য। এই হেতু জোর কলমের চারাই সাধারণতঃ রোপণ করিতে দেখা যায়। চারা-বিক্রেতা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে যে সকল চারা ক্রয় করিয়া আনা হয় তাহা সমুদয়ই জোর কলমের চারা। যাহা হউক, খোঁচা কলমের চারার ভবিষ্যৎ ভাল হয় বলিয়া, যাঁহারা গোলাপ ফুলের বাগান করিবেন তাঁহাদের পক্ষে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা অত্যাবশ্যক।

গোলাপের খোঁচা কলম করিয়া কৃতকার্য্য হইতে হইলে তাহা আশ্বিনের প্রথম ভাগেই করিতে হইবে। বৃষ্টি-বাদলা কম হইলে ভাদ্র মাসে এই কলম করিতে পারা আরও ভাল। ইহার আগে করিতে গেলে এক দিকে মাটি সর্ব্বদা অত্যন্ত ভিজা থাকে ও অন্য দিকে রৌদ্রের তাপ বেশী থাকে বলিয়া চারার গোড়া সহজেই পচিয়া গিয়া অকৃতকার্য্য হইবার কারণ হয়। আবার কথিত সময়ের পরে হইলেও শীতের দরুণ খোঁচা কলমে শিকড়ের উদ্গম হইতে বাধা জন্মাইয়া নিরাশার কারণ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং সময় ঠিক রাখিয়া কাজ করা কৃতকার্য্য হইবার প্রথম উপায় বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

খোঁচা কলমের হাপোর ঃ—খোঁচা কলম করিতে হইলে ইহার জন্য একটা হাপোর প্রস্তুত করা দরকার এবং যে স্থানে সর্ব্বদা রোদ বাতাস পুরামাত্রায় লাগিতে পারে তেমন স্থানেই তাহা করা উচিত। শ্রাবণের প্রথমেই ঐ স্থানে গভীর কোদালি করিয়া বড় বড় চাকা উঠাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার দশ-বার দিন পর মাটির যো বুঝিয়া ক্রমাগত কয় দিন ঘন ভাবে কোদালি

করিয়া মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ করতঃ ঘাসের মুথা ও খোলাম-কুচি বাছিয়া সমান করিয়া লইতে হইবে। প্রথম কোদালি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য স্থান হইতে অধিক বালির ভাগযুক্ত দোআঁশ অথচ খুব উর্ব্বর মাটি কাটিয়া আনিয়া পৃথক্ কোন খোলা জায়গায় রাখিয়া ও ইহার সহিত মাটির এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ যত্নে রক্ষিত অর্দ্ধ-পচা গো-ময় মিশাইয়া লইয়া ছড়াইয়া রাখিয়া ও দুই-তিন দিন পর তাহা ওলট করিতে থাকিয়া রোদ বাতাস কুয়াশা লাগাইতে হইবে। এই ভাবে মাসাধিক কাল গত হইলে যখন দেখা যাইবে যে, মাটি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ও ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তখন তাহা ভালরূপ হাতে রগড়াইয়া এক পোয়া ইঞ্চি ছিদ্র চালনি দ্বারা চালনি করিয়া হাপোরের স্থানে লইয়া গিয়া ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া কিনারাগুলি কিছু অধিক এঁটেলের ভাগযুক্ত মাটি দ্বারা ছোট আইলের মত বাঁধিয়া পিটিয়া শক্ত করিয়া লওয়া দরকার,—যেন জল দিলে তাহা গড়াইয়া বাহির হইতে না পারে। প্রখর রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় ঐ স্থান আবশ্যকমত আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য ঐ স্থানের দুই ধারে দুই সারি কাঁচা বাঁশের খুঁটি বসাইয়া ইহার উপর দুইটি বাঁশ মারুলের মত আটকাইয়া লইয়াই কলম শাখা পুঁতিবার কাজে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। শুক্না বাঁশের খুঁটি বসাইলে, তাহাতে উইয়ের আবির্ভাব হইয়া কলম শাখার মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়াই কাঁচা বাঁশের খুঁটি ব্যবহার করা প্রয়োজন।

গোলাপের মধ্য-বয়সের নীরোগ ও সতেজ এবং বেশী মোটা নয়, অধিক মিহিও নয়, এরূপ শাখাই খোঁচা কলমের পক্ষে ভাল। তাহা খুব তীক্ষ্ণধার দায়ের দ্বারা কতক টেরা ভাবে (কলমের মত) কাটিয়া দশ-বার ইঞ্চি লম্বা টুক্‌রা করিতে হইবে। প্রত্যেক টুক্‌রার নিম্ন দিকের পত্রগ্রন্থির নীচে আধপোয়া ইঞ্চির বেশী না থাকে ও টুক্‌রার উভয় মাথা কাটিয়া বা ছেঁচিয়া না যায়

তদ্বিষয়ে খুব সাবধান হইতে হইবে। তাহা করিবার অগ্রেই একটা পাত্রে কতক কাঁচা গোময় জলে গুলিয়া অনতিতরল কাদার মত করতঃ নিকটে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক টুক্‌রা কাটা হওয়া মাত্র উহার উভয় মাথা গোময়ের কাদায় চুবাইয়া লইতে হইবে। কর্ত্তিত স্থানে গোময়ের প্রলেপ দিলে কলম শাখার ভিতরের রস দ্রুত বাহির হইতে পারে না বলিয়া তাহা করা প্রয়োজন।

এই ভাবে আবশ্যক সংখ্যক কলম কাটা শেষ হইলে তাহা হাপোরের স্থানে লইয়া গিয়া ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে তিন ইঞ্চি দাবাইয়া পূর্ব্ব দিকে ঈষৎ কাত করিয়া বসাইয়া হাতে মাটি চাপিয়া সমান করিয়া দিতে হইবে। কলম শাখা হেলাইয়া রোপণ করিলে ইহার উপর পৃষ্ঠের চোখ (পত্রগ্রন্থি) হইতে সহজে নূতন শাখার হইতে পারে বলিয়া শীঘ্র শিকড়ের উদ্গম হইয়া থাকে। কলম শাখা পূর্ব্ব দিক ভিন্ন অন্য দিকে হেলাইয়া রোপণ করিলে কলম গাত্রের অধিক স্থান ব্যাপিয়া সূর্য্যোত্তাপ লাগে ও তাহাতে কলমের রস অধিক পরিমাণে শুকাইয়া যায় বলিয়া ইহাই কোন কোন কলমের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। এই ভাবে কলম বসানোর কাজ শেষ করিয়াই হাপোরের স্থানে ঝাঁজরি দ্বারা প্রচুর জল দিয়া সেদিনকার মত কাজ বন্ধ করিতে হইবে।

পর দিন প্রাতে পুনরায় প্রচুর জল দিয়া সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক কলমের মাথায় আস্তে আস্তে ও সাবধানতার সহিত কাঁচা গোময়ের গাঢ় প্রলেপ দিতে হইবে। ইহাতে অবহেলা করিলে কলমের মাথা দ্রুত শুকাইয়া ক্রমে নীচে নামিতে থাকায় ইহার মৃত্যু আশঙ্কা অধিক বাড়িয়া থাকে। কেহ কেহ গোময়ের স্থলে মোমের প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার পর হইতে প্রখর রৌদ্র ও অত্যন্ত বৃষ্টির সময় আচ্ছাদিত রাখিয়া সকাল সন্ধ্যা দুই বেলা আন্দাজ মত জল দিতে থাকিলে দশ-বার দিনের মধ্যেই তাহাতে নূতন শাখার উদ্গম হইতে আরম্ভ হয়। সেরূপ দেখা গেলে এক

দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখিয়া ইহার পর দিন খুব সরু মুখবিশিষ্ট নিড়ানি-যন্ত্র দ্বারা আস্তে আস্তে নিড়ানি দিয়া মাটির চাপ অনতি-গভীর ভাবে ভাঙ্গিয়া ঘাস ইত্যাদি যাহা অঙ্কুরিত হয়, তাহা দূর করা ও ইহার পর দিন হইতে ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন এক বেলা জল দিয়া পুনরায় উল্লিখিত প্রণালীতে জল দেওয়া বন্ধ রাখিয়া আস্তে আস্তে নিড়ানি দিতে হইবে। এই ভাবে হাপোরের স্থানের অবস্থা বুঝিয়া পর্য্যায়ক্রমে জলসেচন ও নিড়ানি দিতে থাকিলে চার-পাঁচ সপ্তাহ মধ্যেই নূতন শাখাসকল বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যায়। তাহা হইলে কলমের শিকড় হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন ইহার সম্বন্ধে আর কোন চিন্তার কারণ থাকে না। সেই সময় হইতে ক্রমে সূর্য্যের তাপ পাইতে অভ্যাস করাইলে দুই মাসের মধ্যেই অধিকাংশ চারা বাগানের যথাস্থানে বসাইবার উপযোগী হইয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে, যে-সব কলমে নিশ্চিত মৃত্যু-লক্ষণ দেখা যাইবে, তাহা প্রত্যেক বারের নিড়ানি দিবার সময় তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। কারণ মৃত ও শুষ্ক শাখা থাকিতে দিলে উইয়ের আবির্ভাবের কারণ জন্মাইয়া থাকে, যাহা অন্য ভাল কলমেরও বিনাশের কারণ হয়। কলমে শিকড় না হওয়া পর্য্যন্ত সামান্য আঘাত লাগিলে তাহা নড়িয়া যায় ও সেরূপ হইলে তাহাতে শিকড় হইতে পারে না এবং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। সেই জন্য ঐ বিষয়ে সর্ব্বদা খুব সাবধান থাকা এবং প্রত্যেক বারের নিড়ানি দেওয়ার কালে একথা স্মরণ রাখা খুব দরকার।

খোঁচা কলম করিবার অন্য সহজতর উপায়ঃ— চৈত্র বৈশাখ মাসে পুষ্করিণীর জল যখন খুব নীচে নামিয়া যায়, তখন জলের অনতিদূরে একটা সমান জায়গা, যে স্থান বর্ষার জলবৃদ্ধির সময়ে জলমগ্ন হইলেও আশ্বিনের প্রথমেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিবার কথা, তথায় যার যার প্রয়োজনমত তিন ফুট পরিসর কতকটা স্থান

ঘন ঘন গভীর কোদালি করিয়া ঘাস মুথা ইত্যাদি বাছিয়া দূর করতঃ মাটি নির্ম্মল করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। কোদালি করিবার সময় আবশ্যক মনে হইলে ঐ স্থানে কতক অর্দ্ধ-পচা গোময় মিলাইয়া লওয়া দরকার। তারপর ঐ স্থান বর্ষার জল-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জলে ডুবিয়া পুনরায় আশ্বিনে ভাসমান না হওয়া পর্য্যন্ত আর কিছুই করিতে হইবে না। জল কমিতে আরম্ভ হইলে যখন ইহার উপরের ধারের এক ফুট আন্দাজ স্থান ভাসিয়া পড়িবে, তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে গোলাপ শাখা কাটিয়া টুক্‌রা করতঃ পূর্ব্ব দিকে ঈষৎ হেলাইয়া তিন ইঞ্চি দাবাইয়া সেই ভিজা মাটির উপরই সারিবন্দী করিয়া বসাইয়া কলমের মাথায় কাঁচা গোময়ের প্রলেপ দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে এবং জল কমিবার সঙ্গে সঙ্গে দু-চার দিন পর পর এক এক সারি করিয়া বসাইয়া কলমের সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে হইবে। কলম বসাইবার সময় ঐ স্থানে পায়ের চাপ না পড়ে এবং ইহার পরেও কোন জীবজন্তুর অত্যাচার না ঘটিতে পারে, ইহার বিহিত উপায় করাই প্রধান কাজ। সে-সব কলমে প্রতিদিন জল দিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। দুই চারি দিন পর পর হাতে কতক জল ছিটাইয়া দিয়া জায়গার সরসতা রাখিতে পারিলে দুই মাসের মধ্যেই কলম বাগানে রোপণের উপযোগী হয়।

আমরা উল্লিখিত উপায়ে স্থলপদ্ম, সর্ব্বপ্রকার জবা, গন্ধরাজ ইত্যাদির চারা করিয়া সর্ব্বদাই আশানুরূপ ফল পাইয়া থাকি এবং অতি উচ্চ শ্রেণীর গোলাপের কলম করিয়াও কৃতকার্য্য হইতেছি। গন্ধরাজ ও স্থলপদ্মের কলমের শাখাগুলি বার-তের ইঞ্চি লম্বা করিয়া গোলাপের শাখার নিয়মেই কাটিতে হয়। কিন্তু জবার কলম কাটার নিয়ম কতকটা স্বতন্ত্র। জবার কলম করিতে হইলে ইহার ছোট আকারের শক্ত চাবুকের ন্যায় শাখা নির্ব্বাচন করিয়া কলম বসাইবার দুই মাস পূর্ব্বেই ইহার গোড়ার জোড়-স্থান হাতে কতক পৃথক্

করিয়া গাছেই ঝুলাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তাহা করিলে জোড়-স্থানের ছাল ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভাঙ্গন-জনিত কষ্ট সহিয়া ঠিক হইয়া যায়; যার দরুন তাহা গাছ হইতে পৃথক্ করিয়া মাটিতে রোপণ করিলে ঐ স্থান হইতে খুব শীঘ্র শিকড়ের উদ্গম হইতে পারে।

জোড় কলম

ইহা বৎসরের সকল সময়েই করিতে পারা যায় এবং আবশ্যক তদ্বিরের অভাব না হইলে প্রায়ই মরে না। এ কারণে গোলাপের কলম সম্বন্ধে এই প্রণালী খুব প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। চারা বিক্রেতারা যত গোলাপের কলম বিক্রয় করে, ইহার প্রায় সবই জোড় কলমের চারা।

জোড় কলম করিতে হইলে 'রোসা জায়গেন্টিয়া' (Rosa Gigantia) নামক গোলাপের একটা গাছ বাগান মধ্যে যত্নপূর্ব্বক রাখা দরকার। ইহা একপ্রকার অমর জাতীয় জঙ্গলী গোলাপ বিশেষ। ইহার জায়গেন্টিয়া নামটা বোধ হয় উদ্যান-তত্ত্ববিদ্গণেরই প্রদত্ত। ইহাতে কদাচিৎ নগণ্য আকারের দুই চারিটা ফুল হয়।

জায়গেন্টিয়া অমর জাতীয় গাছ একথা এইমাত্র বলিলাম। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ইহার খোঁচা কলম করিলে প্রায় মরে না। এ ধরণের কলমের সহিতই ভাল গোলাপের জোর বাঁধিতে হয়। জোড় কলমের জন্য জায়গেন্টিয়ার যে-সব শাখা দ্বারা খোঁচা কলম করিতে হইবে তাহা অধিক বয়সের ও মোটা না হওয়াই ভাল এবং কলম-গুলি তের-চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা হওয়া দরকার। লম্বা কম হইলে জোড় বাঁধিবার সময় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। হাপোরে জায়গেন্টিয়ার চারা করিয়া কতক মজুত থাকিলে সব সময়েই জোড় কলমের চারা প্রস্তুত করা যায়।

ভাল গোময় সারযুক্ত মাটি দ্বারা টব পূর্ণ করতঃ তাহাতে জায়-গেন্টিয়ার চারা বসাইয়া ক্রমাগত কয় দিন নিয়ম মত জল দেওয়া

ও অন্যান্য আবশ্যক তদ্বির করিতে থাকিলে, যখন দেখা যাইবে যে চারার টবে উত্তোলনজনিত কষ্ট সহিয়া গিয়া নূতন পত্রাঙ্কুর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন তাহা যে-গাছের কলম লইতে হইবে, তথায় টবসহ লইয়া গিয়া যে শাখার সহিত জোড় বাঁধা যাইতে পারে তাহা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কলমের শাখা ও চারা সমান মোটা ও প্রায় সমবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। কলমের জন্য নির্ব্বাচিত শাখা হাতে টানিয়া ও আস্তে আস্তে বাঁকাইয়া চারা ও ডালের দুইটি পত্র-গ্রন্থির মধ্য-স্থানের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে। ইহাতে উভয়েরই জোড়-মিলনের সুবিধার জন্য টব একাধিক বার স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বসাইবার দরকার হয়। জায়গেন্টিয়ার চারা যতই লম্বা হউক না, নির্দ্দিষ্ট টবের মাটির উপরের প্রথম ও দ্বিতীয় চোকের মধ্যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়; কার্য্যানুরোধে দ্বিতীয় বা তৃতীয় চোকের মধ্যেও হইতে পারে। জায়গেন্টিয়ার চারার যে দুইটি চোকের মধ্যে জোড় বাঁধা হইবে তাহা লম্বা ভাবে অর্দ্ধেকের কিছু কম ($\frac{7}{16}$ ভাগ) তীক্ষ্ণধার ছুরি দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে হইবে। আর কলম শাখারও জোড়ার স্থান ঠিক তদনুরূপ করিয়া কাটিয়া উভয় একত্র মিলাইয়া শক্ত ঘন সূতার দ্বারা খুব দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে। বাঁধনের প্রত্যেক পেঁচের মধ্যে এক এক সূতা পরিমাণে ফাঁক থাকা দরকার। কলম কাটার দোষে বা বাঁধন ঢিলা থাকিলে জোড়-স্থানের মধ্যে বায়ু ও গরম উত্তাপ ঢুকিয়া জোড় লাগার ব্যাঘাত ঘটায়, এমন কি মরিয়াও যায়। সুতরাং ঐ বিষয়ে সাবধান হইয়াই কাজ করা উচিত। ইহাতে নিঃসংশয় হইবার জন্য কেহ কেহ বাঁধনের উপর মোমের অথবা কাঁচা গোময়ের প্রলেপ দিয়া থাকেন। কলম কাটা ও বাঁধন ঠিক হইলে এসব কিছুরই দরকার হয় না।

জায়গেন্টিয়ার চারা সর্ব্বদাই টবে বসাইয়া ও একই ভাবে স্থাপন করিয়া জোড় বাঁধিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কলম শাখার উচ্চতা অনুসারে ইহার কোনটার টব মাটিতে বসাইয়া ও কোনটা মাচায় কিম্বা ইষ্টক-স্তূপের উপর বসাইয়া কাজ করিতে হয়। অবস্থা বিশেষে জায়গেন্টিয়ার চারা মাটিতে পুঁতিয়াও অনেক চারা হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

কলম কাটার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে জোড় লাগা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত চারা ও মূল গাছের গোড়ার তদ্বির মনোযোগের সহিত করিতে হইবে। উভয় গাছ ও চারার সতেজতার অনুপাতে জোড় বাঁধায় সময় লাগিয়া থাকে। বলবান ব্যক্তির শরীর অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইলে ক্ষত স্থান যত শীঘ্র জোড়া লাগিয়া যায়, দুর্ব্বল বা রুগ্ন শরীরে তত শীঘ্র হইতে পারে না। পরন্তু কোন ব্যক্তির শরীরে অস্ত্রোপচার করিলে ব্যক্তি ও তাহার ক্ষতের যথারীতি যত্ন ও পরি-চর্য্যা করা প্রয়োজন হয়। সেইরূপ কলমের গাছ ও চারা রীতিমত যত্ন পাইলে রস ও শক্তি সবেগে জোড়-স্থানের দিকে সঞ্চালিত হইয়া শীঘ্র জোড় বাঁধিবার কার্য্যে সহায়তা করে। জোড় বাঁধার পর জায়গেন্টিয়ার চারা হইতে নূতন শাখা দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। তাহা দেখিলেই ছুরির বাঁটের দ্বারা ঘষিয়া সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না করিলে নূতন ডালের দিকে শক্তি-প্রবাহ ধাবিত হওয়ায় জোড় বাঁধার বিঘ্ন জন্মায়। জায়গেন্টিয়া অত্যন্ত বৃদ্ধিশীল বলিয়া চারা জমিতে বসাইবার পরও জোড়-স্থানের নীচের চোক হইতে সতেজ শাখা উদ্গত হইয়া থাকে। তাহা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া না ফেলিলে মূল চারাকে অত্যন্ত নিস্তেজ করিয়া ক্রমে মৃত্যুর কারণ হয়। বাগানে জোড় কলমের চারা রোপণ করিবার ইহাই প্রধান অসুবিধা। সেই জন্যই জোড় বাঁধিবার সময় জায়গেন্টিয়ার চারার জোড়ার নীচে যত কমসংখ্যক চোক রাখিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।
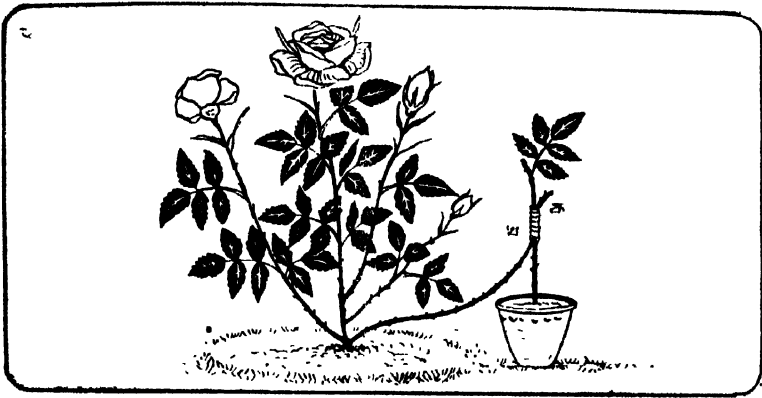
গোলাপের জোড়-কলম

জোড় বাঁধার পর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে জোড়-স্থানের বাঁধনের প্রত্যেক ফাঁকের মধ্য দিয়া উভয়েরই ছাল কতক স্ফীত হইয়া উঠে। সেরূপ দেখা গেলেই জায়গেণ্টিয়ার চারার জোড়ার উপর আধ ইঞ্চি রাখিয়া 'ক' চিহ্নিত স্থানে কতক টেরা ভাবে কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তাহা হইলে চারার সমস্ত শক্তি ও রস কলম শাখার দিকে প্রবাহিত হইয়া শীঘ্র জোড় লাগিয়া যাইবে। ইহার কয়েক দিন পর যখন দেখা যাইবে যে, বাঁধন স্থানের ছাল বাড়িয়া অধিকতর স্ফীত হওয়ায় বাঁধন সূতার কিয়দংশ দাবিয়া গিয়াছে, তখন কলম শাখার বাঁধনের নীচের চোকের দুই সূতা নীচে 'খ' চিহ্নিত স্থানের কিয়দংশ V আকারে কাটিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। ইহাতে কলম শাখা কোন প্রকার নিস্তেজ দেখা না গেলে এক সপ্তাহ পর আস্তে আস্তে কাটিয়া পৃথক করিলেই কলম প্রস্তুত হইল। ইহার পর তদবস্থায় দুই তিন দিন যত্নের সহিত রাখিয়া বাগানে অথবা হাপোরে বসাইয়া দেওয়া উচিত।

গুটি কলম

জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত গুটি কলম হইয়া থাকে। গোলাপ, জবা, স্থলপদ্ম, লিচু, নেবু, দাড়িম্ব, পেয়ারা, কামরাঙ্গা

ও অন্যান্য অনেক জাতীয় ফলফুলের গাছ গুটি কলমে হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় গাছের ডাল মাটিতে লাগিলে সেই মাটি-সংলগ্ন স্থানে আপনা হইতেই শিকড় জন্মে, এবং তাহা কাটিয়া পৃথক করিয়া রোপণ করিলেও গাছ হয়, ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, এই সূত্র অবলম্বন করিয়াই গুটি কলমের প্রণালীর উৎকর্ষ সাধিত হইয়া ক্রমে নানা জাতীয় উচ্চশাখা বৃক্ষাদিতেও কলম করার পন্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। গোলাপ ইত্যাদি খর্ব্বায়তন গাছের গুটি কলম করা আবশ্যক হইলে গাছের শাখা মাটিতেই শোয়াইয়া কলম করা উচিত। সেরূপ করিতে হইলে কলমের শাখা নির্ব্বাচন করিয়া ক্রমে তাহা আস্তে আস্তে হাতে টানিয়া মাটিতে শোয়াইয়া যে স্থানে কলম করা যাইবে, তথায় ইট পাথর ইত্যাদি কোন ভারী বস্তু দ্বারা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে। ইহার পর শাখার অগ্রভাগ ধীর গতিতে যথাসম্ভব ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া ইহার সংলগ্ন একটি বাঁশের ছোট খুঁটি পুঁতিয়া এমন ভাবে বাঁধিয়া লইতে হইবে, যাহাতে চাপটা সরাইয়া লইলেও শাখাটা পূর্ব্ববৎ থাকিয়া যায়। ইহার জন্য আবশ্যক বোধ হইলে চাপের বিপরীত দিকেও একটি খুঁটি পুঁতিয়া ডালের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর চাপ সরাইয়া শাখার মৃত্তিকা-সংলগ্ন স্থানের দুইটি চোকের মধ্যাংশ ছুরি দ্বারা চিরিয়া লইয়া ইহার ভিতর এক সূতা পুরু একখানা কাঁচা বাঁশের টুকরা ঢুকাইয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার পর ইহার নীচেকার জমি এক ফুট আন্দাজ খুরপি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক মাটি সরাইয়া লইয়া পৃথক্ স্থানে প্রস্তুত বিশুদ্ধ গোময় সার-যুক্ত মাটি দ্বারা তাহা পূর্ণ করতঃ ডালের উপর পাঁচ-ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া বেদীর ন্যায় বাঁধিয়া হাতে চাপিয়া শক্ত করিতে হইবে। ইহার পর নিয়মমত জল দিলেই পাঁচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে শিকড় হইয়া থাকে। শাখার উপরের মাটি জলসেচনের বেগে সরিয়া না

যায়, সেজন্য কতক খড় ইত্যাদি দ্বারা ঐ স্থান সর্ব্বদা আবৃত রাখা উচিত। ইহাতে রৌদ্রতেজ কতক নিবারিত হওয়ায় জলসেচনের প্রয়োজনও কমিয়া যায়। কলমে শিকড় হইলে তাহা হইতে নূতন পাতা হইয়া শ্রীসম্পন্ন হয়। সেরূপ বুঝিয়াই কলম শাখার নীচের দিকে বেদী-সংলগ্ন স্থান খুব অল্প পরিমাণ V আকারে কাটিয়া রাখিতে হইবে। এই ভাবে পাঁচ সাত দিন পর পর দুই তিন দফায় কাটিয়া পৃথক্ করিলেই কলম হইল। ইহার পাঁচ-ছয় দিন পর কলম-পোঁতা স্থানের মাটির চাকাসহ সাবধানে স্থানান্তরিত করা উচিত। আবশ্যক হইলে ঐরূপ কলম জমির পরিবর্ত্তে টবের মধ্যে ডাল শোয়াইয়াও করা যায় এবং এ ভাবে কলম করা হইয়াও থাকে।

উচ্চ শাখায় কলম করিতে হইলে এঁটেল মাটি দশ আনা, অর্দ্ধ-পচা গোময় চারি আনা ও সরিষার খৈল-চূর্ণ দুই আনা একত্রে জলে গুলিয়া শক্ত কাদা করিয়া ছায়াযুক্ত স্থানে এক সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হইবে। ইহার পর কলম শাখার দুইটি চোকের মধ্য-স্থান পূর্ব্ববৎ চিরিয়া ও বাঁশের টুকরা ঢুকাইয়া ঐ কাদা মাটি দেড় পোয়া আন্দাজ লইয়া ঐ স্থানে ডিম্বাকারে ধরাইয়া দিতে হইবে; পরে তদুপরি ছেঁড়া চট অথবা ইহার অনুরূপ কোন বস্ত্র দ্বারা আবরণ দিয়া ভালরূপ বাঁধিয়া প্রতিদিন নিয়মিত জল দিতে থাকিলেই তাহাতে যথাসময়ে অসংখ্য শিকড় ফুটিয়া বাহির হয়। ইহার পর পূর্ব্ব পদ্ধতি ক্রমে দুই তিন বারে কাটিয়া নামাইয়া লইয়া চটের আবরণ ফেলিয়া দিয়া জমিতে বসাইলেই গাছ হয়। গোলাপ ইত্যাদি ফুল গাছ ব্যতীত অন্যান্য ফলের গাছে কলম করিতে হইলে কলম-স্থান না চিরিয়া চোক দুইটির মধ্যের সমস্ত ছাল কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া উক্ত কাদা মাটি লাগাইয়া আবরণ দিয়া বাঁধিতে হয়। ছাল তুলিবার সময় ইহার কাঠে ছুরিকা বিদ্ধ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ফল ফুল যাহাই হউক, যে শাখায় কলম করিতে হইবে তাহা খুব অধিক বয়সের না হয়, এবং

যে শাখায় একবার ফল ফুল হইয়াছে সেইরূপ সতেজ শাখা নির্ব্বাচন করা দরকার। বৃক্ষাদির শাখার মধ্যেও কোন কোনটা বন্ধ্যা থাকে। বন্ধ্যা শাখার কলমের গাছও বন্ধ্যা হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। সেজন্য বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া কলমের শাখা নির্ব্বাচন করিতে হয়। মাটি-সংলগ্ন ভিন্ন যেসব গুটী কলম করা হয় তাহাতে সর্ব্বদা জল না দিলে শ্রম বৃথা হইয়া থাকে। কোন মৃৎভাণ্ডে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া কলমের উপর ঝুলাইয়া একবার করিয়া জল দিলে তাহা হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে। তাহা করিলে শীঘ্র আশানুরূপ কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

বাগানে গোলাপের চারা রোপণ ও তদ্বিরঃ—ফুলবাগানের জমি প্রস্তুত সম্বন্ধে অধ্যায়ারম্ভে যাহা লিখিত হইয়াছে, গোলাপ বাগানের জমিতে ঐ নিয়ম অধিকতর মনোযোগের সহিত পালন করা ও অত্যধিক পরিমাণ বিশুদ্ধ গোময় সার দিয়া দীর্ঘ সময় হাতে রাখিয়া উহা প্রস্তুত করা উচিত। গোলাপের চাবা কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস মধ্যে যে-কোন সময়ে রোপণ করা যায়, কিন্তু বর্ষাকালের রোপিত চারায় ঘন ঘন বৃষ্টিপাতের দরুন উপযুক্ত তদ্বির করা সম্ভব হয় না এবং ঐ সময়ের আবহাওয়া গোলাপ গাছের পক্ষে প্রতিকূল থাকায় গাছের উন্নতি হইতে অনেক দেরী হয়, কাজেই ফুলও দেরীতে হইয়া থাকে।

গোলাপের জাতি অনুসারে গাছের আকার ছোট বড় হইয়া থাকে। তদনুসারে চার হইতে ছয় ফুট ব্যবধানে চারার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে বাঁশের কাটি পুঁতিয়া লইতে হইবে। ঐ সময়ে চারা হাপোর হইতে গোড়ার মাটির চাকা সহ উঠাইয়া গৃহাদির বাহিরে কোন ছায়াযুক্ত ও নিরুদ্বেগ স্থানে তিন-চার দিন রাখিয়া প্রতিদিন ইহার পাতাগুলি একবার জলে ভিজাইয়া দিতে হইবে। গোড়ার চাকা-মাটিতে জল লাগিতে না দেওয়াই উচিত। ইহার পর প্রাতে রোপণের স্থানে এক ফুট আন্দাজ গভীর ও ব্যাস

পরিমিত গর্ত্ত করিয়া অপরাহ্লে চারা রোপণ করিয়া গোড়ার মাটি হাতে খুব চাপিয়া দিয়া কতক জল দেওয়া উচিত। ইহার পর ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন এক বেলা জল দিতে হইবে। চারা হাপোর হইতে তুলিয়া কয়েক দিন রাখিয়া রোপণ করার উপকারিতা এই যে, চারা তুলিয়াই রোপণ করিলে প্রখর রৌদ্রের তেজ সহিতে না পারিয়া তাহা সহজে নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কোন কোনটি মরিয়াও যায়। কিন্তু উল্লিখিত ভাবে কষ্ট সহ্য করাইয়া লইলে সে আশঙ্কা কমিয়া যায়। অধিকন্তু চারার গোড়ার চাকা-মাটি কতক শুষ্ক হওয়ায় রোপণের পর জল পাইলে তাহা ঐ চাকাতে দ্রুত শোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জমির সার পদার্থসকলও তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতে চারাসকল শীঘ্র সবেগে বর্দ্ধিত হইতে পারে। জোড় কলমের চারা হইলে জোড়ার উপরি-ভাগ জমির সংলগ্ন ও সমান করিয়া বসাইতে হইবে। কিন্তু জোড়-স্থান প্রথমেই মাটি ঢাকা না দিয়া কতক গর্ত্তের আকারে রাখিয়া দেওয়া উচিত। তাহা নিড়ানি দেওয়ার সময়ে ক্রমে ক্রমে ভরিয়া দিতে হইবে। চারা রোপণের সাত আট দিন পর একবার গোড়ার মাটির যতদূর পর্য্যন্ত জলে ভিজিয়া চাপ বাঁধিয়া গিয়াছিল, তাহা খুরপি দ্বারা ঈষৎ গভীর ভাবে খুঁড়িয়া মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দিয়া পর দিন হইতে ক্রমাগত চার পাঁচ দিন অপরাহ্লে জল দেওয়া উচিত। ইহার পর যো হইলেই পুনরায় অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তৃত ভাবে খুঁড়িয়া গর্ত্ত কতকটা ভরিয়া দিতে হইবে। এই ভাবে কয়েক বার পর্য্যায়ক্রমে জল সেচন করিয়া নিড়ানি দিলে চারাসমূহে নূতন শাখা সবেগে বাহির হইতে থাকে। এই সময়ে পরিচর্য্যার গুণে জোড় কলমের নীচের জায়গেন্টিয়া হইতে খুব দ্রুত সতেজ শাখাসকল বাহির হইয়া থাকে। তাহাতে অনবরত দৃষ্টি রাখিয়া চোখে পড়া মাত্র ধারাল ছুরি মাটির ভিতর ঢুকাইয়া গোড়া ঘেষিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। তাহা না করিলে

যে-যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে একস্থানে বলা হইয়াছে। মূল গাছ হইতে নূতন নূতন ডগা বাহির হইতে থাকিলে, চারা ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই সব ডগা তখন ক্রমে গোড়া ঘেষিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাতে অন্যথা করিলে নবোদ্গত ডগাগুলি চারা উপযুক্তরূপে বর্দ্ধিত হইতে বিশেষ বাধা জন্মায়।

গোলাপের মধ্যে কতকগুলি দীর্ঘ শাখা বিশিষ্ট। ইহাদের গোড়া হইতে ছড়ির ন্যায় শাখাপ্রশাখা-বিহীন এক একটা ডগা সোজা ভাবে উঠিয়া শিরোদেশে কয়েকটি ফুল হইয়া থাকে। উদ্যান-বিশারদগণ ঐ শ্রেণীর গোলাপকে হাইব্রিড্ পারপিচুয়্যাল (Hybrid perpetual) নাম দিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণী—যাহাকে টি সেণ্টেড (Tea scented) বলা হইয়া থাকে, তাহাদের ফুলে চায়ের গন্ধের কিছু আভাস আছে। গাছের আকৃতি-প্রকৃতিও চা গাছেরই মত ঘন ও ছোট ছোট এবং ইহা অনেক শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট। উক্ত উভয় শ্রেণীর গোলাপের মধ্যে লাল, সাদা, গোলাপী, হলুদে ইত্যাদি নানা বর্ণ ও আকৃতির ফুল আছে। এসব কথা আগেই এক বার বলা হইয়াছে। ইহাদের উভয়েরই প্রকৃতির অনেক প্রভেদ থাকায় ডাল ছাঁটিবার নিয়ম স্বতন্ত্র। হাইব্রিড গোলাপের চারা রোপণের পর প্রথম উদ্গত ডগাসমূহ কতক লতানে ধরণের হয়। ইহাতে ফুল হইতে না হইতে ইহার গোড়া হইতে অপেক্ষাকৃত মোটা ও সতেজ ডগাসকল নির্গত হইয়া খাড়াভাবে উঠিতে থাকে। ইহাতেও ফুল হইতে না হইতে প্রথমোদ্গত ডগাসকলে কয়েকটি ফুল হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে। এই ভাবে একটির পর আর একটি নূতন ডগা অপেক্ষাকৃত মোটা ও মজবুত আকারে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ডগাসকলে ফুল হইয়া একে একে চতুর্দ্দিকে হেলিয়া পড়ে। ঐ সকল ডগায় ফুল

ফুটিয়া গেলে অত্যধিক হেলান শাখাসমূহ তখন দুই-চারিটি মাত্র চোক রাখিয়া উপরের অংশ ছাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে ফুল হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের অনতিনিম্ন হইতে ছোট ছোট কয়েকটি ডগা বাহির হয় ও পরে তাহাতে নগণ্য কয়েকটি ফুল হয়। ইহাতে গাছের সমস্ত শক্তি উপরের ঐ সকল উপশাখার পুষ্টির জন্য নিয়োজিত হইয়া পড়ায়, নিম্ন দিক্ হইতে আর সবল ডগা বাহির হইতে পারে না। শাখার বলের অনুপাতে ফুলের আয়তন ও গঠনসৌষ্ঠব নির্দ্ধারিত হয়। প্রকৃতির এই ব্যবস্থা হাইব্রিড গোলাপ গাছেও বর্ত্তমান। ইহার যে শাখা যত নিম্ন দেশ হইতে বাহির হয় তাহাই তত সবল হয়। সেই জন্য যে শাখায় যখন ফুল হয়, ইহার নীচের যে স্থান হইতে গাছ ও ফুল উভয়ই সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া বাড়িতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া ইহার উপরে দুই-তিনটি মাত্র চোক রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটিয়া ফেলা উচিত। গাছকে নিজের মনোমত সুঠাম করিয়া লইবার জন্য নব-রোপিত চারায় সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টি-বাদলা বন্ধ হওয়ার পর গোলাপ বাগানের জমি একাধিক বার ভালরূপ কোদালি করিয়া ও গাছের গোড়ার মাটি কতক উঠাইয়া সার দেওয়া দরকার। হাইব্রিড জাতীয় সমস্ত গোলাপের গাছ এক বার ছাঁটিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু "টি" জাতীয় গোলাপের ছাঁটিবার নিয়ম ও কাল স্বতন্ত্র। ইহাদের এক একটি শাখা চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইয়াই ইহার মাথায় একটি ফুল ও ঠিক তদনুরূপ দুই-তিনটি শাখা এক সঙ্গে নির্গত হয়, এবং ঐ শাখাগুলি পাঁচ-ছয় ইঞ্চি লম্বা হইলে পূর্ব্ববৎ শাখা ও ফুল হইয়া থাকে। এই ভাবে প্রায় বার মাসই "টি" জাতীয় গোলাপের ফুল হওয়ায় বৃক্ষের সৌন্দর্য্যও প্রায় একই প্রকার থাকিয়া যায়। ইহাদের গাছটি প্রমাণমত রাখিবার জন্য

ফুল ধরার বিশ্রাম কালে চতুর্দ্দিকে বেষ্টিতাকারে আট হইতে দশ ইঞ্চি পরিমাণ ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তাহা গাছের অবস্থা বুঝিয়া বৎসরে একাধিক বার করা যাইতে পারে। হাইব্রিড গোলাপের গাছ ছাঁটাকাটার উপর ইহার শাখা-পল্লব নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ইহার উপর ফুলের আয়তন ও গঠনসৌষ্ঠব নির্ভর করে, তাহা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। ইহাদের ফুল শীতকালেই ভাল হয়। ইহাও পরিচর্য্যার অনুপাতেই ভাল মন্দ হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর গোলাপের মধ্যে অত্যন্ত সুগন্ধি ও উৎকৃষ্ট ধরণের অনেক ফুল হয় বলিয়াই ইহার জন্য ঐ সকল কষ্ট করা অকিঞ্চিৎকর মনে করা যাইতে পারে।

ফুল বাগান কোদালি হওয়ার পরই হাইব্রিড গোলাপের ডাল ছাঁটিয়া সঙ্গে সঙ্গে সার দেওয়ার জন্য গাছের গোড়ার মাটি তিন ফুট ব্যাস ও গভীরতায় আট-নয় ইঞ্চি পরিমাণে উঠাইয়া গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আট-দশ দিন ইহার মূলে রৌদ্র, বাতাস ও হিম লাগান দরকার। গাছের গোড়া খুঁড়িবার সময় মূল শিকড়গুলি কাটিয়া না যায় বা কোন প্রকার ক্ষতবিক্ষত না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া খুব উচিত। সূতার ন্যায় মিহি শিকড়-সকল কাটিয়া যাওয়াই ভাল। ইহাতে মূল উদ্দেশ্য অধিক পরিমাণে সফল হয়। গাছের বৃদ্ধিশীলতার জন্য মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ও শিকড়ের যে অঙ্গের যে ক্রিয়া থাকে, উল্লিখিত প্রকারে গাছের গোড়ার মাটি তুলিয়া লওয়া ও শাখা ছাঁটিয়া দেওয়ায় তখন ঐ সমস্ত ক্রিয়াই রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহাতে কতক দিন গাছের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল বিশ্রাম পায় বলিয়াই পুনরায় নূতন সার, মাটি ও জল পাইলে ঐ সকল ক্রিয়া দ্বিগুণ বেগে হইতে পারে, এবং তাহা হইতেই সতেজ শাখা পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া থাকে।

গাছের গোড়ার মাটি উঠাইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই কোন উর্ব্বর স্থানের মাটি ও পচা গোময় সমপরিমাণে মিশাইয়া

পৃথক্ স্থানে ছড়াইয়া রাখিয়া ও মধ্যে মধ্যে ওলটপালট করিয়া হিম বাতাস ও রোদ লাগান উচিত। তাহা খুব হাল্কা ও ঝুরা হইলে প্রতি ঘন ফুট মাটিতে দুই তোলা হিসাবে খুব পুরাতন ইমারতি চূণ (Slaked lime) ভালরূপ মিলাইয়া লইয়া ইহার দ্বারা গাছের গোড়ার গর্ত্তের বার আনা আন্দাজ ভরিয়া তদুপরি পার্শ্বের মাটি দিয়া সমান করতঃ চতুর্দ্দিকে ছোট আইল বাঁধিয়া গোড়ায় গর্ত্তের ব্যাস পরিমাণ থালার ন্যায় করিয়া লইতে হইবে। ইহার পর ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন এক বেলা প্রচুর জল দিয়া পুনরায় যো হইলে ঈষৎ গভীর ভাবে আইলের মধ্য-স্থানের মাটির চাঁপ ভাঙ্গিয়া রাখা দরকার। ইহার কয়েক দিন পর পুনরায় দুই-এক বার উল্লিখিত পর্য্যায়ে জল সেচন করিয়া নিড়ানি দিলেই শাখা-পল্লব অঙ্কুরিত হইতে থাকে। বাগানে অধিকসংখ্যক গাছ থাকিলে কিছু অগ্রপশ্চাৎ করিয়া ডাল ছাঁটা ও সার দেওয়ার কার্য্য করাই উচিত। নতুবা সকল গাছ এক সঙ্গে পুষ্পিত হইয়া একই সময়ে নিঃশেষিত হয়। “টি” জাতীয় গোলাপের ঐ সকল তদ্বির অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে করা উচিত। ইহারা বসন্ত কাল হইতে সারা বর্ষা কাল পর্য্যন্ত ফুল প্রদান করিয়া থাকে।

হাইব্রিড গোলাপের এক বৎসরের গাছের চতুষ্পার্শ্বের ডাল মাটির উপর তের-চৌদ্দ ইঞ্চি রাখিয়া ও মধ্যের শাখা ক্রমে উচ্চ করিয়া খুব ধারাল ছুরি (pruning knife) দ্বারা নিম্ন দিক হইতে উপরে টানিয়া ছাঁটা উচিত। উপর দিক হইতে কোপাইয়া কাটিলে কর্ত্তিত স্থান ফাটিয়া যাওয়ায় ইহার নীচের অনেক চোক নষ্ট হইয়া যায়, এবং গাছের সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত ঝাঁকি লাগায় নীচের চোক হইতেও শাখার উদ্গম হইতে দেরী হয়। গাছ ছাঁটিবার কালে যে-সকল শাখা হইতে আর নূতন শাখা বাহির হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এরূপ বৃদ্ধ কিম্বা জীর্ণ শাখা ও যে-সব শাখা হইতে নূতন শাখার উদ্গম হইলে গাছের শ্রী নষ্ট হইবে বুঝা যায়,

তাহা খুব পাতলা করাত দ্বারা গোড়া ঘেসিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।

দ্বিতীয় বৎসর হাইব্রিড গোলাপের ডাল ছাটার নিয়ম এই—প্রথম বারের ছঁাটার পর ইহার নিম্ন হইতে যে সকল বড় বড় শাখা বাহির হয়, ইহাদের উদ্গম স্থান হইতে তের-চৌদ্দ ইঞ্চি উপরে ছঁাটিতে হইবে। প্রধান প্রধান কয়টি শাখাকে ইহার ভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া লইয়া ছঁাটিবার স্থান নির্ণয় করা উচিত। ইহাতে সকল শাখার উচ্চতার মাপ কিছু কম বেশী হওয়া স্বাভাবিক। তৃতীয় বৎসরের ছাটার কার্য্য প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের ছাটার মধ্য স্থানে হওয়া উচিত।

হাইব্রিড গোলাপের গাছ নিয়ম বা স্বভাবাতিরিক্ত নীচে নামাইয়া ছাটিলে ইহাতে অল্পসংখ্যক চোক থাকে, কাজেই অধিক শাখা হইতে পারে না। ইহাতে গাছের সমস্ত শক্তি ঐ অল্পসংখ্যক শাখার প্রতিপালনে নিয়োজিত হওয়ায় তাহা অতিশয় উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহাতে পাতার শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় ফুল সংখ্যায় কম ও আকারে ছোট হয় ও কোন-কোনটায় ফুল হয়ই না। নিয়মাতিরিক্ত উপরে ছাটিলে অধিকসংখ্যক শাখা হওয়ায় নগণ্য ফুলেরই সংখ্যাধিক্য হয়।

উদ্ভিদ প্রতিপালন বিষয়টি সুকঠিন কাজ। উপযুক্ত পুস্তকাদি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছু দিন হাতে-কলমে কাজ করিলে নিজ হইতেই ইষ্টানিষ্ট বুঝিবার সুবিধা হয়।

বেলফুল

বেলফুল সুগন্ধের জন্য বিখ্যাত ও আদরণীয়। ইহা দ্বারা আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেজন্য কোন কোন স্থানে ইহার চাষ বিস্তৃত আকারে হইয়া থাকে।

ফুল বাগানের জমি প্রস্তুত সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইয়াছে,

বেলফুলের জমি ঐ প্রকার প্রস্তুত করিয়া সমচতুষ্কোণ চারি ফুট অন্তর সারি বাঁধিয়া চারা রোপণ করা উচিত। গোময় সারই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসেই ইহার চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। বেলফুলের শাখা জমিতে লতাইয়া যায় ও তাহা হইতে শিকড় বাহির হইয়া থাকে। শিকড় সহ ঐ ডাল কাটিয়া রোপণ করিলেই গাছ হয়। সুতরাং ইহার চারা করিবার জন্য কোন পৃথক্ আয়াস পাইতে হয় না। বেলফুলের বাগান প্রতি মাসে নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার রাখিয়া গোড়ার মাটি ধরাইয়া রাখিতে পারিলে এক একটি ফুলের ওজন আধ ভরি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার বাগানে ঘাস জন্মিতে দিলে ফুল আকারে ক্রমে ছোট হয়, সংখ্যায়ও কমিয়া যায়; উপরন্তু ফুলের বর্ণোজ্জ্বলতা ও গন্ধের মধুরতা কমিতে থাকে। যে শাখায় এক বার ফুল ধরে, তার সমস্ত ফুল ফোটা শেষ হইলে ঐ শাখা সর্ব্বদাই কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে কর্ত্তিত স্থান হইতে নূতন সতেজ শাখার উদ্গম হইয়া তাহাতে ভাল ফুল ফোটে। সেজন্য বেলফুলের ডাল প্রায় সমস্ত মরসুম ছাঁটিয়া রাখা দরকার হয়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহার বাগান ভালরূপ কোদালি করিয়া গাছের গোড়ায় সার প্রদান করা উচিত। গাছের গোড়ার দুই ফুট ব্যাস পরিমিত স্থানের মাটি ছয়-ইঞ্চি গভীর করিয়া উঠাইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া পাঁচ-সাত দিন রৌদ্র বাতাস ও হিম লাগান উচিত। ইতিপূর্ব্বে কতক বেলে ধরণের মাটি ও পচা গোময় সম-পরিমাণে কোন পৃথক্ স্থানে মিলাইয়া ছড়াইয়া রাখিয়া হাল্কা হইলে তাহা হাতে গুঁড়া করিয়া তাহা দ্বারা গাছের গোড়ার গর্ত্ত ভরিয়া হাতে চাপিয়া দেওয়া এবং পুরাতন ও জীর্ণ শাখা ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর তিন-চার দিন এক বেলা প্রচুর পরিমাণে জল দিয়া পরে যো হইলেই পুনরায় গোড়ার চাপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। ঐ সকল তদ্বির যে সময়ে করা হয় তখন জমি অত্যন্ত শুষ্ক থাকে, সেজন্য জল সেচনের পূর্ব্বে প্রত্যেক গাছের গোড়ার মাটি থালার আকারে ছোট

আইল বাঁধিয়া না দিলে উহা দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হইতে পারে না। গোড়ার মাটিতে বেশ রস হইয়াছে বুঝিয়া পরে আইল-সহ গোড়ার মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার।

যুঁইফুল

যুঁইফুলের গন্ধ মধুর, স্নিগ্ধ ও করুণ ভাবোদ্দীপক। ইহার গাছ লতানে ধরণের। ছাঁটিয়া কাটিয়া ও জাফরিতে উঠাইয়া প্রস্তুত করিতে পারিলে গাছের দৃশ্যও অতিশয় মনোহর হইয়া থাকে, এবং এক একটি গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উদ্যান-পালককে কৃতকৃতার্থ করিয়া তুলে। ইহার চারা খোঁচা-কলমে করা যায়। ইহার গাছের গোড়ার জমি হইতে ফুটিয়া যে-সকল ডগা বাহির হয় তাহা কাটিয়া তুলিয়া রোপণ করিলেও গাছ হয়। তাহা কয়েক মাস হাপোরে পালন করিয়া বাগানে রোপণ করা উচিত। বাগানের যে স্থানে চারা রোপিত হইবে, তথায় ফাল্গুন চৈত্র মাসে তিন ফুট ব্যাস ও দেড় ফুট গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে এক মণ আন্দাজ অর্দ্ধ পচা গোময় সার ফেলিয়া মাটি চাপা দিয়া রাখা উচিত। আষাঢ় মাসে খুব রোদের দিনে ঐ গর্ত্ত পুনরায় খুঁড়িয়া দুই-এক দিন রাখিয়া মাটি ও সার ভালরূপ মিলাইয়া লইতে হইবে। ইহার পর হাপোর হইতে চারার গোড়ার মাটি চাকা সহ উঠাইয়া রোপণ করা উচিত। ইহার পর পর্য্যায়ক্রমে ঘন ঘন কয়েক বার নিড়ানি ও আবশ্যকমত জল সেচন করিলে ইহার গোড়া হইতে সতেজ ডগাসকল বাহির হইয়া লতার ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া যাইতে থাকে। ঐ সকল ডগা দুই হাত আন্দাজ লম্বা হইলে গুচ্ছাকারে একত্র করতঃ জমির এক ফুট আন্দাজ উপরে কোমল কোন প্রকার রজ্জুর দ্বারা একটা বাঁধ দিয়া রাখিতে হইবে, এবং ঐ সকল ডগা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বাঁধের সংখ্যা বাড়াইয়া উপরে উঠাইতে হয়। এই সময় গাছটি এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতে থাকে। সেজন্য বাঁধনের সমান উচ্চ করিয়া বাঁশের কয়েকটি

খুঁটি আবশ্যক স্থানে পুঁতিয়া গাছের সহিত বাঁধিয়া সোজা রাখা দরকার। এই ভাবে ডগাগুচ্ছের বাঁধন-স্থান ক্রমে তিন ফুট উচ্চ হইলে আর না বাঁধিয়া ডগা চতুর্দ্দিকে সমভাবে ছড়াইয়া পড়িতে দেওয়া উচিত। ইহার ব্যাসার্দ্ধ দুই ফুটের বাহিরে যখন যে ডগার মাথা যাইবে তাহা সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রকারে ক্রমাগত কতক দিন ছাঁটিতে থাকিলে গাছের মাথা ছত্রাকার ও ঘন পত্রাবৃত হয়। গোড়ার ডগাগুচ্ছও ক্রমে একত্র জড়াইয়া কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় হইয়া সমস্ত ভার বহনে সমর্থ হয়। সেরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত খুঁটির সঙ্গেই বাঁধিয়া রাখা উচিত। প্রতি বৎসরান্তে একবার গাছের গোড়ার মাটি খুঁড়িয়া কতক গোময় সার দিয়া এবং সর্ব্বদা গোড়া পরিষ্কার করিয়া মাটী ধরাইয়া রাখিতে পারিলে এক একটি গাছ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া ফুল প্রদান করে। যুঁইফুলের দ্বারাও নানাবিধ মূল্যবান সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

রজনীগন্ধাফুল

রজনীগন্ধা সন্ধ্যায় প্রস্ফুটিত হয় এবং রাত্রিকালে ইহার সুগন্ধ অধিক বিকীর্ণ হয় বলিয়াই বোধ হয় রজনীগন্ধা নাম ধারণ করিয়াছে। গৃহ প্রাঙ্গণে ইহার পাঁচ-সাতটি ফুল ফুটিলে স্নিগ্ধ ও মধুর গন্ধে সমস্ত বাড়ী আমোদিত হয়। ইহা তৃণজাতীয়। মাটির নীচে ইহার যে গেঁড় হয়, তাহা হইতে গাছ হইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতনভাবে ঐ সকল গেঁড় তুলিয়া রোপণ করিলে তাহাতে যে গাছ হয় তাহাতেই ভাল ফুল হইয়া থাকে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত ইহার ফুল হইয়া গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া যায়।

যে-যে স্থানে রজনীগন্ধার গেঁড় পুঁতিতে হইবে, তথায় চারি ফুট ব্যাস পরিমিত স্থান মাঘ মাসে গভীর কোদালি করিয়া এক মণ আন্দাজ পচা গোময় সার মিলাইয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত। ফাল্গুনের মাঝামাঝি ঐ স্থান ঘন ঘন কয়েক বার কোদালি করিয়া

ঘাস মুথা বাছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দূরে দূরে পাঁচ-সাতটি করিয়া গেঁড় মাটিতে ডুবাইয়া পুঁতিয়া দিলে পনর-কুড়ি দিনের মধ্যেই চারা উঠিয়া থাকে। এই সময়ে বৃষ্টি না হইলে গাছ উঠিতে কতক দেরী হইয়া থাকে। সেজন্য কয়েক দিন জল দেওয়া উচিত। চারা অঙ্কুরিত হওয়ার পর মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দ্বারা মাটি যাহাতে দৃঢ় চাপ না বাঁধিতে পারে ও ঘাস জঙ্গল না হয়, সেরূপ করিতে থাকিলে যথাসময়ে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া থাকে। বৃষ্টির সময়ে গাছের গোড়া খুঁড়া উচিত নহে। বৃষ্টির জল যাহাতে গাছের গোড়ায় বসিতে না পারে প্রথম হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। এক-একটি গাছ হইতে এক একটি শীষ উঠিয়া তাহাতে কুড়ি-বাইশটি ফুল হয়। ঐ সকল ফুটিয়া শেষ হইলেই গাছটি মূলসহ সাবধানে উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। তাহা না করিলে ইহার চতুর্দ্দিকে যে-সকল নূতন চারা থাকে তাহা রীতিমত বর্দ্ধিত হইতে পারে না, কাজেই ফুলও ছোট হয়। রজনীগন্ধা ডবল (Double) ও সিঙ্গেল (Single) দুই প্রকার। ডবলগুলিতে দুইটি সিঙ্গেল ফুল যেন উপর্য্যুপরি বসানো বলিয়া মনে হয়। ইহা দ্বারাও নানা সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জবাফুল

জবাফুল নানা জাতীয়। ইহা প্রায় বার মাসই পাওয়া যায়। সেজন্য হিন্দুর পক্ষে ইহা নিত্যপ্রয়োজনীয়। ইহার গাছ যত্নপূর্ব্বক করিতে পারিলে এক একটি গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া বাগানকে সর্ব্বদা সুশোভিত করিয়া রাখে। একারণ সৌখিন লোকের বাগানেও ইহা যত্নের সহিত রোপিত হইয়া থাকে। জবার ডাল কাটিয়া রোপণ করিলেও গাছ হয় বলিয়া অনেকেই তাহা বাগানের নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিয়া থাকেন। ডাল কাটিয়া রোপণ করিলে সকল গাছ বাঁচে না; কাজেই ফাঁক পড়িয়া গিয়া বাগানের সৌন্দর্য্যের হানি করে। তাহা ছাড়া ঐ প্রকার রোপিত গাছ

প্রখর রৌদ্রের দিনে অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফুলও কম হয়, এমন কি কোন কোন গাছ মরিয়াও যায়। পৃথক্ হাপোরে চারা প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে গাছ করিতে পারিলে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; ফুলও আকারে বৃহৎ হইয়া থাকে। চারা প্রস্তুতের প্রণালী "খোঁচা কলম" শীর্ষে বর্ণিত হইয়াছে।

কার্ত্তিক মাসই জবার চারা বাগানে রোপণের উপযুক্ত সময়। ইহাতে জল সেচন ইত্যাদিতে শ্রম কতক বেশী হইলেও ঐ গাছ অধিক কষ্টসহিষ্ণু হয় বলিয়া তাহা অধিক দিন সতেজভাবে জীবিত থাকে। ফুল-বাগানের জমি প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ স্থানে কতক বেলে মাটি ও গোময় সার সম-পরিমাণে মিলাইয়া কতক হালকা হইলে আবর্জ্জনাশূন্য করতঃ সঞ্চিত করা দরকার। ইহার পর চারা রোপণের স্থান নির্দ্দেশ করতঃ তথায় দুই ফুট ব্যাস ও দেড় ফুট গভীর গর্ত্ত করিয়া ইহার তলায় হাঁড়ি-পাতিলভাঙ্গা খোলাম-কুচি ছয় ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া লইয়া ঐ পৃথক্ সঞ্চিত সার-মাটি দ্বারা গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করিতে হইবে। সমস্ত গর্ত্ত এইভাবে পূর্ণ হইলে হাপোর হইতে গোড়ার মাটির চাকাসহ চারা উঠাইয়া আনিয়া তথায় রোপণ করা রচিত। রোপণ করিবার সময় চারা পূর্ব্বাপেক্ষা দুই-তিন ইঞ্চি অধিক দাবাইয়া বসাইতে হইবে এবং চারার গোড়ার স্থান কতক গর্ত্তের আকারে রাখিয়া দিতে যেন ভুল না হয়। চারা রোপণের পর দিন হইতে ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন এক বেলা জল দিয়া পরে যো হইলে গোড়া খুঁড়িয়া মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দেওয়া দরকার। ইহার দুই-তিন দিন পর ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন জল দিয়া পুনরায় যো হইলেই অপেক্ষাকৃত গভীর ও বিস্তৃত ভাবে মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দিয়া গোড়ায় কতক মাটি ধরাইয়া জমি সমান করিয়া দেওয়া উচিত। ইহার পর সর্ব্বদা বাগান পরিষ্কার রাখিয়া প্রতি বৎসরই কার্ত্তিক মাসে প্রত্যেক গাছের ডাল আন্দাজমত ছাঁটিয়া দিতে হয় এবং এক বার সমস্ত বাগান কোদালি করিয়া গাছের গোড়ার মাটি

কতক সরাইয়া, সারযুক্ত মাটি দিয়া ভরিয়া দেওয়া উচিত। সারযুক্ত মাটি ভরিবার পর ক্রমাগত চার-পাঁচ দিন প্রচুর জল দিয়া যো হইলেই মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন। উল্লিখিত প্রণালীতে রোপিত গাছের গোড়ায় সর্ব্বদা জল না দিলেও গাছ বেশ সতেজ থাকে এবং পাতার অনুপাতে ফুলও আকারে বড় হয়। এই প্রণালীতে সকল প্রকার জবা, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ ইত্যাদি গাছ রোপণ করা উচিত।

চন্দ্রমল্লিকা

চন্দ্রমল্লিকা ফুলে গন্ধ নাই, কিন্তু রূপের ছটায় ইহা প্রকৃতই ফুল-রাণী বিশেষ। চন্দ্রমল্লিকা অনেক প্রকার আছে। তন্মধ্যে সাদা রঙের ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। ইহার এক একটি ফুল সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইতে প্রায় পনর দিন লাগিয়া থাকে এবং প্রস্ফুটিত হইয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বাগানকে সুশোভিত রাখে। ইহার গাছ মরসুমী ফুল গাছের ন্যায় অতিশয় কোমল ও সুখী, একারণ গাছ জমিতে বসাইলে প্রখর রৌদ্রের সময় নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও ঝড়-বৃষ্টির সময় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেজন্য ইহার গাছ টবে করাই শ্রেয়। ইহার গাছে কার্ত্তিক মাস হইতে ফুল ফুটিতে আরম্ভ করিয়া মাঘ ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অসংখ্য ফুল ফুটিয়া থাকে। ইহার পর গাছ ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু তখনও ইহার মূল জীবিত থাকে বলিয়া ইহাতে জল সেচন ইত্যাদি আবশ্যক তদ্বির করিতে হয়। তাহা হইলে পুনরায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ইহার জমি হইতে অসংখ্য ডগা ফুটিয়া থাকে। তাহাই পুনরায় তুলিয়া সময়মত রোপণ করিতে হয়। কেহ কেহ বাগানের রাস্তার দুই পার্শ্বে ইহা রোপণ করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে অধিকতর যত্ন করা বিশেষ দরকার হয়। চন্দ্রমল্লিকা গাছের পক্ষে গোময় ও পাতা সারই অধিক উপযোগী। বেশী বালির ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটি অর্দ্ধেক, গোময় চারি আনা ও পচা পাতা চারি আনা

একত্রে মিলাইয়া কোন ছায়াযুক্ত স্থানে মাসাধিক কাল পূর্ব্ব হইতে রাখিয়া দেওয়া উচিত। ভাদ্র মাসের প্রথমে ঐ মাটি দ্বারা টব পূর্ণ করিয়া তাহাতে দুই-চারিটি করিয়া চন্দ্রমল্লিকার ডগা পুঁতিয়া জলসেচন ইত্যাদি নিয়মমত করিতে থাকিলে গাছ যথারীতি বর্দ্ধিত হইয়া যথাকালে ফুল ফুটিয়া থাকে।

টবের তলায় দুই-তিন ইঞ্চি পুরু করিয়া হাঁড়ি-পাতিল ভাঙ্গা খোলাম-কুচি বিছাইয়া তদুপরি মাটি পূর্ণ করিয়া টবে গাছ রোপণ করিতে হয়। তাহা না করিলে টবে জল আটকাইয়া গিয়া গাছ মরিয়া যায়। টবে সর্ব্বপ্রকার গাছ রোপণ সম্বন্ধেই এই নিয়ম পালন করা আবশ্যক হয়।

গাঁদাফুল

গাঁদাফুল অসংখ্য প্রকারের। ইহা সকলেরই পরিচিত। কিন্তু পরিচর্য্যার অভাবে ইহার সৌন্দর্য্য সকল স্থানে ঠিক ঠিক বিকশিত হয় না। শীতকালে উদ্যানের সৌন্দর্য্যের অভাব পূরণে ইহার ন্যায় ফুল কমই দৃষ্ট হয়। ইহার বীজের গাছে ফুল ভাল হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে গাঁদার সুপরিপক্ক ফুল ভাঙ্গিয়া জমিতে ছড়াইয়া দিয়া মাটি কতক খুঁড়িয়া রাখিলে তাহাতে অসংখ্য চারা হয়। ইহার দুই-চারিটি রাখিয়া কতক যত্ন করিলে তাহাতে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা হইয়া থাকে। ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঐ সকল শাখা কাটিয়া পুনরায় রোপণ করিলে প্রত্যেকটিরই গাছ ভাল হয় এবং তাহাতে অসংখ্য ফুল হইয়া থাকে। শাখার অগ্রভাগের গাছের ফুলই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়। শাখার নিম্ন হইতে নিম্নতর অংশের ফুল ক্রমেই ছোট হইয়া থাকে। ইহা না জানিয়া রোপণ করার দরুন অনেককেই বিফলমনোরথ হইতে দেখা যায়। গাঁদা-ফুলের চারা যে-যে স্থানে রোপণ করিতে হইবে, তথায় ভাদ্র আশ্বিন মাসে এক ফুট ব্যাসের গভীর গর্ত্ত করিয়া গর্ত্তের এক-তৃতীয়াংশ

আন্দাজ পচা গোময় দ্বারা পূর্ণ করিয়া কতক মাটি চাপা দিয়া রাখা উচিত। চারা রোপণের চার-পাঁচ দিন পূর্ব্বে ঐ গর্ত্তের মাটি খুরপি দ্বারা খুঁড়িয়া সার ও মাটি ভালরূপ মিলাইয়া অপরাহ্নে গাঁদা শাখার অগ্রভাগ মাত্র তের-চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা রাখিয়া কাটিয়া দুই দুইটি এক গর্ত্তে সাত-আট ইঞ্চি নীচে দাবাইয়া ও ঈষৎ হেলাইয়া বসাইয়া ক্রমাগত তিন-চার দিন এক বেলা জল দেওয়া উচিত। ইহার পর মাটিতে যো হইলে চারার গোড়া খুঁড়িয়া গর্ত্তের অপূর্ণ অংশ কতক ভরিয়া দিতে হইবে। গর্ত্ত একাধিক বারে ভরিয়া দেওয়াই ভাল। গাঁদাফুলের শাখা অধিক দাবাইয়া না বসাইলে গাছ অকালেই বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া আশানুরূপ ফুল হইতে পারে না। চারা রোপণের পর তাহা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে দ্রুত বাড়িয়া উঠে। তখন ইহার মাথা ছাঁটিয়া দিতে হয়। এইভাবে কিছুদিন পর পর কয়েক বার ছাঁটিয়া কাটিয়া দিলে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া যথাকালে অসংখ্য ফুল হইয়া বাগানকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে।

গাঁদার চারা ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত রোপণ করা যায়। কতক অগ্রপশ্চাৎ করিয়া চারা রোপণ করিলে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ফুল পাওয়া যায়।

মরসুমী ফুল (Season flower)

মরসুমী ফুল অনেক জাতীয়। ঋতু-বিশেষে ইহাদের গাছ হয় ও ফুল ফোটে এবং ফুল ধরা শেষ হইলে গাছ আপনা হইতেই মরিয়া যায়। সেজন্যই ইহাদিগকে মরশুমী ফুল নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। তাহা হইলেও ইহারা বিশ্বশিল্পীর এক আশ্চর্য্য কারিগরি বিশেষ। ইহাদের ক্ষুদ্র মাঝারি বৃহৎ নানা বর্ণ ও আকার প্রকারের এতই বাহুল্য যে, উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্রতায় অনেক স্থায়ী ও সুন্দর ফুলের বিশিষ্ট গাছকেও পরাস্ত করে। ইহাদের সকলের সম্যক্ পরিচয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দিতে হইলে স্বতন্ত্র আর একখানা পুস্তক

হইয়া যায়। সেজন্য এ সকলের উল্লেখ না করিয়া কেবল ইহাদের রোপণ, বপন ও তদ্বির প্রণালী সম্বন্ধে আবশ্যক কথাগুলিই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। এ ধরণের জ্ঞানের অভাব হইতে স্থানে স্থানে অনেককে বিফলাশা হইতে দেখিয়া সময় সময় অতিশয় দুঃখিত হইতে হইয়াছিল।

মরসুমী ফুলের গাছ বেশীর ভাগই শীত ঋতুতে হয় এবং কতক-গুলি বর্ষকালে হইয়া থাকে। বাগানের খোলা জায়গায় বা রাস্তার দুই ধারে ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার, অর্দ্ধ গোলাকৃতি,. ডিম্বাকার ইত্যাদি নানা আকারের স্থালী (flower-bed) যেখানে যে প্রকার মানানসই হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ প্রস্তুত করিয়া ক্ষুদ্র ও বৃহদাকারের ফুলের জাতি ও শ্রেণী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থালীতে রোপণ করিয়া কতিপয় জাতির বা সকলটারই এক স্থানে সমাবেশ করিয়া লইতে পারিলে, তাহা প্রকৃতই এক উপভোগ্য বস্তু হইয়া উঠে। এই জন্যই বোধ হয় বর্ত্তমানে ইহা রোপণের দিকে শিক্ষিত সমাজের বেজায় ঝোঁক পড়িয়া গিয়াছে। মরসুমী ফুলের বীজ বিক্রয় বীজ-বিক্রেতা ব্যবসায়ীগণের ব্যবসাকেও দিন দিনই জাঁকাইয়া তুলিতেছে। মরসুমী ফুল গাছ প্রায় সকলই অত্যন্ত কোমল শরীর এবং অনেকটা সুখী ধরণের। সেজন্য ইহাদের গাছ জন্মাইতে হইলে তদনুরূপ যত্নাধিক্য আবশ্যক হয়। ইহার অভাবে কেবল অর্থ নষ্ট ও মনঃ-কষ্টই হইয়া থাকে। মরসুমী ফুলের বীজের প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে তাহাদের হুবহু চিত্র সহ নাম ও বীজ বপনের সময় ইত্যাদি মোটামুটি যাহা লেখা থাকে, তাহা দেখিয়া তখন তখন অর্থাৎ অল্প সময় হাতে রাখিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে নৈরাশ্যের কারণ অনেকটা দূরীভূত হইতে পারে। যাহারা মরসুমী ফুলের বাগিচা করিয়া ঠিক ঠিক চরিতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মনে রাখা নিতান্তই উচিত যে, যে সকল গাছপালা যত কোমল শরীর ও সুখী ধরণের হইবে, সে সকলের জমি তত অধিক সময় হাতে রাখিয়া

কোদালি করা ও সার দিতে প্রবৃত্ত হওয়াই সাফল্য লাভের প্রধান উপায়। অল্পকর্ষিত ও অল্পদিনের কর্ষিত এবং অপক্ক সারযুক্ত জমিতে কোমল-স্বভাব উদ্ভিদের চারা রোপণ করিলে কেন তাহা হতশ্রী হইয়া পড়ে তাহা সারের ব্যবহার ও কর্ষণের উপযোগিতা বর্ণন প্রসঙ্গে নানা যুক্তিসহকারে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। এক্ষেত্রে সে-সব কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

আমরা মরসুমী ফুলের চারা রোপণের জন্য "বারমেসে" জমিই অধিকভাবে মনোনীত করিয়া থাকি। যেখানে তাহা করিতে পারা যায় না, তথায় কপির জমিতে কোদালি করিবার সময়েই মরসুমী ফুলের জমি কোদালি ও সঙ্গে সঙ্গে সার দিয়া একই নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে। গোময় ও খৈল বিমিশ্রভাবে ব্যবহার করাই মরসুমী ফুলের উন্নতি করিবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। ইহা কপির জমির সিকি পরিমাণের অধিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অধিক সার দিলে গাছ অতিশয় লম্বা হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় ও সারের শক্তি গাছপাতার পুষ্টি সাধনে ঝুঁকিয়া পড়ায় ফুল আকারে ছোট ও সংখ্যায় নগণ্য হইয়া থাকে।

মরসুমী ফুলের জমিতে অনেকে পাতা-পচা সার ব্যবহার করিবার বিশেষ পক্ষপাতী। আমরা মনে করি, ইহা অবস্থা-বিশেষেই প্রয়োগ করা উচিত। জমির মাটি অধিক এঁটেলের ভাগ-যুক্ত হইলে আমরাও গোময় ও খৈলের সহিত বিমিশ্রভাবে পাতা সার দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। কারণ পাতা সার মাটিকে সর্ব্বদা ঢিলা রাখিতে পারে একথা সার অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সেজন্য টবে বসানো কোমল-স্বভাব কোন কোন গাছের উন্নতির জন্য ইহাকে আমরা অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। তাহা বলিয়া সকল জমিতেই পাতা সার না দিলে অনিষ্ট হইবে মনে করা ভুল।

চারা প্রস্তুত ও রোপণঃ শীতের প্রারম্ভে সাধারণতঃ কার্ত্তিক মাসেই মরসুমী ফুলের বীজ যার যার সুবিধামত টবে

অথবা বীজতলায় বপন করিয়া চারা করিতে পারা যায়। যে প্রকারেই চারা করা হউক, মাটির উৎকর্ষের উপরই ইহার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাটি খুব নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল করিতে হইলে বাগানের জমিতে কোদালি করিতে প্রবৃত্ত হইবার সমসময়েই বীজতলা বা টবের মাটি প্রস্তুতের কার্য্যে প্রবৃত্ত ও তাহা ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে। মাটি ঠিক ঠিক উপযোগী হইলে বীজ বপনের পর আবশ্যকমত জল দিতে থাকিলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে প্রায় কোন বিঘ্ন হয় না এবং নিয়মমত তদ্বির করিলে কোনটা দুই সপ্তাহ এবং কোন কোনটা তিন সপ্তাহ পরে জমিতে রোপণের উপযুক্ত হইয়া থাকে। চারা কচি অবস্থায় খুব সাবধানতার সহিত তুলিয়া রোপণ করাই গাছের উন্নতি ও শীঘ্র ফুল ধরাইবার ভাল উপায়। চারা অধিক বয়সের করিয়া রোপণ করিলে তাহা বাঁচানো কষ্টসাধ্য হয়, গাছের উন্নতি হইতেও বিলম্ব হইয়া থাকে।

স্থান সন্নিবেশঃ—মরসুমী ফুলের গাছের মধ্যে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের গাছ ও ফুল আছে। ইহা ঠিক ঠিক জানা না থাকিলে ইহাদের রোপণের স্থান সন্নিবেশ করা কতকটা অসাধ্য হইয়া উঠে। এসকল অসুবিধা নূতন লোকের পক্ষেই অধিক হইয়া থাকে। অসুবিধা এড়াইতে হইলে বীজের প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে ইহাদের নাম, গাছ ও ফুলের চিত্র যাহা থাকে, তাহা দেখিয়া কোন্ স্থানে কোন্‌টা রোপণ করিতে হইবে, ইহার একটা ধারণা অগ্রেই করিয়া লইতে হইবে এবং ধারণার বিপরীত কোন কাজ না হয়, ইহার উপায়স্বরূপ বীজতলায় বা টবে বীজ বপন করিবার সময় প্যাকেটের গায়ের লিখিত নাম দৃষ্টে সেই সেই নামের পৃথক্ লেবেল লিখিয়া বীজতলায় বা টবে কোন উপায়ে আঁটিয়া রাখিয়া প্যাকেটের কাগজটা রাখিয়া দিতে হইবে, যেন চারা রোপণের সময় ইহার সহিত মিলাইয়া নিঃসংশয় হইয়া কাজ করিতে পারা যায়।

তদ্বির ঃ চারা রোপণের পর প্রথম তিন-চার দিন দুই বেলাই আন্দাজ মত জল দিয়া চারা বাঁচিয়া গিয়াছে বুঝিলেই এক অথবা দুই দিন জল দেওয়া বন্ধ রাখিয়া নিড়ানি দিয়া মাটির চাপ ভাঙ্গিয়া দিয়া সম্ভবমত মাটি ধরাইয়া দিতে হইবে। ইহার পর ঘন পর্য্যায়ে জল সেচন করা ও নিড়ানি দেওয়া এবং আবশ্যক মত গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দেওয়াই কাজ। চারা বড় হইতে থাকিলে ইহাদের গোড়ার স্থান ক্রমেই ছায়াযুক্ত হইয়া পড়িবে ও সেই অনুপাতে জল সেচনের কাজও কমাইয়া লইতে হইবে।

সাবধানতা ঃ—ডালিয়া প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ ফুলের গাছ অতিশয় স্থূল ও কোমল-শরীর সম্পন্ন। পিপীলিকা ইহাদের পরম শত্রু। ইহার গাছ ও ফুলে সময় সময় পিপীলিকার উপদ্রব সৃষ্টি হইয়া গভীর মনস্তাপের কারণ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং জমি প্রস্তুতের সূচনায়ই ইহার জন্য সাবধান হইতে হইবে। কোন স্থানে পিপীলিকার প্রভাব বেশী দেখা গেলে, যদি সম্ভব হয় তবে সে স্থান ত্যাগ করাই উচিত। অনিবার্য্য কারণে তথায় মরশুমী ফুলের চাষ করিতে হইলে ইহার পিপীলিকা দূর করিবার প্রধান উপায়—ঐ স্থানে ঘন ঘন কোদালি করিয়া মাটিকে অগ্নিবৎ গরম করিয়া লওয়া।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

বিবিধ কৃষি

আদা বা আদ্রক

আদা খুব লাভের কৃষি এবং ইহার প্রয়োজন বা কাট্‌তিও কম নহে। আদা খাদ্য বা মসলার জন্যই যে কেবল ব্যবহৃত হয় এমন নহে। পরন্তু ইহা নানা ভেষজগুণসম্পন্ন বলিয়া ইহার বেশীর ভাগই এই শ্রেণীর নানা কাজে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই কারণে ইহা এক দেশ হইতে অন্য দেশে আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ চাষীদের কেহই বিস্তৃতভাবে আদার চাষ করে না। কাজেই ইহার চাষের লাভালাভের কোন হিসাব পাইবারও কোন সুবিধা হয় না। পক্ষান্তরে, আমাদের হাটে বাজারে যত আদা বেচা-কেনা হয়, ইহার কিয়দংশ গৃহস্থগণ আপনাপন বসতবাড়ীর উপরেই ফলাইয়া থাকে এবং তাহা প্রায়ই বৃক্ষাদি ও বাঁশ ঝাড়ের ছায়াযুক্ত অযোগ্য স্থানে ফলাইয়া থাকে বলিয়া যতটা পাওয়া উচিত, তাহা পাইতে পারে না। কাজেই আদার ঠিক ঠিক উৎপন্নের হার কত তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। অথচ বাজারে ইহার কোন কালেই অনাদর নাই। পরন্তু স্থানীয় উৎপন্ন আদা দ্বারা প্রয়োজন পূরণ হয় না বলিয়াই দূর স্থানজাত আদা ক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

আমরা আদার উৎপন্নের পরিমাণ ঠিক ঠিক ভাবে বুঝিবার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ ক্রমাগত কয়েক বার প্রণালীবদ্ধ ভাবে আদা ফলাইয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা হইতে বলিতে পারি যে, জমি ভাল হইলে এক বিঘা জমিতে বৎসরে চল্লিশ মণ আদা পাইতে প্রায় কোন বিঘ্ন হয় না। আদার মূল্য খুব সুলভতার সময়েও কোন স্থানেই প্রতি মণ চারি টাকার কম নহে এবং সময়

সময় স্থানে স্থানে দশ টাকা পর্য্যন্তও বিকাইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহা যে খুব লাভের কৃষি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহাদের আদা ফলাইবার উপযোগী জমি আছে, তাহাদের পক্ষে বিস্তৃত আকারে ইহার চাষে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

আদার জমিঃ—বেশী বালির ভাগযুক্ত দোআঁশ মাটি অথচ খুব উর্ব্বর জমিই আদার চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। যে সকল স্থানে স্বভাবজাত শটির গাছ দ্রুত বৃদ্ধিশীল হইতেছে দেখা যায় তথায় আদা হলুদ ভাল হইবে মনে করা ভুল নহে,—একথা মাটির পরিচয় প্রসঙ্গেও একবার বলা হইয়াছে। তবে এখানে পুনরুল্লেখ করিবার কারণ এই যে, দেশের স্থানে স্থানে শটির গাছে পূর্ণ পতিত ভূমি বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সারঃ—আদার পক্ষে ছাইই উৎকৃষ্ট সার। জমি নীরস হইলে যথেষ্ট পরিমাণ ছাইয়ের সহিত কতক গোময় ব্যবহার করা দরকার। জমিতে আদার চাষ করিলে ইহার বলক্ষয় অতি মাত্রায় হইয়া থাকে। সুতরাং একস্থানে ক্রমাগত কতিপয় বৎসর আদার চাষ করিতে হইলে বৎসরের পর বৎসর সারের মাত্রা বাড়াইয়া দিতে হইবে। আদার জমিতে গোময় ও অন্যান্য ছাইয়ের সহিত সম্ভব হইলে বিঘা প্রতি অন্ততঃ দশ মণ কচুরির ছাই ব্যবহার করা উচিত। কারণ অন্যান্য জিনিসের ছাই অপেক্ষা ইহাতে পটাসের ভাগ অনেক বেশী। কন্দ-মূল জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে অধিক পটাসের ভাগযুক্ত সারের উপযোগিতার কথা সার অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে।

জমি-প্রস্তুতঃ—চৈত্র কিম্বা বৈশাখে প্রথম বৃষ্টিপাতের পরই আদা রোপণের প্রকৃষ্ট সময়। কাজেই মাঘের প্রথম হইতেই আদার জমি কর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আবশ্যক পরিমাণ সার দিয়া ও ক্রমেই ভাল লাঙ্গল ব্যবহার করিয়া গভীর কর্ষণ ও মাটি ধূলিবৎ চূর্ণ করা দরকার।

বীজ বপন ঃ—বীজ বপনের মাসাধিক পূর্ব্বেই বীজের আদা সংগ্রহ করিয়া গৃহের মধ্যে নিভৃত ও ঠাণ্ডা জায়গায় দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া ধূলা মাটি দিয়া তদুপরি বীজের আদাগুলি ছড়াইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে আদার যে-সব চোখ হইতে গাছ উঠে তাহা কতকটা স্ফীত হইয়া উঠে ও তাহা হইতেই গাছ হয়। আদা বপন করিবার সময় তাহা হাতে ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা করিয়াই বপন করিতে হয়। তখন এক একটা টুক্‌রার মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ তিন-চারটি চোক থাকে এই ভাবে টুক্‌রা করিয়াই বপন করিতে হইবে। বিঘা প্রতি আদার বীজ সাধারণতঃ তিন মণের অধিক লাগে না। কিন্তু উল্লিখিত ভাবে টুক্‌রা করিতে যাওয়ায় মধ্য-স্থানের চোকশূন্য অংশ কতকটা বাদ দিতে হয় বলিয়া তিন মণের স্থলে চারি মণ সংগ্রহ করা দরকার হইয়া থাকে। বীজ বপনের পর ঐ বাতিল করা অংশ বিক্রয় করা বেশী কঠিন হয় না। যাহা হউক, আদার বীজ টুক্‌রা করিতে উল্লিখিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে বা কোন প্রকার কৃপণতার আশ্রয় গ্রহণ করিলে ইহার সকল গাছ একভাবে গজাইয়া উঠিবে না এবং কোন কোন গাছ একহারা ধরণের ও মৃতকল্প হইয়া উঠিবে। কাজেই আশানুরূপ ফললাভেও বঞ্চিত হইতে হইবে। খনার বচনে আছে, "আদা রুয়ে কণা কণা, হলদি রুয়ে কণা কণা"। কণা কণার মানে অনেকগুলি চোকযুক্ত টুক্‌রাই বুঝিতে হয়। মোট কথা, বীজের সম্বন্ধে উল্লিখিত নিয়মগুলি ঠিক ঠিক পালন করাই আদার চাষে সাফল্য লাভের প্রধান উপায়। ইহার জন্য বীজের আদা ক্রয় করিবার কালেই ভালরূপ দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক বাজারে বন্দরেই পার্ব্বত্য স্থানজাত একপ্রকার আদা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী করা হইয়া থাকে। এই আদা বেশ মোটা, দেখিতেও মনোরম। কিন্তু ইহা খাইতে ভাল নয় বলিয়া অপেক্ষাকৃত সুলভে পাওয়া যায়। ইহা রোপণ করিলে ফল ভাল হয় না একথা স্মরণ রাখিয়া বীজের আদা ক্রয় করিতে হইবে।

বীজের আদা সব ঠিক করিয়া লইয়া বপন করিবার স্থানে আরও দুই বার উপর্য্যুপরি চাষ-মৈ দিয়া সমান করিয়া ও বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য চতুর্দ্দিকের নালা নর্দ্দমা ঠিক করিয়াই আদা রোপণ করিতে হইবে। দুই ফুট দূরে দূরে লাঙ্গল টানিয়া খাদের মধ্যে আধ হাত অন্তর অন্তর এক একখানা আদা রাখিয়া দুই পার্শ্বের মাটি হাতে টানিয়া সমান করিলেই বীজ বপনের কাজ শেষ হইল।

তদ্বিরঃ—আদা বপনের পর সমস্ত চারা উঠিতে কিঞ্চিদধিক এক মাস সময় লাগিয়া যায়। সমস্ত চারা উঠিয়াছে দেখিলেই এক বার খুব সাবধানতার সহিত নিড়ানি দিয়া ঘাস-জঙ্গলের অঙ্কুর বিনাশ করা ও গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ মাটি ধরাইয়া দেওয়া দরকার। এই পর্য্যন্ত করা হইলে দ্রুত গতিতে বাঁধিতে থাকিয়া এক মাস যাইতে না যাইতে প্রত্যেকটি গাছই ঘন ঝোপের মত হইয়া পড়ে। তখন প্রখর রোদের দিনে প্রতি দুই সারির মধ্যে গভীর ভাবে লাঙ্গল টানিয়া সঙ্গে সঙ্গে মাটি হাতে ধরাইয়া দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিলেই কাজ এক প্রকার শেষ হইল। এই পর্য্যন্ত কাজ হইতে প্রায় সারা আষাঢ় মাসই লাগিয়া থাকে। ইহার পর আদার জমিতে একটু আধটু ঘাস-জঙ্গল হইলেও ঘন ঘন বৃষ্টি বাদলার দরুন কোন কাজ করিতে পারা যায় না এবং সেরূপ করিবার জন্য প্রয়াস পাওয়াও ভাল নয়। কারণ ভিজা মাটির উপর বিচরণ করিয়া কিছু করিতে গেলে তদ্দ্বারা আদা গাছের উপকার না হইয়া বিশেষ অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিকে বৃষ্টি-বাদলা বন্ধ হইয়া যখন মাটি বেশ শুকাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে তখন আর এক বার নিড়ানি দিয়া ঘাস-জঙ্গল পরিষ্কার করতঃ সঙ্গে সঙ্গে প্রতি সারির মধ্যে হাত লাঙ্গল টানিয়া হাতে মাটি ধরাইয়া দিয়া দাঁড়া ঠিক করিয়া দিলেই কাজ শেষ হইল। যত্নের গুণে ইহার পরেও কিছু দিন পর্য্যন্ত গাছগুলি বেশ সতেজ দেখাইলেও শীত বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-নিয়মেই এ সব ক্রমে নিস্তেজ হইয়া মরিতে থাকিয়া

চৈত্র মাসে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। তখন সমস্ত আদা একসঙ্গে তুলিয়া বিক্রয় করিতে ও পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য উদ্যমসহকারে জমিতে হাল চাষ করিতে ও সার দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কেহ কেহ দুই বৎসর পর আদা তুলিবার বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাতে যে আদার পরিমাণ কতক বাড়িয়া থাকে তাহাও আমরা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু যে পরিমাণ আদা বাড়ে, ইহার জন্য এক বৎসর প্রতীক্ষা করা ব্যবসা হিসাবে লোকসানজনক বলিয়া প্রতি বৎসর রোপণ করাই সঙ্গত। যদি কোন স্থানে যত্ন করিয়া কিংবা মাটির গুণে বৎসর অন্তেও গাছ জীবিত ও সতেজ থাকিয়া যায়, তবে সে-সব গাছ নিস্তেজ হওয়া বা মরিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত রাখিয়া যে-কোন সময়ে তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গাছ মরিয়া গেলে রাখা উচিত নহে।

হলুদ বা হরিদ্রা

ইহার প্রয়োজনের গুরুত্ব কত তাহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহাও লাভজনক কৃষি। চাষের প্রণালী, বীজ বপনের সময় ইত্যাদি ঠিক আদারই মত। বীজ প্রতি বিঘায় এক মণ করিয়া লাগে। হলুদ দুই বৎসর পর তোলাই ভাল। কাঁচা হলুদের মূল্য আদা অপেক্ষা অনেক কম হইলেও উৎপন্নের হার আদা অপেক্ষা অনেক বেশী। শ্রম ও ব্যয় নগণ্য বলিয়া ইহার চাষে বেশ লাভই হইয়া থাকে।

হলুদের গাছের তদ্বির প্রথম বৎসরে আদার ন্যায় করিয়া বৎসরান্তে ইহার পাতা মাটির উপরে এক ফুট আন্দাজ রাখিয়া কাটিয়া ফেলিয়া আর এক বার নিড়ানি দিয়া দাঁড়া তুলিয়া দিলেই কাজ শেষ হইল। তারপর মাসে মাসে সমস্ত হলুদ তুলিয়া লইতে ও পরবর্ত্তী ফসলের জন্য জমিতে হাল চাষ করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এরণ্ড, রেড়ি (Castor)

আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদিতে এরণ্ডের নানা প্রকার ভেষজ গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বীচিতে যথেষ্ট পরিমাণ তৈল রহিয়াছে,

ইহা অনেকেই জানেন এবং তৈলের জন্যই প্রধানভাবে ইহার চাষাবাদ হইয়া থাকে। রেড়ীর তৈল নানা কাজে লাগে এবং ইহার খৈল কৃষিক্ষেত্রের উৎকৃষ্ট সার। ইহার ব্যবহার জগদ্ব্যাপী বলিতে হইবে। সেজন্য ইহার চাষের প্রয়োজন অত্যধিক। রেড়ির তৈল ও খৈলের মূল্যও কম নহে।

রেড়ির চাষ বিশেষ লাভজনক কৃষি। কারণ ইহার চাষে শ্রম বা ব্যয়বাহুল্য বিশেষ কিছুই নাই। রেড়ির পাতা গবাদিতে খায় না এবং ইহার চাষে অন্য কোন প্রকার বিঘ্ন নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ইহার উৎপন্ন বীচি বিক্রয় করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহার বেশীর ভাগই লাভের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, এতদঞ্চলে কেহ ইহার চাষ প্রণালীবদ্ধ ভাবে করে না। পল্লীগ্রামের ভিতর স্থানে স্থানে দশ-বিশটা গাছ যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও রোপিত গাছ নহে। রেড়ি গাছের স্বভাব এই যে, কোন স্থানে দুই একটা গাছ একবার হইলে তাহাতে অসংখ্য ফল হইয়া থাকে এবং তাহা ফুটিয়া বীচি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা হইতে অসংখ্য চারা অনবরত উঠিয়া থাকে। এসব গাছ ধ্বংস না করিলে তাহা ক্রমে বড় হইয়া ফলবান হইয়া বীচি পড়িয়া গাছের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া থাকে। একটু যত্ন করিলে এক একটা গাছ দশ-বার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ ও বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হইয়া বৎসরাধিক কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ফল দান করে। গরীব লোকের মধ্যে অনেকে এই ভাবে কয়েকটা গাছ রাখিয়া তাহা হইতে বীচি সংগ্রহপূর্ব্বক তৈল বাহির করিয়া প্রদীপ জ্বালাইবার কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহার চাষের আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব পাইতে পারা যায় না। আমার মনে হয়, ইহাই দেশের চাষীকে এরণ্ডের চাষে বিরত করিয়া রাখিয়াছে। বাল্যকালে দেখিয়াছি, আমাদের অঞ্চলের নমঃশূদ্র জাতীয় স্ত্রীলোকেরা এণ্ডিপোকা পালন করিত এবং পোকার খাদ্যের জন্য স্বভাবজাত এরণ্ড গাছের বিশেষ যত্ন লইত। অধিকতর দুঃখের

কথা, এই বস্ত্র-শিল্প তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বভাব-জাত এরণ্ড গাছও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কদাচিৎ কোন স্থানে যাহা হয়, তাহা কাটিয়া লোকে জ্বালানি কাঠের কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সব কারণ বশতঃ এরণ্ডের চাষ ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের চাষীদেরই একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে। বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিলে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহা হউক, অতঃপর এরণ্ড চাষের প্রণালী বলা যাইতেছে।

এরণ্ড বীজ মাটিতে পড়িলে সব ঋতুতেই গাছ উঠিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে ফল ধরে, একথা পূর্ব্বেও একবার বলা হইয়াছে। তা' বলিয়া যে-কোন ঋতুতে ইহার বীজ বপন করিতে হইবে না। কারণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শীতকালে যে সকল গাছ ফলবান হয় তাহাতে ফলের সংখ্যা অধিক হয়। বীচিগুলিও অধিক পুষ্ট হয় এবং তাহাতে তৈলের ভাগ অধিক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে যে সকল গাছ ফলবান হয় তাহাতে ফলের সংখ্যা কম ও অপুষ্ট হয়। অধিক বারিপাতের দরুন ফুলের পরাগরেণু বেশীর ভাগই ঝড়িয়া পড়িয়া যায় এবং বোধ হয় এই কারণে তাহাতে মক্ষিকার (পরাগরেণু সঞ্চয়নকারী) তিরোভাবও ঘটাইয়া থাকে। এসব বিবেচনা হইতে যাহাতে গাছ কার্ত্তিকের প্রথম হইতেই পুষ্পিত হইতে পারে এই হিসাবে সময় হাঁতে রাখিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। এরণ্ড গাছের বয়স কিঞ্চিদধিক দুই মাস হইলেই পুষ্পিত হয়। তাহা হইলে যাহাতে অন্ততঃ ভাদ্রের প্রথমেই বীজ বপন করা যাইতে পারে এই হিসাবে ইহার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্ব হইতে জমি প্রস্তুতের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দোআঁশ মাটি ও খুব উর্ব্বরা জমিতেই এরণ্ড গাছ ভাল হয়। এরণ্ডের জমিতে বৃষ্টির জল সামান্য পরিমাণে বসিতে দিলেও গাছ দ্রুতগতিতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে ও কোন কোন গাছের মৃত্যুর প্রধান কারণ হয়। ঈষৎ ঢালু জমি নির্ব্বাচন করিলে সে বিষয়ে সহজেই নিশ্চিন্ত

হওয়া যায়। জমি অনুর্ব্বর হইলে যথেষ্ট পরিমাণ সার দিয়া ও দুই-চারি দিন পর অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বার গভীর চাষ দিয়া মাটি চূর্ণ ও নির্ম্মল করিয়া বীজ বপন করিতে হইবে। উত্তমরূপ কর্ষিত জমিতে জাত তৈলজ দ্রব্যাদিতে তেলের ভাগ বেশী হয়, একথা কর্ষণের উপযোগিতা বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সে সকল কথা এস্থলে স্মরণীয়।

জমি প্রস্তুত হইলে বিঘা প্রতি আড়াই সের বীজ ছিটাইয়া দিয়া উপর্য্যুপরি দুই বার চাষ ও পরে মৈ দিয়া সমান করিয়া দিতে হইবে। ইহার পর চারা উঠিয়া এক ফুট আন্দাজ লম্বা হইলে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল চারাগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কেবল পুষ্ট ও সতেজগুলি এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন এক চারা হইতে অন্য চারার দূরত্ব অন্ততঃ চারি ফুটের কম না হয়। চারা অধিক ঘন হইলে গাছগুলি ডালপালা বিহীন একহারা ধরণের হয়। কাজেই ফলের সংখ্যা কম হইয়া থাকে। অধিক ডালপালাযুক্ত সতেজ একটি গাছ যত ফল দিতে পারে, নীরস ও অকর্ম্মণ্য ধরণের দশটি গাছও তত ফল দিতে পারে না। ইহা সচরাচর প্রায় সব জাতীয় গাছপালায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই প্রত্যেকটি গাছই যাহাতে বেশ ঝাকালো রকমের হইতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া আগাগোড়া সব কাজ করিতে হইবে এবং ইহারই জন্য চারার ঘনত্ব ভাঙ্গিয়া এক বার সবটা জমিতে ভালরূপ নিড়ানি দিয়া প্রত্যেক চারার গোড়ায় আন্দাজমত মাটি ধরাইয়া দিলেই কাজ এক প্রকার শেষ হইল।

ইহার পর ফল ধরিয়া যখন পাকিতে আরম্ভ করে তখন তিন চারি দিন পর পর তাহা হাতে পাড়িয়া রোদে দিয়া শুকাইয়া বীচি বাহির করিয়া সঞ্চয় করাই কর্ত্তব্য। ফল পাড়িতে শৈথিল্য করিলে তাহা আপনা হইতেই ফুটিয়া বীচি পড়িয়া যায়। সুতরাং এই কাজ খুব মনোযোগের সহিত যথাসময়ে করাই দরকার। মোট

কথা, প্রত্যেক কাজ যত্ন ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে সম্পাদন করাই সাফল্যলাভের প্রধান উপায়।

এরণ্ড বীচির মূল্য কোন কালেই বিশেষ মন্দ হয় না। ইহার উপর এরণ্ডের কাঠেরও একটা মূল্য আছে। ইহাতে লাভ হইবে কিনা তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে বুঝিতে পারা কঠিন নহে। বর্ষার জলে প্লাবিত হয় না, অথচ অকর্ম্মণ্য ধরণের যে-সব জায়গা কোন প্রকার শস্যাদি জন্মাইবার অযোগ্য বিবেচনায় স্থানে স্থানে পতিত রহিয়াছে, তাহা এরণ্ড চাষে নিয়োজিত করিলে একাধারে জায়গার সদ্ব্যবহার ও দেশে বিস্তর অর্থাগমের সুন্দর উপায় হইতে পারে।

চিনা বাদাম

চিনা বাদামের চাষ খুব লাভের কৃষি। ইহার ব্যবহার এতকাল এদেশে ছিল না বলিলেই চলে। ইহাতে তৈল ও খৈল হয় বলিয়াই আমরা জানিতাম। বিগত কয় বৎসর যাবৎ কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে এদেশে ইহা প্রচলিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং সাধারণ লোকেও ইহা খাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মফস্বলের গরীব লোক যাহারা সহরে যায়, তাহাদের জলখাবারের জন্য ইহা একটি প্রধান জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ছেলেমেয়েরাও ইহা খাইতে ভালবাসে। সেজন্য সহরের দোকানদারদিগের পক্ষে ইহার বেচা-কেনা করিবার লোকও যথেষ্ট হইয়াছে।

জমি নির্ব্বাচনঃ—বর্ষাকালে যে সকল স্থান জলপ্লাবিত হয়, সেরূপ জায়গায় ইহা হয়ই না। গ্রামের ভিতর অথবা টানের জমিতে ইহার চাষ করিতে হয়। ইহার চাষ প্রায় বার মাসই করিতে পারা যায়। জমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়াইলে ইহা হয় না। সেজন্য আমার মতে ভাদ্র মাসেই চাষ করা উচিত। কাজেই ইহা করিতে হইলে জমির ভাটি দিকে খাল কাটিয়া জল নিঃসরণের বন্দোবস্ত প্রথমে করিতে হইবে। ঈষৎ ঢালু জমি ইহার চাষের পক্ষে প্রশস্ত। জমি কয়েক বার ভালরূপ

চাষ মৈ দিয়া মাটি খুব চূর্ণ করা দরকার। জমি ভালমত প্রস্তুত হইলে এক হাত অন্তর অন্তর বীজ একটি একটি করিয়া হাতে পুঁতিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে বেড়া দিয়া গরু ছাগল যাহাতে ক্ষেত্রের মধ্যে না ঢুকিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করাই প্রধান কাজ। গরু ছাগল ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকিলে ইহার বড় ক্ষতি করে। তারপর গাছ উঠিয়া চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইলে ও জমিতে ঘাসের প্রভাব দেখা গেলে একবার নিড়ানি দিয়া লওয়া খুব ভাল : কারণ নিড়ানি দেওয়ার সময় প্রত্যেকটি চারার গোড়াও কতক খোঁড়া হয়, কতক মাটিও তখন ধরাইয়া দিতে পারা যায়। সেরূপ হইলে ফসল খুব ভাল হইবে আশা করা যায়। ইহার পর আন্দাজ দেড় মাস গত হইলে গাছ লতাইয়া পুষ্পিত হয়। তখন ক্ষেতের দৃশ্যও অতি মনোহর হয়। ইহার ফুল হইতে একটি লম্বা শিকড়ের মত বাহির হইয়া মাটি-সংলগ্ন হইয়া ইহার নীচে ফল ধরে। ইহা বিধাতার এক আশ্চর্য্য লীলাই বটে।

এই অবস্থায় চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়। তারপর ফসল পাকিলে জমিতে হাত লাঙ্গল টানিলে সঙ্গে সঙ্গে চিনাবাদামগুলি ভাসিয়া উঠে। তখন হাতে এক একটি ফসল সংগ্রহ করিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লইলেই হইল। ফসল ভালরূপ ফলিয়া উঠিলে বিঘা প্রতি সাত আট মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। ইহার মূল্য প্রতি মণ সাত-আট টাকা করিয়া বিক্রয় হয়।

এক বিঘা জমিতে সাত-আট সের বীজ লাগে। বীজ পাইতে অসুবিধা হইলে নিকটবর্ত্তী সরকারী কৃষি বিভাগের ইনস্‌পেক্টরের নিকট পত্র লিখিলেই ভাল বীজ পাওয়া যায়।

কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য

কীটের জন্ম প্রকরণ ঃ—কীটের উপদ্রব ও ইহা দমনের উপায় গ্রন্থারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরো জানিবার বিষয় এই যে, ফসলের ক্ষতিকর কীট কেবল প্রজাপতির পল্‌ নহে। ভোমরা, মাছি

ইত্যাদিরও পলু হয় এবং ইহাদের কতকগুলি ফসল-ধ্বংসকারী। ভোমরা জাতীয় অনেক পোকাও ফসলের ক্ষতি করে। তা'ছাড়া গন্ধী, সবুজ ফড়িং জাতীয় পোকার মধ্যেও ফসলের অনিষ্টকারী অনেকগুলিই আছে। ইহাদের শৈশব ও পূর্ণবয়স্ক অবস্থার মধ্যে শারীরিক গঠনের পার্থক্য খুব বেশী নহে। উল্লেখযোগ্য কথা এই যে ইহাদের পলু হয় না,—ডিম হইতেই নিজের প্রকৃত চেহারা লইয়া বাহির হয়। আলোর ফাঁদ দ্বারা কীট নষ্ট করা বিষয়ে প্রকৃত তথ্য এই যে, কোন কোন পতঙ্গ আলো দ্বারা আকৃষ্ট হইলেও সকল প্রকার কীট আলোর ফাঁদে ধরা দেয় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কীটতত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ও রহস্যজনক বিজ্ঞান। কৃষিজীবীমাত্রেরই অন্ততঃ প্রয়োজনানুরোধে এই বিদ্যার প্রত্যক্ষ চর্চ্চা সম্ভবমত করা উচিত।

মাটির উৎপত্তি ঃ— প্রস্তরময় পর্ব্বত-গাত্রে ফাটল ধরার কারণ—উত্তাপ-বৈষম্য হেতু প্রস্তর উপাদানের সঙ্কোচ ও প্রসার। প্রস্তরের সকল উপাদান উত্তাপ ও শৈত্যের দ্বারা সমভাবে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হয় না, ফলে ইহাদের বিভিন্ন পরিমাণে প্রসার ও সঙ্কোচন হেতু ক্রমশঃ প্রস্তর-অবয়ব যে ঢিলা হইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়।

বহু প্রাচীন যুগে উত্তপ্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ক্রমশঃ শীতল হইয়া সঙ্কুচিত হওয়ায় এবং ভূকম্পন ইত্যাদি নৈসর্গিক কারণেও প্রস্তরময় পর্ব্বত-গাত্রে ফাটলের উৎপত্তি হইয়াছে।

পর্ব্বত-গাত্রে ফাটল ধরার অন্য একটি কারণ—গাছের শিকড়। পুরাতন দালান ও ইমারতে বট গাছের শিকড় প্রবিষ্ট হইয়া কি ভাবে ফাটলের সৃষ্টি করে, তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। প্রস্তরময় পর্ব্বতেও অনুরূপ ব্যাপার অহরহঃ ঘটিতেছে।

নৈসর্গিক কারণে রূপান্তরিত ও কোমলীকৃত প্রস্তরে প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ জন্মায় এবং তাহাদের শিকড়-সমেত ধ্বংসপ্রাপ্ত দেহও ক্রমশঃ প্রস্তরজাত উপাদানের সঙ্গে মিশিতে থাকে। এই ভাবে মাটির উৎপত্তি হয়। মাটির গভীরতা যতই বাড়িতে থাকে, বিভিন্ন

জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইবার পক্ষেও তাহার উপযোগিতা ততই বৃদ্ধি পায়।

সবুজ সারঃ—সবুজ সারের প্রয়োগ বলিতে কাঁচা শস্যকে ক্ষেত্রের মাটির সঙ্গে মিশাইয়া পচাইয়া ফেলাই বুঝায়। শুষ্ক পত্রাদি পচাইলে ঠিক ঠিক সবুজ সারের গুণ পাওয়া যায় না, একথাটি স্মরণ রাখা দরকার।

সবুজ সারের জন্য ধৈঞ্চা, কলাই, শণ, বরবটি ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ফসলের চাষ করা হইয়া থাকে। ইহার প্রধান উপযোগিতা এই যে, ঐ সকল উদ্ভিদের শিকড়ে এক প্রকার বীজাণুর আবির্ভাব ও বৃদ্ধি হয়। ইহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই নাইট্রোজেন ফসলের কাজে লাগে। উপরন্তু গাছগুলি সবুজ অর্থাৎ কাঁচা থাকিতেই ক্ষেত্রে পচাইলে পরবর্ত্তী ফসলের বিশেষ উপকার হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পতিত ও বনভূমির পরিচর্য্যা বা কাষ্ঠ উৎপাদন

কাঠের প্রয়োজন ঃ—মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহের মধ্যে কাঠের প্রয়োজন অতিশয় বিস্তৃত রকমের। ঘর-বাড়ী করিয়া থাকিতে হইলেই কাঠের প্রয়োজন। ঘরের খুঁটী, কড়ি, বড়গা, দরজা, জানালা, খাট, টেবিল ইত্যাদি গৃহ সরঞ্জামের জন্যই প্রধানতঃ কাঠের দরকার হয়। নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণে এবং রেল গাড়ীতে ও লাইনের কাজে প্রতি বৎসর যত কাঠ লাগে ইহার পরিমাণ করিতে পারা দুঃসাধ্য। তা'ছাড়া মাল চালান করিবার বাক্স ও দেশলাই নির্ম্মাণে এবং জ্বালানীর জন্যও কম কাঠ লাগে না। সুতরাং কাঠের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত মানুষের সুখ-স্বচ্ছন্দতার তারতম্য হইবে ইহা অতিশয় স্বাভাবিক।

কাঠ উৎপাদনের প্রয়োজন ঃ— শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঘর-বাড়ীর পারিপাট্য সাধনের স্পৃহা যতই বাড়িতেছে, কাঠের মূল্যও উত্তরোত্তর তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। একারণ অনেক সময় অত্যধিক মূল্য দিয়াও ইচ্ছানুরূপ ভাল কাঠ পাওয়া যায় না। কাঠের দুর্ম্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা নিবন্ধন আজকাল অনেকেই গ্রামের জঙ্গলে আপনা হইতে যে-সব বাজে জাতীয় গাছ গজাইয়া উঠে, সে-সব কাঠই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতেছেন। কাঠের অনেক কাজ লোহা দ্বারা সম্পন্ন করা হইতেছে। তবুও কাঠের মূল্য দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। ইহার কারণ পর্ব্বতজাত কাঠই এতদ্দেশের লোকের কাঠের প্রয়োজন পূরণের একমাত্র উপায় ছিল। তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মানুষের কাঠের প্রয়োজন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে পর্ব্বতগুলি সেভাবে কাঠ যোগাইতে পারিতেছে না। পর্ব্বত-জাত

গাছপালা কমিয়া যাওয়ায় সরকারী বনকর বিভাগ পাহাড়ের স্থানে স্থানে জারুল-গাম্ভার ইত্যাদি দ্রুত বৃদ্ধিশীল অথচ মূল্যবান বৃক্ষাদির চারা রোপণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অনেক স্থানে রেলপথ করিয়া দুর্গম স্থান হইতে কাঠ আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাঠের মাশুলও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবুও বনকর বিভাগের আয় কমিয়া যাইতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এতদ্দ্বারা পাহাড়ের গাছপালা কি পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছে তাহা অনুমান করা যায়।

কাঠের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ,--পাহাড় হইতে গাছ নামাইবার ব্যয়-বৃদ্ধি। আমি ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর কাল কাঠের ব্যবসা করিয়াছি। তদুপলক্ষে আমার শ্রীহট্ট, কাছার জেলা ও স্বাধীন ত্রিপুরার পর্ব্বতসমূহের যে-সব স্থান হইতে কাঠের আমদানী হয় তাহা দেখিবার যে সুযোগ হইয়াছিল তাহা হইতে জানি যে, নদী নালার যে সকল পথ দিয়া পাহাড় হইতে কাঠ নামিয়া আসে, তাহা হইতে কাঠ কাটিবার স্থান ক্রমেই দূরে সরিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঠ নামাইবার ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইতেছে। এইভাবে কাঠ নামাইবার ব্যয় ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকিয়া বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় পাঁচ-সাত গুণ বাড়িয়াছে। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নদী-পথের অতি নিকটে দশ-সনা মহালে অনেক কাঠের জঙ্গল ছিল। সেখানকার কাঠের সরকারী মাশুল দিতে হইত না বলিয়া খাসের লাকড়ি অপেক্ষা অনেক সুলভে পাওয়া যাইত। এখন সে সকল সুযোগ আর নাই বলিলেও চলে।

পর্ব্বত-জাত কাঠের উপরের লিখিত অবস্থা বিবেচনায় অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আমরা কাঠ উৎপাদনে প্রবৃত্ত না হইলে কাঠের দর ক্রমে আরও বাড়িবে এবং সময় সময় তাহা দুষ্প্রাপ্য হইবে। কাঠের অভাবে লোহার দরও বাড়িয়াই যাইবে। দেশময় কাঠ উৎপাদনে মনোনিবেশ করাই ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়। যাহাদের জায়গার সচ্ছলতা আছে, তাহাদের পক্ষে কাঠ উৎপাদন করা

খুব লাভের ব্যবসা। যাঁহারা চিরকাল পর্ব্বত-জাত কাঠের দ্বারাই প্রয়োজন সমাধা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে কাঠ উৎপাদনের কথা নূতন ঠেকিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা লাভের ব্যবসা বলিয়া ঐ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। পশ্চাৎ আমি দেখাইব যে জগতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানকার অধিবাসিগণ কাঠ উৎপাদনে মনোযোগী না হইলে তাহাদের পক্ষে উহা পাওয়া একরূপ অসম্ভব। পক্ষান্তরে-প্রচুর কাঠ উৎপাদন করিয়া নানা দেশের অধিকারীরা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেছে। কেবল আমরাই ঐ জাতীয় শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর অভাববশতঃ সকল বিষয়েই পরমুখাপেক্ষী হইতে গিয়া কেবল দারিদ্র্য বৃদ্ধিরই পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছি।

ভারতবর্ষের মধ্যে আসাম প্রদেশ ও স্বাধীন ত্রিপুরার পর্ব্বত-সমূহে নানাজাতীয় কাঠ অধিক পরিমাণে জন্মায় এবং তদ্দ্বারা ঐসব অঞ্চলের এবং বাংলাদেশেরও কিয়দংশের লোকের কাঠের প্রয়োজন চিরকাল একরূপই সমাধা হইয়া আসিতেছিল। কলিকাতার বাজারে যত কাঠ ও কাঠের জিনিষ বেচা-কেনা হয় তাহা কোথা হইতে আমদানী হয় তাহা মনোযোগ সহকারে দেখিতে গেলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, ইহার মধ্যে হিমালয়-জাত শাল, দেবদারু ও বাহাদুরী, সুন্দরবন-জাত সুন্দরী ও কতিপয় অপকৃষ্ট জাতীয় কাঠ এবং ব্রহ্মদেশ-জাত সেগুন ও দেশী জারুল ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই সুদূর ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিত। যাহারা এই সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তাহারাই বলিতে পারিবেন যে, মালের প্যাকিং বাক্সের কাজে ভারতবর্ষ-জাত কাঠ ব্যবহৃত হয় না বলিলেও চলে। এদেশে যত জাহাজ নির্ম্মাণ হয় ইহার কাঠের কাজের মধ্যে চারি-আনা আন্দাজ সেগুন কাঠের। অবশিষ্ট বার আনাই বিদেশ-জাত কাঠের। আমাদের দেশে প্যাকিং বাক্স বহুকাল ধরিয়া এদেশ জাত কাঠের দ্বারাই তৈরী হইয়া আসিতেছিল। ইহার জন্য স্থানে স্থানে সাহেব

কোম্পানীদের পরিচালিত কয়েকটি কাঠ চিরিবার কল (saw mill) এবং স্থানে স্থানে নদীর ধারে দেশীয়গণ দ্বারা পরিচালিত চা-বাক্স তৈরি করিবার বহুসংখ্যক ছোট বড় কারখানা ছিল। এই কারখানাগুলিতে হাজার হাজার লোকের পরিপোষণের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছিল। বিদেশী বাক্স আমদানী হইতে থাকায় বিগত কতিপয় বৎসরের মধ্যে দেখিতে দেখিতে ঐসব মিল ও দেশীয়গণ পরিচালিত বাক্স তৈরীর কারখানাগুলি লোপ পাইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে পরিচালকদের অন্নও মারা গিয়াছে।

এইরূপ কেন হইল? ভারতবর্ষ-জাত কাঠের অপকৃষ্টতাই কি ইহার কারণ? যদি তাহাই হয় তবে এতদিন তাহা চলিল কি করিয়া? এবং এতদিন পরই বা কেন বিদেশ-জাত কাঠের আমদানী হইল? আমরা জানি এদেশে বাক্সের উপযোগী কাঠের অভাব হইতে থাকায় বাক্স-নির্ম্মাতারা নানারূপ বিশ্রী কাঠের দ্বারাই তাহা প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যার দরুন চা-কর সাহেবগণ অধিক মূল্য দিয়া বিদেশ-জাত বাক্স আমদানী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সকলের চোখের উপর দেশের একটা বৃহৎশিল্প ধ্বংস হইয়া গেল। কাঠ উৎপাদন করিবার প্রথা দেশময় প্রচলিত থাকিলে তাহা হইত না। ইহার প্রমাণ ক্রমে দেওয়া যাইতেছে।

বিহার অঞ্চলের লোকে তাহাদের কাঠের প্রয়োজন কি ভাবে সমাধা করে ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখি যে, তাহারা পাকাবাড়ীর কড়ি ও বড়গার কাজে হিমালয়জাত শাল-বাহাদুরী কাঠ যা-কিছু ব্যবহার করিয়া থাকে। তদ্ব্যতীত তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কাঠ তাহারা নিজেরাই উৎপাদন করিয়া লয়। তাহাদের কাঠের প্রয়োজন আমাদের চেয়েও বেশী।

বোধ হয়, অনেকেরই জানা আছে যে সে-সব অঞ্চলে ছন ও বাঁশ জন্মায় না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সেজন্য তথায় আমাদের অঞ্চলের মত ছন-বাঁশের ঘর দেখিতে পাওয়া যায় না। ছন-বাঁশের

অভাববশতঃ ধনী দরিদ্র সকলকেই খোলার ছাউনির ঘর করিতে বাধ্য করিয়া থাকে। খোলার ঘরের চালাগুলি অত্যন্ত ভারী বলিয়া তাহাতে প্রথমেই কাঠের শক্ত ঠাট করিয়া লওয়া দরকার হয়। যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা ভাল কাঠ ও ভাল কারিগর দ্বারা তাহা সুন্দর করিয়াই করিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত গরীবের পক্ষেও গাছের শক্ত ডালপালা ছোবড়ার দড়ি দিয়া বাঁধিয়া কোন রকমে ঠাট করিয়া লইতে হয়। সর্ব্বসাধারণের এই অনিবার্য্য প্রয়োজন হইতে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে তাহাদের কাঠের প্রয়োজন আমাদের অপেক্ষাও বহু গুণই বেশী ; কাজেই তাহাদের কাঠ উৎপাদনের দিকে মনোনিবেশ না করিয়া উপায় নাই। মধ্য ও সংযুক্ত প্রদেশেও অনুরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার আমাকে কোন প্রয়োজনে বিহার অঞ্চলে প্রায় দুই মাস কাল পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। তখন সে-দেশ জাত কাঠ সম্বন্ধে আমার ধারণা সঞ্চয় করিবার যে সুযোগ হইয়াছিল তাহাই এখন বলিব। আমার গন্তব্যস্থান ছিল বি এন্ ডবলিউ রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ। গাড়ীতে চড়িয়া কতিপয় মাইল অতিক্রম করিবার পর দেখা গেল, রেল রাস্তার দুই ধারে স্থানে স্থানে শিশু ও বাব্‌লাগাছের গভীর জঙ্গল হইয়া রহিয়াছে। তাহা এত ঘন যে, দুপুর বেলায়ও অনেক সময় সূর্য্যের আলো আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। দীর্ঘকাল কাঠের ব্যবসাতে লিপ্ত থাকার ফলে অভ্যাসবশতঃ ঐ সব জঙ্গলের দৃশ্য আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করিল ও তাহা কি করিয়া হইল জানিবারও আকাঙ্ক্ষা হইল। সুযোগ পাইয়া কতিপয় ষ্টেশন-মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, সে-সব গাছপালা রেল-কোম্পানীরই রোপিত। ইহার উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, ঐ কাঠ দ্বারা কোম্পানীর অনেক কাঠের কাজ সমাধা হইয়া থাকে এবং সেই দেশবাসীর সকলকেই কাঠের জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কারণ নিকটে কোন পাহাড়-পর্ব্বত না থাকায় কাঠ পাইতে হইলে অনেক দূর-স্থান

হইতে কাঠ আনয়ন করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।—ইহা সর্ব্ব-সাধারণের পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার অথচ কাঠের প্রয়োজন সকলেরই আছে।

উপরের লিখিত অবস্থা পাঠ করিয়া কাহারও মনে হইতে পারে যে, সে-সব কাঠ ভাল নহে। প্রথমে আমারও সেরূপ ধারণা হইয়াছিল। পরে বিহিত পর্য্যবেক্ষণের পর তাহা মস্ত ভুল বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। সে-দেশ জাত কাঠের মধ্যে শিশু, বাব্‌লা ও খয়রা জাতীয় কাঠের বিশেষ প্রাধান্য রহিয়াছে। ইহাদের তুল্য শক্ত ও সুন্দর কাঠ সচরাচর দৃষ্ট হয় না। উল্লিখিত কাঠসমূহের মধ্যে শিশু কাঠকেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মনে হইয়াছিল। সেখানে সুন্দর ঘর দরজা খাট টেবিল আলমারী ইত্যাদি যাহা চোখে পড়িয়াছিল, সবই শিশু কাঠের দ্বারা নির্ম্মিত। বড় বড় নৌকার কাজেও শিশু কাঠই অধিক ব্যবহৃত হয়। সে অঞ্চলবাসীরা শিশু কাঠকে সেগুন কাঠ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করে। সেখানকার কাঠ আমাদের অঞ্চল অপেক্ষা সস্তা। দশ-বার ঘন ফুট একটা শিশু কাঠের গুঁড়ির মূল্য দশ-বার টাকার মত এবং ঐ মূল্যে রীতিমত বেচা-কেনা হইয়া থাকে। খয়রা কাঠও অত্যন্ত শক্ত। তাহা ঘরের খুঁটির কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়। বাব্‌লা কাঠও শক্ত বটে, কিন্তু ইহার গুঁড়ি অধিক লম্বা হয় না বলিয়া গাড়ীর চাকার কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়। আমি সে-স্থানের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম যে, তাহারা কাঠ উৎপাদন করাটাকে সমূহ লাভের কাজ বলিয়া মনে করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের প্রায় সকলেরই জমির অভাব বলিয়া পথের দুই ধারে যা-কিছু রোপণ করিয়া থাকে। এ-সব দৃশ্য দেখিতে গিয়া আমার অনেক বারই মনে হইয়াছে যে, আসাম উত্তরবঙ্গ ও ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্থানে স্থানে যে-সব পতিত ভূমি রহিয়াছে তাহা তাহাদের হাতে পড়িলে তাহাতে কাঠ উৎপাদন করিয়া তাহারা প্রভূত উপার্জ্জন করিতে পারিত। যাহা হউক, ভারতবর্ষের

একটি মাত্র প্রদেশের কাঠ উৎপাদনের কথা লিখিলাম। অন্যান্য প্রদেশের লোক যাহাদের নিকটে পর্ব্বত নাই, সে-সব জায়গার লোকও কোন না কোন ব্যবহারোপযোগী ভাল কাঠ প্রয়োজনের খাতিরে উৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ কাঠের প্রয়োজন এড়াইবার অন্য কোন উপায় নাই।

কাঠের জন্য প্রসিদ্ধ দেশসমূহে কাঠ উৎপাদনের ব্যবস্থা কিরূপ, তাহাও এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে অনুধাবনযোগ্য। ইউরোপের অন্তর্গত ফিন্‌ল্যাণ্ড, রাশিয়া ও সুইডেনে প্রচুর কাঠ উৎপন্ন হয়। ফিন্‌ল্যাণ্ডের তিন-চতুর্থাংশ স্থলভূমি আঁয়কর বনে আবৃত। সুইডেনেরও অর্দ্ধেকেরও অধিক অংশ বনভূমি। রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ ভূমি বনাচ্ছন্ন। আয়কর কাষ্ঠদানকারী বৃক্ষের পরিচর্য্যা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের আয়ের ও দেশের সমৃদ্ধির সহায়তা কতখানি হইতে পারে, এ বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ সুইডেনের বন-পরিচর্য্যার সামান্য বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

কাঠ উৎপাদন ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যাদি (যেমন কাগজ) সুইডেনের গবর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। বনভূমির শতকরা ১৫°৮ ভাগ সরকারী খাস-মহালের অন্তর্গত, ৫°৮ ভাগ দেবোত্তর অর্থাৎ চার্চ্চের ও বড় বড় শহরের এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং ২৮°১ ভাগ বড় বড় লিমিটেড কোম্পানীদ্বারা চালিত হয়। কিন্তু ৪৫°২ ভাগ—বৃহত্তর আয়কর বনভূমি স্বল্পভূম্যধিকারীদের সম্পত্তি এবং মাত্র ৫°১ ভাগ বড় বড় ভূম্যধিকারীদের খামারের অন্তর্গত। ছোট বড় সকল ভূম্যধিকারীরই বনভূমি যাহাতে গবর্ণমেণ্ট-চালিত বনভূমির ন্যায় উত্তম পরিচর্য্যা পাইতে পারে, সেই জন্য আইনের বিধান রহিয়াছে, যাহার ফলে বনভূমির মালিকগণ সাময়িক লাভের মোহে যথেচ্ছভাবে বন ধ্বংস করিতে পারে না। উপরন্তু বনভূমির পরিচর্য্যা দ্বারা সেই দেশের কৃষকগণ নিজেদের আয়ের উৎসকে পুষ্ট

রাখে। এখানকার কৃষকদের অর্থনৈতিক জীবনে শস্যাদি উৎপাদন ও কাষ্ঠ উৎপাদন এই দুইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সুসঙ্গতরূপে স্থাপিত হইয়াছে।*

বনভূমির পরিচর্য্যা ও কাষ্ঠ উৎপাদন সম্বন্ধে ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিও নিতান্ত সচেতন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাল্‌টিক স্টেট্‌ লাটভিয়ার বন-পরিচর্য্যার কথা উল্লেখ করা যায়।† এস্থলে বিশেষ ভাবে বুঝিবার কথা এই যে, শীতপ্রধান দেশবাসী আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান

* "It is quite true that trade statistics show that some hundreds of thousands of workers gain a direct livelihood from forestry and the industries associated with forestry. Yet, however, imposing these figures may be, they, nevertheless, by no means afford a true idea of the significant part played by forestry in the national economy. In fact, in the whole of northern and central Sweden forest work, even for the agricultural population, is generally a means of support without which they would not be able to earn a living wage. * * This collaboration between forestry and agriculture is of special advantage for the reason that forestry work is on the whole carried out at seasons when but little work can be done in the way of agriculture. Besides, the produce of the forest, that is to say, the timber, is in itself one of the most vital necessities in the country. Mention need only be made in this connection of the consumption of timber for building purposes, for fuel, furniture and household articles, railways, telegraph and telephone poles power-transmission poles, newspapers and books—even the so-called "made from woodfree" printing paper is wood-pulp—or the importance of timber for industries apart from the wood-goods industries proper, as for instance the charcoal and iron industries. * * * * The timber industry is responsible for nearly half the entire income that Sweden's exports to foreign countries have yielded since the latter half of the 19th century. Moreover the importance of forest products as a factor in the country's trade balance and general economic position has survived the War undiminished, or rather, it is more apparent than ever. Thus, if we turn to the official statistics covering the last available five-year period, *i.e.*, 1923-1927, we find that the value of the total sales to abroad has amounted on an average to 1 milliard 360 million Kronor per annum, of which wood-goods, paper-pulp and paper comprise nearly half of all the combined sales, or, to be exact, 49 per cent. That is to say an annual export value of products from the forests amounting to 667 million Kronor (about £37,000,000 $180,000,000) "—*Sweden Of To-day.*

† "A very important economic branch, closely allied to agriculture, is forestry. The forests comprise 29 per cent. of the entire territory of Latvia *i.e.*, 1,780,380 hectares—the greater part of which, *viz.*, 78·3 per cent are pine woods. With the exception of about one-sixth which remained in private hands or in possession of municipalities, all the forests belong to the State. With a view to ensuring rational exploitation, the private forests are also under State control and may be cut only with the State's permission. To the ministry of agriculture is attached the Forest Department which supervises the activity of 85 main forestries through the medium of its inspectors * * * It is true that during the Great War (1914-18) and the period of German occupation the forests were wantonly cut (190,000 hectares). But the Government of Latvia has managed already to re-afforest about 100,000 hectares. * * * The State derives 8 to 10 million lats yearly from the sale of timber."—*Latvia.*

দেশবাসীর ন্যায় প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর না করিয়া বরং প্রকৃতির সহায়তা লইয়া—এক দিকে যেমন কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্যাদির ব্যবসা করিয়া আপনাপন দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে, তেমনি অপর পক্ষে প্রতিবৎসর কাষ্ঠদানকারী বৃক্ষাদির চাষ করিয়া বনভূমির উৎপাদন হারের সমতা রক্ষা করিতেছে। তাহা না করিলে বনভূমি হইতে যে আয় হয়, তাহা নিরবচ্ছিন্ন হইত না। দুঃখের বিষয়, কাষ্ঠ উৎপাদনের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে এসকল দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের বন ও পতিত ভূমির পরিচর্য্যা বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন।

লাভজনক কয়টি কাঠের খবর

কাঠ উৎপাদন করা লাভের ব্যবসা এবং তাহা করিবার বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহাই এতক্ষণ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখন, বাংলা ও আসাম প্রদেশে কোন্ কোন জাতীয় গাছ সহজে অধিক উৎপন্ন হইয়া অধিবাসীদের লাভজনক হইতে পারে, তাহা আমার কাঠের ব্যবসাকালের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যাইতেছে। আমরা জানি, এ কথা বলিতে গেলে অনেকেই বলিবেন যে, পর্ব্বতজাত কাঠের ন্যায় পল্লীগ্রামে জাত কাঠগুলি তেমন শক্ত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ইহার উত্তরে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কাঠের প্রয়োজন ও মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামে জাত কদম, পিত্তিশূল, বাদরং, ছাতিম ইত্যাদি নিতান্ত অপকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ পর্য্যন্ত ঘর দরজার কাজে যখন লোকে ব্যবহার করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তখন ঐ কথা বলার কোন সার্থকতা নাই। যখন পনর-কুড়ি বৎসর বয়সের একটা কদম গাছ চারি-পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে দেখা যায়, তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, যদি এক বিঘা জমিতে কেবল কদম গাছের চারাই উপযুক্ত দূরত্ব রাখিয়া রোপণ করা হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশটা গাছ অনায়াসেই হইতে

পারে এবং তাহা হইতে উক্ত এক বিঘা জমির কুড়ি বৎসরের আয় দুই শত টাকায় দাঁড়াইবে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হয় যে, ঐ স্থানে মাটির উপযোগী কোন ভাল জাতীয় গাছ রোপিত হইলে ইহার গুণানুসারে আয় পাঁচ গুণ সাত গুণ হওয়া একটুও বিচিত্র নয়। এই স্থানে বলা আবশ্যক, নানা জাতীয় কাঠের উৎপাদন পদ্ধতি লিখিতে হইলে বৃহৎ একখানা পুস্তক লিখিবার দরকার। আমি কেবল কাঠ উৎপাদন করা যে লাভের কাজ; তাহাতে দেশ-বাসীর প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্যই এ অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছি। সকলেই নিজ নিজ স্থানের অবস্থা বুঝিয়া ভাল বৃক্ষাদি রোপণ করিলে বিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন ইহাই আমার প্রধান বক্তব্য।

জারুল গাছ

পূর্ব্ববঙ্গে যত কাঠ উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে জারুল কাঠের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অথচ ইহার জন্য যত্ন লইবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। ইহার গাছ দ্রুত বৃদ্ধিশীল। এতদঞ্চলে নৌকার কাজেই ইহার আদর বেশী। পূর্ব্বে এ অঞ্চলে জারুল কাঠ পাকা বাড়ীর কড়ি ও বর্‌গার কাজে বিস্তর ব্যবহৃত হইত। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা আমাদের একটা পাকা বাড়ীর ছাদে জারুলের বর্‌গা ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহা এখনও অক্ষত রহিয়াছে। আসামের সরকারী বনকর বিভাগের মতে ইহা প্রথম শ্রেণীর কাঠ। ইহার গাছ সাধারণতঃ সমতল অথচ রসাল জমিতে অধিক বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। পাহাড় হইতে যে-সব জারুল গাছ আমদানী হয়, তাহাও পাহাড়ের মাঝে মাঝে অবস্থিত নিম্ন ভূমিসমূহেই অধিক ভাবে জন্মায়। জারুল গাছের প্রকৃতি এই যে, কোন জায়গায় দুই-একটা গাছ হইয়া উঠিলে তাহা হইতে বীচি পড়িয়া আশেপাশে চারা হইয়া থাকে। এইভাবে কতিপয় বৎসর যাইতে

না যাইতে ঐ স্থান ক্রমে গভীর জঙ্গলে পরিণত হয় এবং এই জঙ্গল ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিয়া থাকে। ঐ স্থান কোন সময় জল-প্লাবিত হইলেও গাছগুলি নির্ব্বিবাদে বাঁচিয়া থাকে। এই ভাবে জাত ছোট-খাট রকমের জারুল বন শ্রীহট্ট জেলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় এবং ঐসব গাছ রীতিমত বেচা-কেনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে ইহার কয়টি বিবরণ লেখা যাইতেছে।

১। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সুঘর নিবাসী কালী কুমার মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীর সংলগ্ন অনুমান পাঁচ-সাত কাঠা স্থান জুড়িয়া ছোটখাট রকমের একটা জারুল বন আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহা থাকাতে উক্ত মজুমদার মহাশয়ের কাঠ ও খুঁটির জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না এবং তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই পাঁচ-সাতটা গাছ বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ পাইয়া থাকেন। অথচ আজ পঞ্চাশ বৎসরের উর্দ্ধ কাল হইল, যেমন বন তেমনই রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা তাঁহার কি পর্য্যন্ত লাভ হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বুঝা একটুও কঠিন নহে।

২। জেলা শ্রীহট্ট পাইলগাঁয়ের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়দের জমিদারীর মধ্যে মারকুলি ষ্টেশনের উপর ভীমসেনা নদীর তীরে অনুমান দশ-বার বিঘা স্থান ব্যাপিয়া একটা জারুল বন রহিয়াছে। ইহাও স্বভাবজাত। উক্ত জমিদার মহাশয়দের বড় অবস্থা বলিয়াই বোধ হয় ইহার কাঠ বিক্রীর কল্পনাও তাঁহারা করেন না। কিন্তু শুনিয়াছি এখান হইতে বিস্তর কাঠ তাঁহারা সময় সময় নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৩। জেলা শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জ মহকুমার-এলাকাধীন রাজনগর গ্রাম-নিবাসী অন্যতম জমিদার শ্রীযুক্ত হরকুমার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর সংলগ্ন চারি হাল স্থান ব্যাপিয়া একটা জারুল বন রহিয়াছে। এই বন হইতে গাছ বেচিয়া তিনি তের-চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছেন। অথচ যেমন বন তেমনই রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত

মহিমচন্দ্র আচার্য্য নামক একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ তিন বৎসরের জন্য ঐ বন পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে ইজারা নিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন লিখিয়া তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"৪০।৫০ বৎসর যাবৎ জারুল বন হইয়াছে। অনুমান ৪ হাল জায়গাতে গাছ আছে। ইহা কেহ রোপণ করে নাই। গাছের বীচি পড়িয়া আপনা আপনিই ঐ সকল গাছ হইয়াছে। দেড় হাত বেড় পর্য্যন্ত গাছ রাখিয়া ৫০০০৲ টাকা গাছের মূল্য ধরিয়া ইহার বড় গাছ সমুদয় তিন বৎসরের মধ্যে কাটিয়া আনার সর্ত্তে দিয়াছিলাম। আমাদের কাটার পর যে-সব গাছ ছিল বর্ত্তমানে তাহা কতক বড় হইয়াছে এবং বীচি পড়িয়া আরও নূতন গাছ অনেক হইয়াছে। আমরা ৬।৭ বৎসর পূর্ব্বে কাজ সারিয়াছি। তখন প্রায় ৬০০০।৭০০০ গাছ বাগানে ছিল।"

এইরূপ জারুল বন শ্রীহট্ট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন স্থানে আমরা বহুসংখ্যক দেখিয়াছি, যার কাঠ বেচিয়া মালিকান বিশেষ লাভবান হইতেছেন। বাহুল্য হইবে ভাবিয়া তাহা বিশেষ লেখা হইল না।

উল্লিখিত জারুল বনসমূহ মনুষ্য-রোপিত নহে। জলপ্লাবনের সময় পাহাড় হইতে যে-সব জারুলের পরিপক্ক বীজ ভাসিয়া আসে, ইহার দুই-একটা বীজ কোন স্থানে আটকাইয়া গেলে তাহা হইতে যে গাছ হয়, তাহাদের বীচি পড়িয়া গাছের সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া থাকে। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল গাছের দূরত্বের কোন নিয়ম থাকে না এবং স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক ঘন হইয়া পড়ে। ফলে অনেক গাছই আঁকাবাঁকা ও কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং গাছের বৃদ্ধিশীলতার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, চারা উঠিবার পর প্রতিবৎসরই এক বার তদারক করতঃ চারার দূরত্বের একটা নিয়ম করিয়া সতেজ চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল ও আঁকাবাঁকা

চারাগুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলে যাহা থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধিশীল ও অধিক মূল্যের হইতে পারে, কিন্তু তাহা কেহই করে না। তাই বলিয়া ঐ সকল গাছ অন্যান্য ফল-বৃক্ষের ন্যায় অধিক দূরে দূরে থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ যে সকল গাছ হইতে আমরা ভাল কাঠ পাইতে ইচ্ছা করি, তাহাদের গুঁড়ি সোজা ও লম্বা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গাছগুলি অধিক দূরে দূরে হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে লম্বা অধিক না হইয়া অনেক ডালপালা সমন্বিত ও ছত্রাকার হইয়া পড়ে। সকল জাতীয় গাছ সম্বন্ধেই এরূপ বুঝিতে হইবে। জারুলের বীজ যে কোন উপায়ে আসিয়া এক স্থানে লাগিলেই গাছ হয় ও তাহাই ক্রমে গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। এখানে যাহা বলা হইয়াছে তদ্দারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, পরিপক্ক জারুল বীজ সংগ্রহপূর্ব্বক যার যার ইপ্সিত স্থানে রোপণ করিলে গাছ হইতে পারিবে ও মাঝে মাঝে তদন্ত করিয়া চারার অস্বাভাবিক ঘনত্ব দূর করিয়া দিলে লাভের পথ অধিকতর সুগম হইতে পারিবে।

হিজল

বন ও কাঠ হিসাবে হিজল অতি নগণ্য। কিন্তু ইহা লাভের জিনিস। ইহা বিনাপরিশ্রমে জন্মে। হিজল গাছ প্রায় কেহই রোপণ করে না। জারুল গাছের মত এক গাছ হইতে বীজ পড়িয়া বা ডালপালা হইতে ফুটিয়া উঠিয়া গাছ হয় ও পুরুষ-পরম্পরায় অসংখ্য গাছ হইয়া ক্রমে গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়। নিম্ন ও সমতল ভূমিতেই ইহার গাছ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এ গাছ বর্ষার প্লাবন সময়ে কয়মাস জলমগ্ন হইয়া থাকিলেও মরে না কিংবা কোনরূপ বিকৃত হয় না,—যেন জলজ উদ্ভিদ।

জলের পাকা কূয়া করিতে গাঁথনির তলায় প্রথমেই একটা কাঠের চাকা লাগে, ইহা অনেকেরই ধারণায় আছে মনে করি। ঐ চাকার কাজে হিজল কাঠের চাকা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। কারণ উহা

শক্ত ;—জল ও মাটির নীচে ইহা সুদীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে হিজল বীজের বহুল ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতদ্দ্বারা ঐ কাঠের ব্যবহার-বাহুল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরন্তু জ্বালানি কাঠের জন্য ইহা সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইট পুড়াইবার কাজে সর্ব্বত্রই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা করিতে হইলে দুই-তিন মাস পূর্ব্বে তাহা কাটিয়া রোদে ফেলিয়া রাখিতে হয়। ভাঁটি-অঞ্চলের মৎস্য-শিকারীরা ইহার কাঁচা ডাল কাটিয়া খিলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ ধরিয়া থাকে। সেজন্য ইহা তাঁহাদের নিকট খুব আদরের জিনিস। এই জন্য যাঁহাদের হিজল গাছ আছে, তাহারা জেলেদের নিকট ইহার ডালপালা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভ করিয়া থাকেন।

সুন্দরবন-কাছাড় লাইনের ষ্টীমার ষ্টেশনগুলির মধ্যে মাদ্‌না নামক একটি ষ্টেশন আছে। ইহার কয় মাইল উত্তরে দিল্লী নামক স্থানে বৈষ্ণবদের একটি আখড়া আছে। উহার চতুর্দ্দিকে দুই মাইল সমচতুষ্কোণ স্থান ব্যাপিয়া একটা বৃহৎ হিজল বন আছে। উক্ত আখড়াওয়ালাই ইহার মালিক। তাঁহারা প্রতি বৎসরই জেলেদের নিকট ইহার কাঁচা ডাল বিক্রয় করিয়া অল্পাধিক এক হাজার টাকা করিয়া পাইয়া থাকেন।

শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে কাহারও কাহারও এই প্রকার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হিজল বন আছে। তাহারা সকলেই এই প্রকারে অর্থ লাভ করিয়া থাকেন। এমন কি যাঁহাদের দুই-চারিটা গাছও আছে, তাহারাও সেই অনুপাতে কিছু অর্থ পাইয়া থাকে। এ সকল অবস্থা দেখিয়া হিজল বন থাকা যে খুব বাঞ্ছনীয় একথা কাহার না মনে হয়?

* * *

পশ্চিম বঙ্গেরও স্থানে স্থানে বহু অনাবাদী জমি নিষ্ফলা হইয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ সকল পতিত ভূমি গাছপালার অভাবে বৃষ্টির জলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া স্থান বিশেষে খোয়াইয়ে পরিণত হইতেছে।

তথায় জল-নিঃসরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রণালীবদ্ধ ভাবে শাল, জাম, সেগুণ প্রভৃতি—যে স্থানে যে গাছ সহজে জন্মিয়া বড় হয়,—রোপণ করিয়া বনের সৃষ্টি করিলে খোয়াই বৃদ্ধি পাইতে পারে না। উপরন্তু মালিকানের আয়ের পথ হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বর্ত্তমানে কাঠের অভাব সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। সেজন্য যাহাদের জায়গার সচ্ছলতা আছে তাহাদের পক্ষে স্থানের অবস্থা উপযোগী বৃক্ষাদি রোপণ যে অত্যন্ত লাভের বিষয় তাহা দেখানই এই অধ্যায় অবতারণার প্রধান উদ্দেশ্য। পার্ব্বত্য অঞ্চলে পতিত ভূমি এই কাজে লাগাইলে তাহাতে বিশেষ লাভ হইবার কথা। আমরা জানি, দশ সনা মহালের অনেক স্থানে যথেষ্ট কাঠ হইত, যাহা কাটিয়া শেষ করা হইয়াছে। এখন সে সকল স্থানে পুনরায় জারুল, গম্ভীর, গন্দ্রই ইত্যাদি ভাল কাঠের চারাগাছ লাগাইলে সময়ে ঐ সকলের মালিকান লাভবান হইতে পারিবেন। পল্লীগ্রামে অনেক জাতীয় গাছ হয়; সেই সকলেরও অস্বাভাবিক ঘনত্ব দূর করা ও প্রয়োজনীয় পরিচর্য্যার বিশেষ আবশ্যক। সে-সব গাছ রীতিমত পরিচর্য্যা পাইলে শীঘ্র কাজের উপযুক্ত হইতে পারে। পল্লীগ্রামে হাতে ধরিয়া গাছ লাগাইতে হইলে কাঁঠাল, নিম ও রঙ্গী এই তিন জাতীয় গাছ লাগান যাইতে পারে। কাঁঠাল কাঠের গুণাগুণ সম্বন্ধে এ স্থানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, কাঁঠাল কাঠের শতাধিক বর্ষের পূর্ব্বের তৈরী সিন্দুক আলমারী ইত্যাদি মূল্যবান্ জিনিস স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম কাঠও সুন্দর ও দীর্ঘকালস্থায়ী; অঞ্চলবিশেষে ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। ইহার কাঠে প্রস্তুত ঢোল, মৃদঙ্গ, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বিশেষ গুণ অনেকেরই জানা আছে। দুঃখের বিষয়, ইহা সহজে পাওয়া যায় না। এখন পল্লীগ্রামজাত কাঠের মধ্যে রঙ্গী ও পার্ব্বত্য অঞ্চলে উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত সেগুন সম্বন্ধে লিখিয়াই এই অধ্যায় শেষ করিব।

* * * *

রঙ্গী গাছ

পল্লীগ্রামে যে-সকল গাছ আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে রঙ্গীকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভজনক মনে করি। সে-জন্য ইহার জন্মাইবার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। ইহার কাঠ দেখিতে সুন্দর, টেকসই এবং গাছগুলি খুব দ্রুত বৃদ্ধিশীল হইয়া থাকে। স্থানভেদে ইহার অনেক নামান্তর থাকিতে পারে। এদেশে পর্ব্বত-জাত যে রঙ্গী-কাঠ আসিয়া থাকে ইহাকে সুরুজভেদও বলা হয়। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থাদিতে ইহাকে পদ্মকাষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং তাহা পাচনা-দিতে ব্যবহৃত হয়। এই কাঠে অতিশয় সুগন্ধ আছে। ইহার কাঠ লাল বলিয়াই বোধ হয় রঙ্গী নাম ধারণ করিয়াছে। ইহা ওজনে হালকা ও খুব পালিশ হয় বলিয়া সেতার, তানপুরা, এস্রাজ ইত্যাদি বাদ্য-যন্ত্রের কাজে এবং পাল্কি ও ডিঙ্গি নৌকার কাজে অধিক ব্যবহৃত হয়।

আসাম প্রদেশ ও স্বাধীন ত্রিপুরার পর্ব্বতসমূহে এই কাঠ অধিক জন্মে ও সেই অঞ্চলের পল্লীগ্রামসমূহেও ইহার গাছ ঘন ঘন দেখিতে পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে জাত ইহার একটি বিশ পঁচিশ বৎসর বয়সের ভাল গাছ কুড়ি-পঁচিশ টাকায় সময় সময় বিক্রয় হইতে দেখা যায়। ঐ সকল অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, এক বিঘা ভাল জমিতে ইহার গাছ যত্নপূর্ব্বক রোপিত হইলে কুড়ি-পঁচিশ বৎসরে ইহার আয় খুব কম পক্ষেও চারি-পাঁচ শত টাকা হইতে পারে। বলা বাহুল্য, সেরূপ আয় করিতে হইলে একটু যত্ন লওয়াও প্রয়োজন। যত্ন করিতে বলায় কাহারো কাহারো মনে হইতে পারে যে, আম কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বাগান করিতে হইলে যেমন এক স্থানে চারা করিয়া পরে বাগানে লইয়া গিয়া যথাস্থানে চারা বসাইতে হয় ও সময় সময় বাগানে কোদালি করিতে হয় সেরূপ করিতে হইবে, সুতরাং বিস্তর ব্যয় হইবারও কথা। বস্তুতঃ ইহাতে সেরূপ কিছু করিতে হয় না। কারণ স্বভাবজাত গাছ-পালার পরিচর্য্যা স্বয়ং বিশ্ব-জননীই করিয়া

থাকেন, ইহা পর্ব্বতজাত গাছপালার প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বনজাত বৃক্ষাদির বীজ মাটিতে পড়িলে চারাগুলি বিনা যত্নে যেরূপ দ্রুত বাড়িয়া উঠে, আম, লিচু ইত্যাদির গাছগুলিকে আমরা বিস্তর যত্ন করিয়াও সেরূপ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে স্বভাবজাত বৃক্ষাদির বীজ সরস জমিতে পড়িলে চারাগুলি যেরূপ সোজা হইয়া উঠে ও গুঁড়িটা যেরূপ লম্বা হয়, ইহাদের চারা তুলিয়া রোপণ করিলে গুঁড়ির কাঠ সেরূপ লম্বা ও সোজা হয় না, ইহা আমরা উক্ত রঙ্গী, জারুল, নাগেশ্বর প্রভৃতি কয়টি কাঠ সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি। এতদ্দ্বারা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, সব জাতীয় গাছপালা বংশপরম্পরায় মনুষ্য-সেবিত হইতে থাকিয়া ইহাদের ফলের স্বাদ, সৌন্দর্য্য ও গন্ধের ক্রমে উন্নতি হইয়াছে। ইহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব-জাত গাছপালার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের হওয়াই স্বাভাবিক।

রঙ্গী বীজ চৈত্র মাসে পাকে। বীজগুলি অত্যন্ত হাল্‌কা বলিয়া প্রবল বাতাসে ইহা অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। এজন্য যে স্থানে রঙ্গী গাছ নাই এমন সব স্থানেও ইহার অসংখ্য চারা হইতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে যে-সব চারা সরস ও হালের দ্বারা কর্ষিত জমির উপর উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে নিরাপদে বাড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে সম্বৎসর যাইতে না যাইতে আট-দশ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া পড়ে। এ সকল অবস্থা যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিয়াছেন তাহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, মাঘ ফাল্গুন মাসে জমি যথারীতি কর্ষণ করিয়া কতকগুলি রঙ্গী বীজ ছড়াইয়া দিয়া পুনরায় আর এক বার চাষ ও মৈ দিয়া রাখিলে ও চারা উঠিবার পর সম্বৎসর কাল ঐ স্থানে গবাদি প্রবেশ না করিবার ব্যবস্থা হইলে কাজ এক প্রকার হইয়া যায়। তারপর যখন দেখা যাইবে যে, জমির সর্ব্বত্র চারা উঠিয়া পাঁচ-সাত ইঞ্চি লম্বা হইয়াছে, তখন একবার সমস্ত ক্ষেতই নিড়াইয়া দেওয়া ভাল। ঐরূপ করিলে তিন-চারি মাস যাইতে না যাইতেই চারাগুলি এক ফুট আন্দাজ লম্বা হইয়া যাইবে। তখন পুনরায় আর এক বার উত্তমরূপে

নিড়ানি দিয়া ঘনত্ব ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, যেন তিন চারি ফুটের মধ্যে একটির অধিক চারা না থাকিতে পারে। এই ভাবে সম্বৎসর গেলে যখন দেখা যাইবে, চারাগুলি আট-দশ ফুট লম্বা হইয়াছে তখন আর একবার পাতলা করিয়া দেওয়া দরকার। তখন কেবল সোজা ও লম্বা চারাগুলি রাখিয়া দুর্ব্বল ও আঁকা-বাঁকা চারাগুলি উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই সব অকর্ম্মণ্য গাছ অনায়াসেই লাকড়ি বা জ্বালানি কাষ্ঠ হইতে পারে। এই ভাবে দুর্ব্বল ও রুগ্ন প্রকৃতির চারাগুলি উঠাইয়া যাহাতে বিঘা প্রতি শেষ পর্য্যন্ত সত্তর আশীটি গাছ থাকে তাহা করিতে হইবে। এরূপ সযত্নে রোপিত রঙ্গী গাছের মূল্য কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পর চারি পাঁচ শত টাকার কম হইবে না।

সেগুন

সেগুন কাঠ রূপে গুণে উৎকৃষ্ট। সেজন্য ইহার আদর পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র। বড় বড় সহরে গেলে দেখা যায়—চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমারী ও ঘরের দরজা জানালা ইত্যাদি সবই সেগুন কাঠের। জাহাজ ও রেলগাড়ীর অবস্থাও তাহাই। সেগুন কাঠের ব্যবহার যেমন অত্যধিক, তেমনই দুর্ম্মূল্য। এ সকল অবস্থা দেখিয়া তাহা কোন্ স্থানে জন্মায় তাহা জানিতে স্বতঃই মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। ভূগোল পাঠে জানা যায়, ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্য-প্রদেশ, নাসিক, মহীশূর রাজ্য ও ব্রহ্মদেশেই সেগুন কাঠ অধিক জন্মে। ডাইরেক্টরী পাঠ করিয়া জানা যায়, ব্রহ্মদেশে সাহেবদের পরিচালিত বড় বড় কয়টা লিমিটেড কোম্পানী রহিয়াছে যাঁহারা এই সেগুন কাঠ পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি করিয়া বিস্তর লাভ করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মদেশের বনজ সম্পদ কত বড় ইহার একটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। ঐরূপ মূল্যবান্ কাঠ আমাদের দেশে জন্মাইতে পারিলে ধনাগমের একটা পথ হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে দেশের টাকা বিদেশে যাহা যাইতেছে সেপথও রুদ্ধ হইবে। দেশের দারুণ

অর্থ-সঙ্কট সমস্যা সমাধান করিবার জন্য এবিষয়ে চিন্তা করা আদৌ অসঙ্গত নহে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেগুন কাঠ আসাম ও বাংলা দেশে জন্মে না, ইহাই দেশের প্রায় সকল লোকের ধারণা। ঐরূপ ধারণা পোষণ করিবার প্রধান কারণ এই যে, দেশে তজ্জাতীয় শিক্ষা ও আদর্শের অত্যন্ত অভাব। এই কারণেই আমরা একমাত্র চাকুরী করা ব্যতীত জীবিকার্জ্জনের অন্য উপায় খুঁজিয়া পাই না। যাহা হউক, ঐরূপ ধারণা পোষণ করা যে অতিশয় ভ্রমাত্মক, তাহাই এখন দেখাইব।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গৌহাটী সহরের মধ্যে রাস্তার দুই ধারে আন্দাজ চল্লিশটি সেগুন গাছ দেখিয়াছিলাম। উহাদের গুঁড়ির বেড় তখন আনুমানিক তিন-চারি ফুটের মধ্যে ছিল এবং বয়স কুড়ি-একুশ বৎসরের মত হইয়াছিল। গাছগুলিকেও তখন সুস্থকায় মনে হইয়াছিল। আজ চার-পাঁচ বৎসর হইল, ঐ সমস্ত গাছ হাতে-কলমে জরিপ করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহাদের কোন কোনটার বেড় দশ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছে, আর কোনটারই বেড় সাত ফুটের কম নহে। উক্ত গাছসমূহ সরকারী জায়গায় ও সরকারী লোকের দ্বারাই রোপিত ও প্রতিপালিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাহা কোন্ সময়ে রোপণ করা হইয়াছিল তাহার কোন ইতিবৃত্ত সেখানকার অফিসসমূহে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই।

কুমিল্লা সহরেও রাস্তার দুই ধারে স্থানে স্থানে অনেকগুলি সেগুন ও শালগাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের বয়স ও স্বাস্থ্য তুল্য রকমের মনে হয়। ইহাদেরও রোপণকাল জানিবার কোন উপায় নাই।

গৌরীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের ছাতকের কাছারী-বাড়ীতে ও ইহার আশেপাশে ছোট বড় শতাধিক সেগুন গাছ আছে। ইহাদের মধ্যে বড় গাছগুলির

বয়স, স্বাস্থ্য ও পরিধি প্রায় একই রকমের হইবে মনে হয়। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের অধীনে ছাতকের জমিদারী আসিবার পূর্ব্বে উহা হ্যারি সাহেব নামক জনৈক ইংরেজ ভদ্রলোকের হাতে ছিল। তিনিই ঐ সকল গাছ প্রথম রোপণ করাইয়াছিলেন। পরে ইহাদের বীজ পড়িয়া আরও নূতন গাছ হইয়াছে। পুরাতন কয়টা গাছ কাটাইয়া কাছারী-বাড়ী ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হইয়াছে।

সাধারণের ধারণা, আমাদের দেশে সেগুন কাঠ হয় না। এ ধারণা অতিশয় ভুল তাহা বুঝা যাইতেছে। আমরা পরীক্ষার জন্য ক্রমাগত দুই-তিন বৎসর সেগুন বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া ও কয়টা চারা প্রতিপালন করিয়া এ সম্বন্ধে অধিকতর নিঃসংশয় হইয়াছি। উক্ত পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, সেগুনগাছ অতিশয় কষ্টসহিষ্ণু এবং অত্যন্ত বর্দ্ধিষ্ণু। সেগুন বীজের আবরণটা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অঙ্কুরিত হইতে অনেক সময় লাগিয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক বীজ উই ও পিপীলিকায় নষ্ট করিয়া থাকে। কাজেই আশানুরূপ চারাও পাওয়া যায় না। ইহা এতদ্দেশে সেগুন গাছ জন্মাইবার অন্তরায়। বোধ হয়, এই কারণে কলিকাতার চারা-বিক্রেতারা সেগুন-চারার মূল্য অধিক লইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। সাধারণের পক্ষে সেগুন-চারা রোপণ করিবার ও জন্মাইবার পথে ইহা প্রধান এক অন্তরায় বলিয়া মনে হয়।

সেগুন-বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিবার সহজ উপায় এই স্থানে আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি। প্রত্যেকটি বীজ বাম হাতে একটা কাঠের টুকরার উপর ধরিয়া ছোট লোহার হাতুড়ি দ্বারা আস্তে আস্তে ঠুকিয়া ইহার আবরণে কতক ফাট ধরাইয়া মাটিতে পুঁতিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিলে চারা সহজেই বাহির হয়। তাহা হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে শতকরা ষাটটার মত অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। আমরা এই উপায়ে তিন বার চারা উৎপাদন করিয়া সকল সংশয় দূর করিয়াছি। আর কেহ

এই প্রণালী অবলম্বনে সেগুন চারা উৎপন্ন করিয়াছেন কি না তাহা অবগত নহি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহা নূতন ঘটনা। এই ঘটনা হইতে ইহাই বুঝিতে হইয়াছে যে, সেগুনের চারা জন্মাইতে হইলে এই উপায়ই ফলপ্রদ। সেগুন-বীজ চৈত্র মাসে পাকে। গাছের তলায় গেলে বীজ অনায়াসে পাওয়া যায়। কাহারও ইহার চারা করিবার ইচ্ছা হইলে কোন স্থানের গাছের নিকটে যাইয়া বীজ সংগ্রহ করা উচিত হইবে।

ইহার লাভালাভ সম্বন্ধে এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠক একবার গৌহাটী সহরস্থিত সেগুন কাঠের মাপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া লউন। যাঁহাদের কাঠের গোল জরিপ ও কাঠের গুণানুসারে মূল্য অবধারণ করিবার অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে, ষোল ফুট লম্বা ও ছয় ফুট পরিধিবিশিষ্ট একটা গাছের গুঁড়ি চিরিয়া চব্বিশ-পঁচিশ ঘনফুট কাঠ পাওয়া যায় এবং একটি ঐরূপ লম্বা ও নয় ফুট পরিধি গুঁড়ি চিরিলে তাহাতে আশী ঘনফুটের অধিক কাঠ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে ভাল সেগুন কাঠের দর কলিকাতার বাজারে প্রতি ঘনফুট দশ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। ন্যূনকল্পে প্রতি ঘনফুট চারি টাকা করিয়া হিসাব করিলেও ছয় ফুট পরিধির একটা গুঁড়ির মূল্য একশত টাকা ও নয় ফুট পরিধির একটা গুঁড়ির মুল্য তিন শত কুড়ি টাকা হইয়া দাঁড়ায়। আমরা আশৈশব নানাজাতীয় গাছপালার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিয়া যতটুকু শিক্ষা পাইয়াছি তাহা হইতে এই বলিতে পারি যে, এ কাজে প্রবৃত্তি ও প্রচেষ্টা থাকিলে এক বিঘা জমিতে অন্ততঃ চল্লিশটা গাছ খুব সুস্থকায় করিয়া জন্মাইয়া তুলিতে পারা যায়। তাহা হইলে পঞ্চাশ বৎসর পরে ঐসব গাছের মূল্য গড়ে এক শত টাকা করিয়া ধরিয়া লইলেও এক বিঘা জমির পঞ্চাশ বৎসরের আয় চারি হাজার টাকা হইবে। ইহার অর্থ, এক শত একর জমির পঞ্চাশ বৎসরের আয় বার লক্ষ টাকা হইবে। ইহার ব্যয় সম্বন্ধে আমার

ধারণা এই যে প্রথম পাঁচ-সাত বৎসরের জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, সে-সব কাজ করিবেন কাহারা? ইহার উত্তর এই যে, যাঁহাদের এরূপ করিবার জায়গা ও সামর্থ্য আছে তাঁহাদেরই এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আসাম প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায়, উত্তর-বঙ্গ ও স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এমন অনেক স্থান পতিত রহিয়াছে, যেখানে নানাজাতীয় লক্ষ লক্ষ বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া কোটি কোটি টাকা আয় বাড়ানো যাইতে পারে। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে, দশসনা মহালের অনেক জায়গা এখন পতিতই পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে ইচ্ছা করিলে অনেক গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। সকলেই অবগত আছেন, জীবন-বীমা কোম্পানী, চাউলের কল ইত্যাদি গঠনকারী ব্যক্তিদিগের অদূরদর্শীতার ফলে দেশের বহু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা হারাইয়াছে। ঐসব কোম্পানীর অধিকাংশেরই এখন কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাইতেছে না। যাহাদের কিছু কাজ-কারবার আছে বলিয়া শুনা যায়, তাহারাও কুড়ি-পঁচিশ বৎসর পরে আজও এক পয়সা ডিভিডেন্ট দিতে পারিতেছেন না। কাজেই অংশীদারগণকে লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছে এবং ইহার ফল এই যে, ভবিষ্যতে অংশীদার জুটাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিবার কল্পনায় যাইবার পথেও প্রধান এক অন্তরায় হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কোম্পানী গঠনকার্য্যে দেশের লোকের যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়াই বলিতে হইতেছে যে, 'যাহার কাজ তাহারই সাজে"। সুতরাং অনুকরণ-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দূরদৃষ্টি সহকারে যাঁহার যতদূর জায়গা ও কারবার করিবার সামর্থ্য আছে, তদনুসারে স্বয়ংই ধৈর্য্যসহকারে বনভূমির সৃষ্টি করিবেন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য অন্ন-সংস্থানের একটা সুমহৎ ব্যবস্থা করা হইবে। ইহাতে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

এ অধ্যায়টি পাঠ করিয়া যদি কাহারো গাছ রোপণের প্রবৃত্তি জন্মে,

তাহা হইলে দেশের সুদিন আগত বলিয়াই বুঝিতে হইবে। তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, বিহার প্রদেশ হইতে শিশু গাছের বীজ আনাইয়া পরীক্ষা স্বরূপ এক-শত কি দুই-শত গাছ লাগাইতে ভুলিবেন না। শিশু নামক এক প্রকার গাছ এদেশেও আছে, যাহার পাতা দেখিতে শিশু-গাছের ন্যায়ই, কিন্তু ইহা প্রকৃত শিশু নহে। সেজন্যই বিহার হইতে বীজ সংগ্রহের কথা লিখিলাম।

পরিশিষ্ট

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশ

কৃষি-যন্ত্রাদি

প্রগতিশীল কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিমাত্রেরই কৃষি-যন্ত্রাদি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান সঞ্চয় ও মামুলি যন্ত্রাদির উন্নতি সাধনে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাজার হইতে যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার কালে অথবা কামার ও ছুতারের দ্বারা প্রস্তুত করাইবার পূর্ব্বে ইহাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় করা উচিত। কারণ অপকৃষ্ট যন্ত্রের দোষ বহু। বিশেষ করিয়া লাঙ্গল, খুরপি ইত্যাদি কাটিবার যন্ত্রে ইস্পাতের ভাগ কম থাকিলে বা 'পানি দেওয়া' (tempering) ঠিক না হইলে. ইহাদের দ্বারা ভাল কাজ আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যন্ত্রাদির দ্বারা দীর্ঘকাল আশানুরূপ কাজ পাওয়া নির্ভর করে—প্রধানতঃ যন্ত্রের উৎকর্ষতা. ইহাদের যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষণ প্রণালীর উপর। পরিতাপের বিষয় এই যে, কৃষকদের অবস্থা হীন হওয়ার ফলে দেশের মামুলি ও স্থানীয় কৃষি-যন্ত্রাদিরও অপকর্ষ বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে। কৃষি-কার্য্যকে সমগ্রভাবে প্রগতিশীল না করিতে পারিলে কৃষি-যন্ত্রাদিরও শোচনীয় অবস্থার অবসান হওয়া সম্ভব নয়।

লাঙ্গল

দেশী লাঙ্গলঃ—ভূমিকর্ষণের প্রধান ও প্রাচীন যন্ত্র লাঙ্গল। স্থানীয় কামার ও ছুতারমিস্ত্রির সাহায্যে লাঙ্গল তৈরি করাইয়া লওয়াই দেশের প্রচলিত রীতি। কিন্তু কৃষকদের দৈন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত দেশী লাঙ্গলেরও অবনতি ঘটিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হালের গরুর অকর্ম্মণ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে এবং জমির অনুপাতে হালের গরুর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় গরীব চাষীগণ লাঙ্গলের ফাল ক্রমেই ছোট করিতে
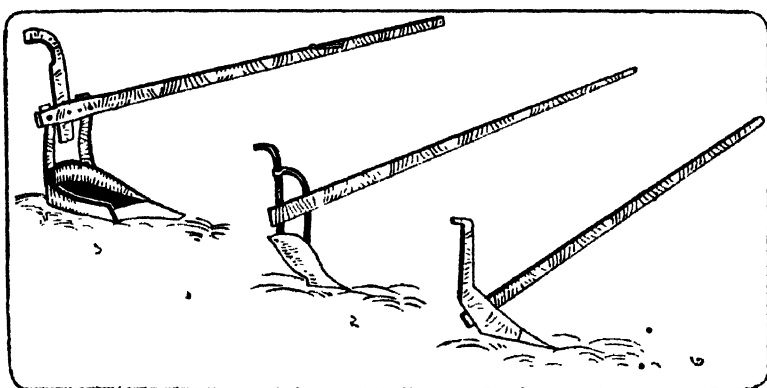
১। দি আমেরিকান হিন্দু লাঙ্গল, ২। হিন্দুস্থানী লাঙ্গল, ৩। দেশী লাঙ্গল।

বাধ্য হইতেছে। তদ্ভিন্ন যে পরিমাণ ইস্পাত লাঙ্গলের ফালে থাকা প্রয়োজন তাহা সাধারণতঃ না থাকায় ইহা শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দেশী লাঙ্গলের ক্রম-বর্দ্ধমান অবনতির ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হল চালনা করিলেও জমির সর্ব্বস্থান উত্তমরূপে কর্ষিতই হয় না, হইলেও জলা বা কাদা জমি ভিন্ন শুকনা জমি গভীর ভাবে কর্ষণ সম্ভব হয় না। এই কারণে দেশের অধিকাংশ চাষী কর্ষণের অভাব রাখিয়াই ফসল ফলাইতে বাধ্য হইতেছে। এভাবে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিতে যাইয়া দেশের কৃষককুল নিজেরাই নিদারুণ ভাবে প্রতারিত হইতেছে। বাংলা ও আসামের প্রধান ফসল ধান পাট ইত্যাদির উৎপন্ন হার কমিয়া যাওয়ার ইহা এক প্রধান কারণ। কর্ষণের উদ্দেশ্য সফল বা কার্য্যকরী করিবার জন্য লাঙ্গল এমন হওয়া চাই যে, জমি চাষ করিবার কালে নীচের মাটি যেন উপরে ভাসিয়া উঠে। একাধিক বার এ ভাবে কর্ষণের ফলে মাটি ওলট-পালট হইলেই ঠিক ঠিক জল, বায়ু ও রৌদ্রালোকের ক্রিয়ায় ইহা হাল্‌কা হয় এবং ইহাতে ফসলের খাদ্য-উপাদানগুলিও সক্রিয় হইয়া উঠে।

বিদেশী ও উন্নত ধরণের লাঙ্গলঃ—বিদেশী যন্ত্র-

বিক্রেতাদের কল্যাণে ও কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে কয়েক প্রকার উন্নত ধরণের লাঙ্গল উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিদেশী লাঙ্গলের মধ্যে 'মেষ্টন প্লাউ' 'দি আমেরিকান হিন্দু প্লাউ' 'হিন্দুস্থানী প্লাউ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একসময়ে কলিকাতার একটি বিলাতী কোম্পানী (W. Leslie & Co,.) এদেশের উপযোগী আমেরিকায় প্রস্তুত পূর্ব্বোক্ত 'হিন্দু-লাঙ্গল' ('The American hindoo plow') আমদানী করিয়াছিলেন (১নং চিত্র, ২৬১ পৃ.)। ইহার খুঁটি ও ইষ কাঠের তৈরি, বাকী অংশ উৎকৃষ্ট ইস্পাত নিৰ্ম্মিত। ফালটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে নূতন ফাল অনায়াসে লাগানো যায়। ইহার ওজন ৩৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সতের সের। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা ১৩৲ টাকায় বিক্রয় হইত। প্রসিদ্ধ বার্ণ কোম্পানীও (Burn & Co.,) বিভিন্ন নমুনার উন্নত লাঙ্গল বিক্রয় করিতেন। 'হিন্দুস্থানী প্লাউ' ইহাদের অন্যতম। কর্ষিত মাটিকে উল্টাইয়া দিবার জন্য ইহার পাখাযুক্ত (মোল্ড বোর্ড) ফাল ইস্পাতের, আর খুঁটি ও ইষ কাঠের দ্বারা তৈরি। যুদ্ধের পূর্ব্বে ইহা ১১৲ টাকায় পাওয়া যাইত। ইহার অনুরূপ, (২নং চিত্র, পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) লোহার খুঁটি ও কাঠের ইষযুক্ত লাঙ্গল ৫৷৹ টাকায় বিক্রয় হইত। মোল্ডবোর্ডটিই এই সকল বিদেশাগত লাঙ্গলের বৈশিষ্ট্য। ইহা চাষের সময় কর্ষিত মাটিকে সঙ্গে সঙ্গে সিঁথির ন্যায় উল্টাইয়া দিয়া কর্ষণের উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলে।

বাংলা ও আসাম প্রদেশের কৃষি-বিভাগের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার মাটি চাষের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ফসলের জন্য উন্নত ধরণের একাধিক প্রকার লাঙ্গল উদ্ভাবিত হইয়াছে। সত্য বটে, দেশী লাঙ্গলের তুলনায় এ সকল লাঙ্গলের মূল্য অধিক কিন্তু ইহাদের কার্য্যকারিতা বিবেচনা করিলে এই মূল্যাধিক্য নগণ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল লাঙ্গলের কোনটার কি গুণ তাহা কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রচারিত বুলেটিন পাঠে জানা যায় বলিয়া পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৃষি-বিভাগ হইতে বিনামূল্যে
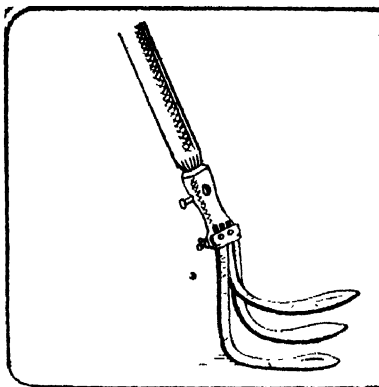
হাত-লাঙ্গল (Gardening Cultivator)

ঝাঁজরি
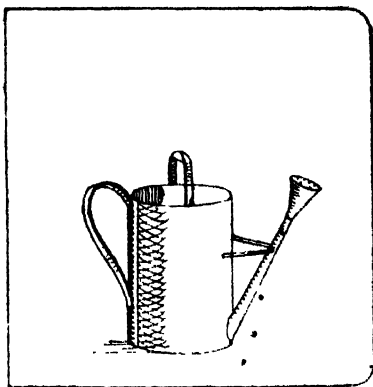
অথবা নগণ্য দামে 'বুলেটিন' পাওয়া যায়। স্থানীয় কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীর সাহায্যেও যাহার যে প্রকার লাঙ্গলের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন।

হাত-লাঙ্গল (Gardening Cultivator) ঃ—বাস্তু কৃষিকর্ম্মের জন্য হাত-লাঙ্গলের উপযোগিতা অশেষ। বিভিন্ন ফসল ও শাক-সব্জীর আবাদ প্রসঙ্গে ইহার ব্যবহার-প্রণালী পূর্ব্বে একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। উপরে যে হাত-লাঙ্গলের ছবি দেওয়া হইয়াছে, আমরা বহুকাল যাবৎ সাফল্যের সঙ্গে ইহা ব্যবহার করিয়া উত্তম ফল পাইতেছি। ইহাতে কাটার আকারে তিনটি ফাল পৃথক্ হইয়া থাকায়, ইহা হাতে চালানো সহজসাধ্য।

ঝাঁজরি

ঝাঁজরির প্রয়োজন ও ব্যবহারের কথা শাক-সব্জীর আবাদ প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য মোটা, মিহি বা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত জলদানীর প্রয়োজন হয়। যেমন সব্জী অথবা ফুল গাছে জল সেচনের জন্য যে ঝাঁজরি ব্যবহৃত হয়,

তাহা দ্বারা বীজতলায় জল সেচন করিতে গেলে মোটা জলধারার চাপে মাটি সরিয়া যাইয়া বীজ ও কচি চারার ক্ষতি করিতে পারে, আবার সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ঝাঁজরি দ্বারা বড় গাছে জল সেচন করিতে গেলে অযথা সময় ক্ষেপণ করিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঝাঁজরি না রাখিয়া সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিদ্রবিশিষ্ট বিভিন্ন জলদানী তৈরি করাইয়া লইলে একটি ঝাঁজরিতে সকল কাজ সম্পন্ন করা যায়। আমরা তাহাই করিয়া থাকি। ইহাতে খরচ কম হয়। বড় বড় বৃক্ষাদির গোড়ায় জলদানীটি খুলিয়া জল-সেচন করিলে শ্রম কম হয়, ইহাও স্মরণ রাখা ভাল।

ভাল একটি ঝাঁজরি তৈরি করাইয়া বা কিনিয়া ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কোন রং লাগাইয়া লইলে ইহার গায়ে সহজে মরিচা ধরিতে পারে না, সেজন্য সহজে ফুটা বা ছিদ্র হয় না বলিয়া ঝাঁজরি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। রঙের অভাবে আলকাত্‌রা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

মৈ

জমিতে লাঙ্গল অথবা কোদালি করিবার পর মাটির বড় বড় চাকা বা ঢেলাগুলিকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য ও জমি সমান বা চৌরস করিবার জন্য মৈ দিবার প্রয়োজন হয়। মৈ সাধারণতঃ বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত করা হয় এবং বলদের সাহায্যে চালানো হয়। মৈয়ের উপর বলদ-চালক দাঁড়াইয়া থাকে। মাটি চৌরস করার জন্য প্রয়োজনীয় ভারের কাজও ইহাতে হয়। যে সকল স্থানে বলদ ব্যবহার সম্ভব হয় না, তথায় সময় সময় হাতে টানিয়াই মৈ চালানো হইয়া থাকে।

চৌকি

মাটির চাকা বড় হইলে স্থানবিশেষে কখনও কখনও ভারী কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মাটির চাকা চূর্ণ ও জমি সমান করা হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠখণ্ডের নাম চৌকি। চৌকির ব্যবহার মৈয়েরই মত।
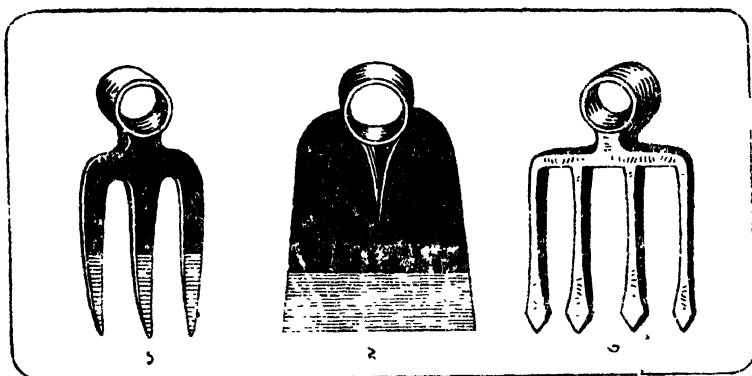
১। সরল মুখের কাঁটা-কোদাল, ২। কোদাল, ৩। হীরক আকারের মুখবিশিষ্ট কাটা-কোদাল।

কোদাল

মাটি কোপাইয়া আল্‌গা করা, আগাছা পরিষ্কার, নালা নর্দ্দমা তৈরি ও সংস্কার, ক্ষেতের আল কাটা বা মেরামত ইত্যাদি বহুবিধ কাজের জন্য কোদালের প্রয়োজন হয়। কাজের প্রকার ও অবস্থা ভেদে ছোট-বড়, পাতলা-ভারী বিভিন্ন প্রকার কোদাল ব্যবহৃত হয়। কোদাল কিনিবার কালে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কাটিবার ধারাল মুখবিশিষ্ট সকল যন্ত্র সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। ইহাতে ইস্পাতের ভাগ কম থাকিলে ইহা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কাজও ভাল হয় না, শ্রমও বেশী লাগে। স্থানীয় কামারের দ্বারা কোদাল তৈরি করিবার সময় ইহা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

কাঁটা-কোদাল (Prong)

যে-সকল স্থানে হল চালনা করিয়া জমি প্রস্তুত করা সম্ভব নয়, তথায় কাটা-কোদালের দ্বারা সেই কাজ সহজে সম্পাদন করা যায়। শাক-সব্‌জী ও ফুল বাগানের জমি প্রস্তুত করা সম্পর্কে ইহার ব্যবহারের উপযোগিতার কথা পূর্ব্বে একাধিক স্থানে বলা হইয়াছে। ফল বাগানের জমি পাইট করিবার পক্ষেও ইহার উপযোগিতা অশেষ।

জমি কোপাইয়া মাটি আল্‌গা করিবার জন্য ইহা কোদাল অপেক্ষা বহু গুণ বেশী কার্য্যকরী। ইহাতে শ্রম কম হয়, কাজ দ্রুত ও ভাল হয়। শক্ত ও শুক্‌না মাটি কোদালি করিয়া আল্‌গা করিতে ইহা অদ্বিতীয় কৃষি-যন্ত্র।

দুই, তিন (১নং চিত্র, পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ও চারিমুখ বা কাঁটা-বিশিষ্ট কাঁটা-কোদাল কিনিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কোনটার কাঁটার মুখ সরল, কোনটার হীরকের আকারবিশিষ্ট (৩নং চিত্র, পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সঙ্গতি থাকিলে প্রয়োজনানুসারে একাধিক রকমের কাঁটা-কোদাল রাখতেপারিলে কাজের খুব সুবিধা হয়।

আঁচ্‌ড়া ও বিদে

নবাঙ্কুরিত ফসলবিশেষের জমির মাটি বৃষ্টির জলে চাপ বাঁধিয়া গেলে, তাহা ও কচি চারার ঘনত্ব ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য আঁচ্‌ড়ার প্রয়োজন হয়। আঁচ্‌ড়া অপেক্ষা বিদে আকারে বড় ও ভারী হয় এবং লাঙ্গলের ন্যায় বলদের দ্বারাই চালিত হয়। মাটি চাপা-পড়া আবর্জ্জনা ও গাছ-গাছড়ার শিকড় ইহার দাঁতে আটকাইয়া যায় বলিয়া জমির ঐ জাতীয় আবর্জ্জনা দূর করিবার জন্যই ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে জমির মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার কাজেও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে।

গার্ডেন রেক (Garden Rake)

ইহাও আঁচড়া জাতীয় যন্ত্র। খোলাম-কুঁচি, হাড়ি-কলসীর ভাঙা টুকরা (যাহা বৃষ্টির পর সাধারণতঃ ভাসিয়া উঠে), পুরাতন লতা-পাতা,—এক কথায় বাগানের আবর্জ্জনাসমূহ টানিয়া বাগান ও উঠানের পরিপাট্য সাধনের কাজে ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র। বাগান ও উঠানের ঘাস-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রেক টানিয়া দিলে মাটি চৌরস হয়, স্থানের সৌন্দর্য্য বাড়ে। কাজেই বাস্তু-কৃষিকার্য্যের জন্য
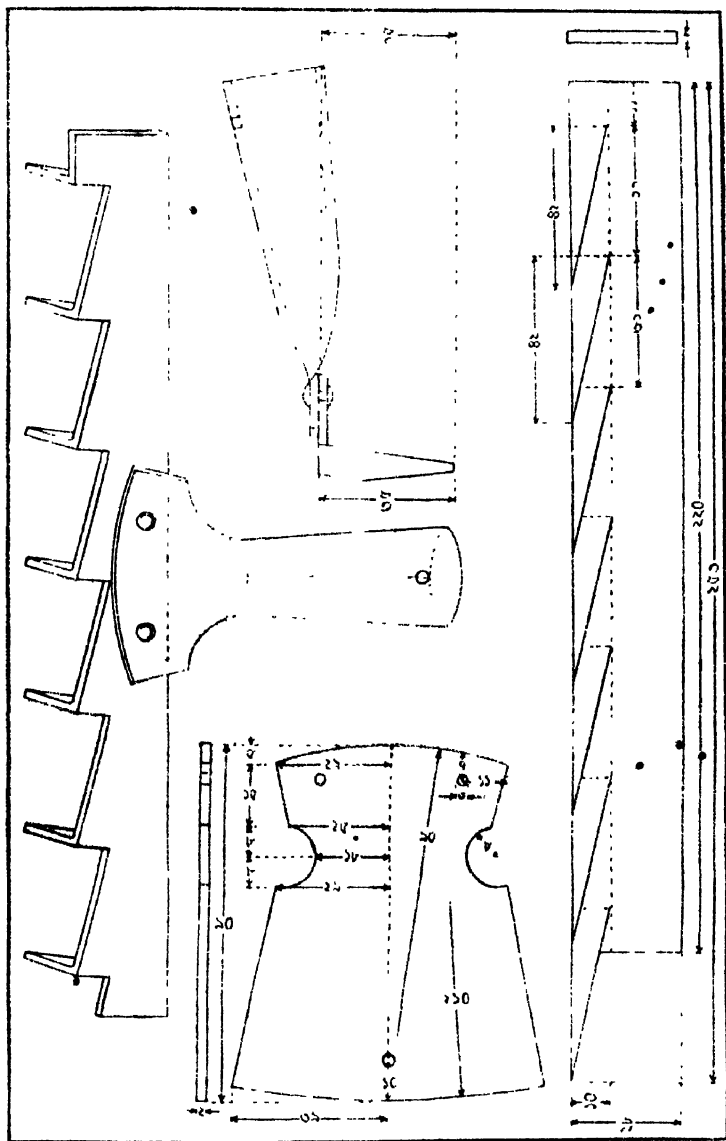
হাতে তৈরি গার্ডেন রেকের নক্সা

ইহাকে নিরতিশয় প্রয়োজনীয় যন্ত্র বলিতে হয়। ২৬৯ পৃষ্ঠার ১ নং চিত্রে হাতলবিহীন যে রেকের ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহাই ছোট বড় আকারের দশ, বার, চৌদ্দ কাঁটাবিশিষ্ট বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে টেংরা বাঁশের অথবা কাঠের হাতল নিবদ্ধ করিয়া লইতে হয়। বাজারে হাতলসহ রেকও কিনিতে পাওয়া যায়।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ইহার কাঁটাগুলি সহজে বাঁকিয়া যায়। বাঁকা কাঁটা সোজা করিতে গেলে প্রায়শঃ ঢিলা হইয়া যায়। সেজন্য বার বার কামারের দ্বারস্থ হইতে হয়। এই অসুবিধা নিবারণের জন্য আমরা অন্য প্রকার রেক তৈরি করিয়া কাজে উত্তম ফল পাইতেছি। ইহার সম্পূর্ণ নক্সা পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট করা হইল। উদ্যান প্রিয় ব্যক্তিগণ স্থানীয় কামারের সাহায্যে ইহা অনায়াসেই তৈরি করাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে খরচ সামান্যই পড়ে।

মামুলি রেকে পেরেকের ন্যায় কাঁটাগুলি পৃথক ভাবে জোড়া থাকে কিন্তু শেষোক্ত প্রকার রেকের বৈশিষ্ট্য এই যে, কাঁটাগুলি একটি লৌহপাত হইতেই কাটিয়া বাহির করা হয় বলিয়া মজবুত বেশী হয়, সহজে বাঁকিতেও পারে না। ইহা তৈরি করিবার বেলায় মাপের সূক্ষ্মতা রক্ষার জন্য নক্সার গায়ে মিলিমিটারের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। ইহা তৈরি করিতে মাত্র দুই টুক্‌রা লৌহপাতের প্রয়োজন। মাপানুযায়ী উভয় টুক্‌রা কাটিয়া রেতের (ফাইল) সাহায্যে ঘসিয়া ঠিক করিয়া লম্বা টুক্‌রাখানিতে দাঁত বাহির করিবার জন্য দাগ দিয়া লইতে হইবে। পরে করাতের দ্বারা (লৌহ কাটিবার হ্যাক সো) অথবা ধারাল ছেনির সাহায্যে দাঁত-গুলি কাটিয়া পাতের সমকোণে বাঁকাইয়া দিতে হয়। নক্সানুযায়ী হাতলের লৌহপাতটি যথারীতি বাঁকাইয়া অপর পাতের মধ্যস্থানে দুইটি লৌহ-খিলের (Rivet) দ্বারা উত্তমরূপে জুড়িয়া লইলেই কাজ হইল। পরে হাতল লাগাইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

গার্ডেন ট্রাউয়েল (Garden Trowel)

গোড়ার মাটিসহ চারা গাছ তুলিয়া স্থানান্তরিত করিবার জন্যই ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহা অনায়াসেই স্থানীয় কামার বা ছুতারের দ্বারাও তৈরি করিয়া লওয়া যায়। সস্তার বাজারে বিলাতী উৎকৃষ্ট ট্রাউয়েল একটি আট আনা বার আনায় বিক্রি হইত। (২ নং চিত্র দ্রষ্টব্য।)
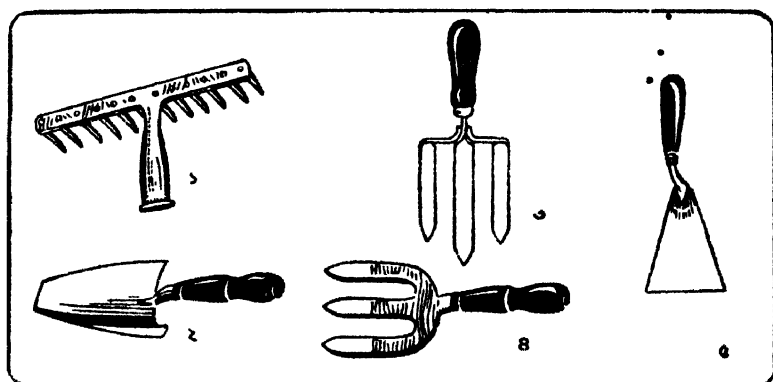
১। গার্ডেন রেক, ২। গার্ডেন ট্রাউয়েল, ৩। হস্তনির্মিত কাঁটা-খুরপি, ৪। বিলাতী কাঁটা-খুরপি, ৫। দেশী খুরপি

খুরপি

ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার, নিড়ানো ও চারা গাছের গর্ত ইত্যাদি বহুবিধ কাজের জন্য খুরপি ব্যবহৃত হয়। ভাল ইস্পাতের খুরপিই উত্তম কাজ দানে সমর্থ। আমরা সময় সময় পুরাতন ও অকেজো রেত (ফাইল) দ্বারা খুরপি তৈরি করাইয়া লইয়া থাকি। ইহার হাতলটি উত্তম গোল ও মসৃণ করিবার জন্য কুঁদে তৈরি করিয়া লইতে পারিলে কাজ করিতে বেশ আরামদায়ক হইয়া থাকে। নরম মাটিতে কাজ করিবার জন্য তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত মুখের খুরপি ব্যবহার করা যায় কিন্তু শক্ত মাটিতে চালনার জন্য অপেক্ষাকৃত সরু মুখের খুরপি হইলেই ভাল। ইহাতে শ্রম কম লাগে। (উপরের ৫ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

কাঁটা-খুরপি

কোদাল ও কাঁটা-কোদালের মধ্যে যে প্রভেদ, খুরপি ও কাঁটা-খুরপির গুণাগুণের মধ্যেও সেইরূপ পার্থক্য বর্ত্তমান। অর্থাৎ খুরপি অপেক্ষা কাঁটা-খুরপি চালনা সহজসাধ্য, কাজও ইহাতে অল্প সময়ে অধিক হয়। শাকসব্জী ও ফুল বাগানের আগাছা পরিষ্কার করণে ও নিড়াইবার কাজে ইহার উপযোগিতা অসামান্য। শক্ত মাটিতে খুরপি অপেক্ষা কাঁটা-খুরপি ব্যবহার অধিক উপযোগী। চা-বাগানের প্রয়োজনে বিলাতী ঢালাই করা ইস্পাতের কাঁটা-খুরপি (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য) এদেশের বাজারে আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে অনেকে ইহার উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়া ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে কাঁটা-খুরপি স্থানীয় কামারের সাহায্যেও তৈরি করিয়া লওয়া যায়। দুই পার্শ্বের কাঁটা দুইটি পৃথক ভাবে তৈরি করিয়া (পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য) মধ্যবর্ত্তী কাঁটার সঙ্গে খিলের দ্বারা জুড়িয়া হাতল লাগাইয়া লইলেই কাজ হয়। আমরা এই ভাবে কাঁটা-খুরপি তৈরি করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি।

কাস্তে

ঘাস, ধান ইত্যাদি তৃণজাতীয় গাছ কাটিবার জন্য কাস্তের প্রয়োজন। ইহার বুকে করাতের দানার ন্যায় মিহি দানা কাটা থাকে, যাহা তৃণজাতীয় গাছ কাটিতে সহায়তা করিয়া থাকে। এখানে দুই আকারের দুইটি কাস্তের চিত্র দেওয়া হইল। দেশের স্থানে স্থানে ইহার আকার ও রূপের বহু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। (পর পৃষ্ঠায় ১নং ও ২নং চিত্র দ্রষ্টব্য।)

দা, কাটারী

গৃহস্থমাত্রেরই উৎকৃষ্ট একটি বা একাধিক দা রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুসারে হাল্কা, ভারী দায়ের প্রয়োজন
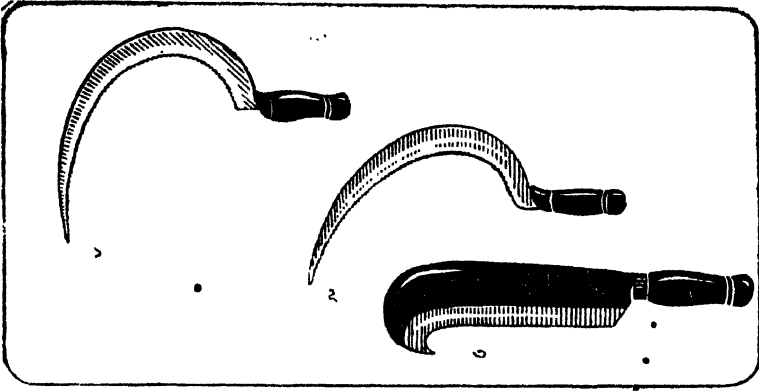
১। ও ২। বিভিন্ন আকারের কাস্তে, ৩। দা বা কাটারি

হইয়া থাকে। স্থান-বিশেষের দা গুণবৈশিষ্ট্যের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। কিনিবার কালে ঐ সকল স্থানের দা লওয়াই সঙ্গত। কিন্তু স্থানীয় কর্ম্মকার দ্বারা দা প্রস্তুত করাইতে হইলে উপযুক্ত ইস্পাত-লৌহই ব্যবহার করা ও ঠিকমত পানি দেওয়াইয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পানি দেওয়া ঠিক না হইলে, হয় দায়ের ধারাল মুখ ক্ষণভঙ্গুর হয়, নতুবা বাঁকিয়া যায়। হালকা উত্তম দা দ্বারা 'প্রুনিং নাইফের' (pruning knife) কাজ অনায়াসেই হইতে পারে ও হয়। 'প্রুনিং নাইফের' আকৃতিবিশিষ্ট দায়ের চিত্র এখানে সন্নিবিষ্ট হইল। (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)

কাঁচি (Hedge Shears)

ঝোপাকৃতি সরুডালবিশিষ্ট গাছ ও কাঁটাগাছ সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে ছাটিবার জন্য কাঁচির প্রয়োজন হয়। উদ্যানপ্রিয় ব্যক্তিদের পক্ষে গাছ ছাটিয়া বাগানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য কাঁচি রাখা নিতান্ত দরকার। (পর পৃষ্ঠার ১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)
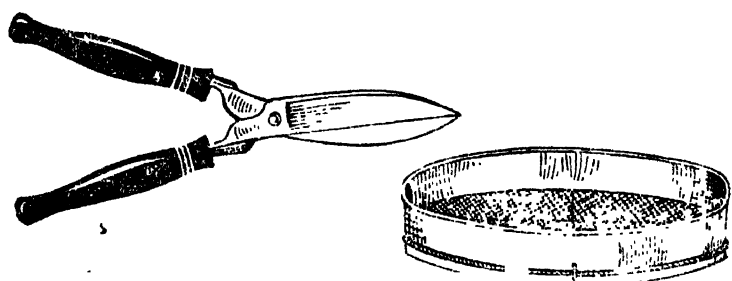
১। গাছ ছাটিবার কাঁচি ২। চালুনি

চালুনি

যাহারা সব্জীবাগ করেন, তাহাদের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট তারের জালের চালুনি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। বীজতলার মাটি প্রস্তুত, খোলাম-কুচি ছাকিয়া মাটি নির্ম্মল করিবার জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা অশেষ। ক্ষুদ্রাকার শস্যাদিও যথা—সরিষা, মুগ, কলাই ইত্যাদি চালুনির সাহায্যে সহজে আবর্জ্জনামুক্ত করা যায়। বাঁশের চালুনিতেও কাজ চলে কিন্তু ইহা স্থায়ী হয় না, কাজও তেমন ভাল হয় না। সেজন্যই তারের জালের চালুনির কথা বিশেষ ভাবে বলা হইল। এখানে যে চালুনির ছবি দেওয়া হইয়াছে, সেরূপ একটি চালুনি আমরা গত বিশ বৎসর যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি এবং এখনও ইহা অক্ষত আছে। তারের গায়ে যাহাতে মরিচা না ধরে সেজন্য বৃষ্টির জল হইতে বাঁচাইয়া ও কাজ করিবার পর পরিষ্কার করিয়া শুষ্ক স্থানে রাখা নিতান্ত উচিত।

হ্যাণ্ড হো (Hand Hoe)

স্বল্লায়াসে গাছগাছড়া নিড়াইবার ও গাছের গোড়ায় মাটি ধরাইবার কাজে এই বিলাতী যন্ত্র বিশেষ উপযোগী। বিভিন্ন

প্রকার কাজের জন্য বহু আকারের 'হো' কিনিতে পাওয়া যায়। যাহারা 'হো' ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিজেদের প্রয়োজনানুরূপ হো দেখিয়া শুনিয়া কিনিয়া লইতে পারেন।

আবর্জ্জনা ফেলিবার ঠেলাগাড়ী

বাগ্‌বাগিচা অল্পশ্রমে আবর্জ্জনাশূন্য করিয়া পরিষ্কার রাখিতে হইলে একটি এক চাকার ঠেলা গাড়ীর প্রয়োজন সামান্য নয়। স্তুপীকৃত গোময় অপসারণে ও অনুরূপ কাজেও ইহার ব্যবহার শ্রমের লাঘব করে। বাজারে বিভিন্ন প্রকারের ঠেলাগাড়ী কিনিতে পাওয়া যায়। ইচ্ছা করিলে গরুর গাড়ীর চাকার ন্যায়
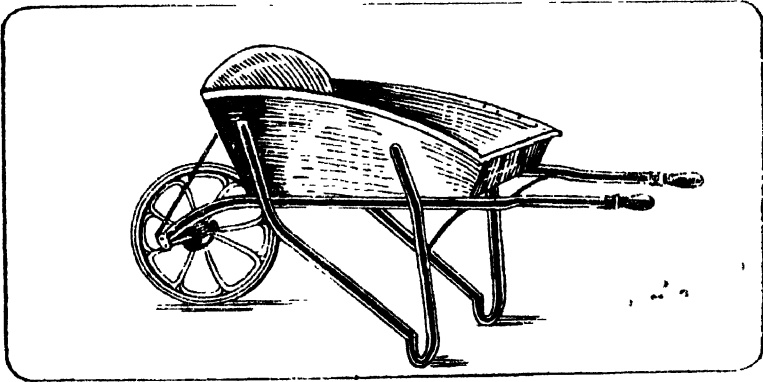
এক চাকার ঠেলাগাড়ী

ছোট কাঠের চাকা তৈরি করিয়া ইহাতে লৌহপাতের চাকৃতি বসাইয়া কাঠের দ্বারা বাকী অংশ অর্থাৎ দেহ ও খুঁটি স্থানীয় ছুতার ও কামারের সাহায্যেই নির্ম্মাণ করানো যাইতে পারে।

চলন্ত পায়খানা বা বিষ্ঠা-সার ব্যবহারের যন্ত্র

সম্প্রতি আমার পুত্র শ্রীমান্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মানুষের স্বাস্থ্যোন্নতির কল্পে একটি চলন্ত পায়খানা উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করিয়াছে।

ইহাকে বিষ্ঠা-সার ব্যবহার করিবার অত্যুৎকৃষ্ট যন্ত্র বলা যাইতে পারে।* ইহা চারটি চাকার উপর এমন ভাবে তৈরি যে, অতি সহজে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই চালাইয়া লইয়া বসানো যায়। প্রবল ঝড়েও ইহার ক্ষতি করিতে পারে না। ইহাতে বসিয়া মলত্যাগ করিবার পর মলের উপর এক চামচ মাটি দিতে হয়। সেজন্য মাছির উপদ্রব একেবারেই হইতে পারে না। বাড়ীর যে-কোন স্থানে ইহা বসাইয়া মলত্যাগ করিলেও কোন প্রকার অসুবিধা জন্মে না। বিষ্ঠা-সার ব্যবহার করিবার জন্য ইহা শাকসবজীর বাগানের যে-কোন স্থানে ইচ্ছামত বসাইয়া মলত্যাগ করিতে পারা যায়। উপরন্তু, স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার পক্ষেও ইহা উৎকৃষ্ট উপায়।

ইহা যে ভাবে তৈরি হওয়া উচিত ছিল, যুদ্ধের দরুন জিনিস-পত্র দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। তবে ইতিমধ্যে ইহার সংশোধন ও ক্রমোৎকর্ষ সাধন এখন করা হইতেছে।

কৃষি-যন্ত্র ও কৃষির উন্নতি

দেশময় কৃষির ব্যাপক উন্নতি করিতে হইলে কৃষি-যন্ত্রাদিরও উৎকর্ষসাধন করা প্রয়োজন। পল্লীর কর্ম্মকার ও ছুতারই আবহমানকাল হইতে কৃষকদের কৃষি-যন্ত্রাদি তৈরি করিয়া আসিতেছিল। পল্লীসমাজের আর্থিক অসচ্ছলতা বৃদ্ধি ও কৃষ্টির অবনতির ফলে পল্লী-শিল্পীর শিল্প কাজের ধারাও নিরতিশয় অবনত হইয়াছে। উত্তম কাজ করিতে পারে তেমন কামার ছুতার ক্রমেই বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ আশা করা অন্যায় নয় যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের চাষী শিক্ষিত চাষীতে পরিণত হইবে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে সগৌরবে

* শ্রীমান্ লক্ষ্মীশ্বর এই নবোদ্ভাবিত পায়খানার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছে বলিয়া জানিলাম। ইহা শীঘ্রই প্রকাশ হইবে, আশা করি।

আপনাকে 'চাষী' বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, এবং দেশের অর্থনীতি ও কৃষ্টিগত জীবনে আপনার যোগ্য স্থান নির্ণয় করিয়া লইবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাঁহারা কৃষি উপজীবিকা গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারাই হইবেন ভাবী কৃষক সমাজের অগ্রদূত।

এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, কর্ম্মপথে মানুষের অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রাদির অভাববোধই নূতন আবিষ্কার ও সংস্কারের পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে। কৃষি-যন্ত্রাদিরও সত্যিকার ব্যাপক উন্নতি ব্যবহারকারী-দের দ্বারা সম্ভব। বহিঃসংস্কার দ্বারা এ-কাজ সম্যক্ সম্ভব হয় না। অভিজ্ঞতাই ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সেজন্য চাষবাসের কাজকে প্রাণশীল করিয়া তোলাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

সমাপ্ত

গ্রন্থকার-রচিত প্রবন্ধমালার সূচী

[বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষদর্শন ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতামূলক বহু মৌলিক প্রবন্ধ সাময়িক পত্র—বিশেষ করিয়া কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কোন কোন প্রবন্ধ এক পত্রিকা হইতে অন্য পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রবন্ধই হারাইয়া গিয়াছে। যে সকল পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহাদের কোন কোনটা এখন লুপ্ত। কৃষি-প্রবন্ধ যন্ত্রস্থ হওয়ার পর লেখকের রচিত প্রবন্ধাবলী সংগ্রহে মনোযোগী হই। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে অধিকাংশ প্রবন্ধের সন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। দেশে এমন দিন আসিতে পারে, যখন প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত গ্রন্থকারের সমগ্রজীবনব্যাপী ব্যাপক কৃষিচর্চ্চার বিবরণ হাতে-কলমে কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে। সেজন্য সংগৃহীত প্রবন্ধমালার সূচী এখানে সন্নিবিষ্ট করা গেল। যদি কোন পাঠক অন্য প্রবন্ধাদির সন্ধান দিতে পারেন. তবে বিশেষ বাধিত হইব।—প্রকাশক]

	প্রবন্ধ-সূচী		পত্রিকার নাম	সন	
১।	রবিশস্য চাষের আবশ্যকতা	..	সম্পদ	শ্রাবণ	১৩৩৮
২।	রবিশস্যের চাষ	...	,,	ভাদ্র	,,
৩।	,, ,, ,,	...	,	আশ্বিন	,,
৪।	বাস্তু-কৃষি	...	,,	কার্ত্তিক	,,
৫।	আয়কর ফলের চাষ	...	,,	অগ্রহায়ণ	,,
৬।	,, ,, ,,		,,	পৌষ	,,
৭।	,, ,, ,,	..	,,	মাঘ	,,
৮।	দেশের অভাব বৃদ্ধির কারণ (পাটের চাষ ও গোমড়ক)	...	,,	ফাল্গুন	,,
৯।	কৃষির মূলনীতি	..	,,	চৈত্র	,,
১০।	দাড়িম্ব	.	কৃষিসম্পদ		১৩২৫-২৬

প্রবন্ধ-সূচী	পত্রিকার নাম	সন
১১। আনারস	· কৃষিসম্পদ	(আনুমানিক) জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ১৩২৭
১২। কলের লাঙ্গল	... "	... ...
১৩। কাষ্ঠোৎপাদন	... "	ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত, ১৩৩৪
১৪। কৃষি ও গোপালন	... কমলা	, মাঘ ১৩৩১
১৫। গো-পালন	নব্য ভারত	ইহা ১৩৩২ সনের বৈশাখ হইতে কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত
১৬। বৃক্ষাদি অফলা হইবার কারণ ও তাহা নিবারণোপায়	·· সুরমা	১৩২৩ সনে ধারাবাহিক রূপে
১৭। বৃক্ষাদির চারা প্রস্তুত ও রোপণ প্রণালী	"	প্রকাশিত
১৮। পাটের চাষ	... জনশক্তি*	
১৯। বাস্তু-কৃষি	·· "	
২০। কৃষির কথা (কৃষির উন্নতি প্রচেষ্টা)	· "	৪ঠা শ্রাবণ ১৩৪০
২১। আসাম শিল্প-বিভাগের সার্থকতা	... "	৩০শে শ্রাবণ "
২২। সরকারী কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীবৃন্দের সুরমা উপত্যকার সম্মিলনীর পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন	মুক্তি	৭ই চৈত্র ১৩৪০
২৩। বৃক্ষাদিকে দীর্ঘজীবী ও অধিক বলশালী করিবার উপায়	... দেশবার্ত্তা *	৫।৬ সংখ্যায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত
২৪। বেগুন গাছে বিষ্ঠা সারের প্রভাব	... "	
২৫। আম্রে কীট ও আম গাছ ধ্বংসকারী কীট	ভূমিলক্ষ্মী	
২৬। স্বরাজ লাভের ইহাই কি পন্থা ?	· জনমত	২৬।১।১৯৩৭
২৭। আনারস	· গ্রামের ডাক,	ফাল্গুন চৈত্র ১৩৩৭

* তারকা চিহ্নিত পত্রিকাদিতে গ্রন্থকারের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের ও অধুনালুপ্ত 'রংপুর দিক্ প্রকাশ', 'সার্ভেন্ট' ও অন্যান্য কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের কোন সন্ধান করা সম্ভব হয় নাই।—প্রকাশক

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনাবলী

কৃষির উন্নতি গো-জাতির উন্নতি সাপেক্ষ

ডবল ক্রাউন, ৩৮ পৃষ্ঠা, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। আসাম কৃষি-বিভাগের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ। মূল্য চারি আনা মাত্র।

দেশের অভাব বৃদ্ধির কারণ ঃ—ডবল ক্রাউন, ৩৮ পৃষ্ঠা। দেশের খাদ্যাভাব ও অভাব বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে সরস ভাষায় কৃষক ও প্রতিবেশীর কথোপকথনচ্ছলে লিখিত। বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।

ধানের চাষ সম্বন্ধে কয়টি কথা ঃ—ডবল ক্রাউন, ১৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে দেশের ধান-চাষের বিবরণ, ধানের ফলনের হার কমিয়া যাইবার কারণ, ধান্য উৎপন্নের হার বাড়াইবার প্রত্যক্ষ উপায়, বীজ, কর্ষণ ও সারের কথা বিবৃত হইয়াছে। মূল্য সাড়ে তিন আনা মাত্র।

আনন্দবাজার, যুগান্তর, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকাসমূহে বিশেষভাবে সমালোচিত।

গোলাপ ফুলের চাষ ঃ—ডবল ক্রাউন, ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট, মূল্য পাঁচ আনা মাত্র। ইহাতে গোলাপের শ্রেণী বিভাগ, কলম প্রস্তুত, চারা রোপণ ও তদ্বির প্রণালী, গোলাপের জাতি পরিচয়, গোলাপ ফুলকে অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপ নিয়োজিত করিবার বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আসাম শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক বাংলা বিদ্যালয়সমূহের লাইব্রেরী পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত।

কলেরা ও পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবিধি ঃ—পল্লীকে কলেরার ন্যায় সংক্রামক রোগ হইতে মুক্ত রাখা ও পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্পর্কে গ্রন্থকারের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

রয়েল সাইজ, পৃষ্ঠা ৩০, ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। মূল্য চারি আনা মাত্র।

দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় পুস্তকাবলী ঃ—

প্রথম কল্প—রবিশস্যের প্রচুর আবাদ* ২য় সংস্করণ
দ্বিতীয় কল্প—গোধনরক্ষা* ”
তৃতীয় কল্প—ভাবিবার কথা* ”

* গ্রন্থকারের তারকাচিহ্নিত পুস্তক-পুস্তিকা বর্ত্তমানে ছাপা নাই।

শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহের নূতন গ্রন্থ

আয়কর ফলের চাষ

'আয়কর ফলের চাষ' একটি মৌলিক কৃষি গ্রন্থ। ইহার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া গ্রন্থকারকে জনৈক বিখ্যাত বোটানিষ্ট ও কৃষি-বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন—"আয়কর ফলের চাষ পড়িয়া খুসী হইয়াছি। ইহা আমাদের কৃষি সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিবে। বস্তুতঃ আপনি আপনার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি মহৎ কাজ সম্পাদন করিয়াছেন।"

আয়কর ফলের চাষের বিষয়বস্তু ১০।১২ খানা বড় হাফটোন ফটো ও কয়েক খানি ত্রিবর্ণ চিত্র দ্বারা সমৃদ্ধ হইবে। ইহা এখন যন্ত্রস্থ। ফলের চাষ করিয়া লাভবান হইতে হইলে আপনাপন কপি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিবার জন্য ইহার অগ্রিম গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি।

আয়কর ফলের চাষের বিষয়-সূচী: অবতরণিকা—মাটির পরিচয়—সার—বীজ—বৃক্ষাদিকে স্বাস্থ্যসম্পন্ন করিবার উপায়—চারা রোপণের দূরত্ব—বৃক্ষ পরিচর্য্যা—ফল-বাগানের জমি প্রস্তুত—চারা রোপণের সময়—চারা রোপণ—ফল বিক্রয়—বাগানের ব্যয় সংক্ষেপ করিবার উপায়—আম্র—আমগাছ ধ্বংসকারী কীট—আমে কীট ও তাহা নিবারণোপায়—গুটি পোকা—আমের কলমের গাছ ও আঁটির গাছের প্রভেদ—আমের জোড়কলম বাঁধিবার প্রণালী—কাঁঠাল—লিচু—নারিকেল—নানাজাতীয় লেবু—পাতি লেবু—দেশী কাগজি—চিনা কাগজি—এলচি লেবু—বাতাবী লেবু—অন্যান্য জাতীয় ফল—কলা—আনারস—পেঁপে—বিবিধ।

প্রকাশকের আবেদন:—শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর সিংহ মহাশয়ের সমগ্র জীবনব্যাপী একাগ্র সাধনার ফল গো-পালন ও কৃষি গ্রন্থমালায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কৃষির অবনতি যে কৃষি-প্রধান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির অন্যতম প্রধান কারণ অর্দ্ধশতাব্দীকাল পূর্ব্বেই তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন এবং সেই জন্য হাতে-কলমে কৃষির চর্চ্চাকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সুদীর্ঘকাল যাবৎ এ ব্রত তিনি উদ্‌যাপিত করিয়া আসিতেছেন। কৃষি, কৃষি-শিল্প ও কৃষকের উন্নতি সাধনের চিন্তাই তাহার জীবনকে জুড়িয়া রাখিয়াছে।

নিজের জন্মপল্লীতে থাকিয়া গবেষণামূলক কৃষিকার্য্যের ব্যাপক চর্চ্চায় ও সাধনায়ই তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। নিভৃতে নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনার

মতই তিনি কৃষি-বিষয়ক চর্চ্চা ও গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা শুধু পুস্তক-লব্ধ জ্ঞানেই পর্য্যবসিত নহে, হাতে-কলমে কাজ করাতেই ছিল তাঁহার প্রধান আনন্দ। নিয়মিত ভাবে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখাই ছিল তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস। তা' ছাড়া বারকয়েক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি কৃষি ও কৃষকের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়াছেন। বাংলা-দেশে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে কৃষি সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ ঐকান্তিকতা বিরল একথা বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না। এই একনিষ্ঠ সাধক এবং নিরলস কর্ম্মীর অর্দ্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা এবং সাধনার ফলই কৃষি ও গো-পালন গ্রন্থমালা।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক নানা পত্রিকায় তাঁহার প্রায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্বভাবতঃ আত্মগোপনশীল বলিয়া লেখক আজও লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মূল্যবান্ বহু রচনা এখনও অপ্রকাশিত আছে। **আয়কর ফলের চাষ ইহাদের অন্যতম।**

২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক যে সকল রচনা প্রবন্ধাকারে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন কৃষি-কার্য্য-বিমুখ হওয়ায় সেইগুলিও তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। সুখেস্বচ্ছন্দে খাইয়া বাঁচিবার জন্য, দেশের কৃষ্টির সাবলীলতার জন্য কৃষিকার্য্যের বিজ্ঞানসম্মত প্রত্যক্ষচর্চ্চা বা উপজীবিকা গ্রহণের প্রয়োজন কত তাহা আজ দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। গ্রন্থকার আজ বার্দ্ধক্যের প্রান্ত-সীমায় উপনীত, ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইলেও দেশবাসীর মধ্যে কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানের প্রচারে তাঁহার উৎসাহ যুবজনোচিত। তাঁহার জীবদ্দশায় যাহাতে তাঁহার রচনাবলী পূর্ণাঙ্গ হইয়া প্রকাশিত হয় এবং কৃষিকর্ম্মে এবং কৃষিবিজ্ঞানে আগ্রহশীল ব্যক্তিমাত্রেই যাহাতে তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া লাভবান হইতে পারেন, সেজন্য এই দুর্দ্দিনে কাগজ ও ছাপার কাজ ব্যয়সাপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমরা এই কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। অবশেষে কৃষিকর্ম্মোৎসাহী ও দেশের কৃষ্টির পরিপোষক সুধীবৃন্দকে গ্রন্থকারের কৃষি-গ্রন্থমালার গ্রাহক হইয়া আমাদের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমরা আশা করি, 'আয়কর ফলের চাষ' আগামী সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইবে—বিনীত প্রকাশক।